ধর্ম্ম বিজ্ঞান বীজ।

শ্রী কালীশঙ্কর দাস

প্রণীত।

ধর্ম্মঃ প্রোজ্‌ঝিতকৈতবোঽত্র
পরমোনির্ম্মৎসরাণাং সতাং
।

কলিকাতা।

ইণ্ডিয়ান মিরার যন্ত্রে মুদ্রিত।

১৭৯৭ শক।

মূল্য ।৵০ আনা।

উৎসর্গ।

প্রীতিভাজন শ্রীমৎ নবদ্বীপ চন্দ্র দাস

স্নেহাস্পদেষু।

প্রিয়তম !

আমি তোমাকে যেরূপ স্নেহ ও প্রীতি করিয়া
.ক, তাহার অনুরূপ কোন চিহ্ন তোমাকে না
'ত পারিয়া বিশেষ ব্যথিত ছিলাম, অদ্য আমার
২ ব্যথা দূর করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইয়া
'মার লিখিত এই ধর্ম্মবিজ্ঞানবীজের প্রথম খণ্ড
তোমার হস্তে অর্পণ করিলাম। আশা করি, তুমি
'ার প্রতি অতীব স্নেহ দৃষ্টি রাখিবে।

হিতকামী

শ্রীকালী শঙ্কর দাস।

বিজ্ঞাপন।

ধর্ম্মবিজ্ঞানবীজ নামক এই পুস্তকের অভিধেয় অতি বিস্তৃত। আমার এমন সস্ছলতা নাই যে আমি এক যোগে সমগ্র বিষয় একত্র সমাবেশ করিয়া পুস্তক মুদ্রিত করি। এজন্য ইহার নয়টী মাত্র অধ্যায়ে প্রথম খণ্ড মুদ্রিত করা গেল। যদি ইহার প্রতি সাধারণের অনুরাগ জন্মে এবং ইহার দ্বারা কাহারও জীবনে ধর্ম্মভাব উদ্দীপ্ত হয়, তবে আমার ভবিষ্যৎ আশা সফল করিতে যত্ন করিব।

আমার রচনাপ্রণালী ভাল হইবে না ইহা আমি জানি। কেবল আমি কেন যে ব্যক্তি নিজের জ্ঞান বুদ্ধির পরিমাণ জানে, সেই জানে তাহার কার্য্য উৎকৃষ্ট কি অপকৃষ্ট; কিন্তু আমি যে বিষয় গুলি লিখিলাম, তাহা আমার নিজের বুদ্ধি রচিত বিষয় নহে, তাহা সাধারণ মনুষ্যজাতির আবিষ্কৃত সত্য। সুতরাং এ বিষয়ে আমার অনুনয় বিনয় নিষ্প্রয়োজন। তথাপি শিষ্টাচারানুরোধে আমি বিনয়ের সহিত বলিতেছি, যদি ইহাতে কোন দোষ দৃষ্ট হয়, সাধুগণের নিকট তৎসম্বন্ধে ক্ষমা চাহি।

শ্রদ্ধাস্পদ ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচারক শ্রীযুক্ত বাবু গৌরিগোবিন্দ রায় মহাশয় আমাকে এই বিষয়ে বিশেষ উৎসাহ প্রদান করেন, আমি সেই উৎসাহে ও অনুরাগের বলে এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি। ইহার আদ্যোপান্ত তিনি স্বয়ং সংশোধন করিয়া দিয়াছেন তজ্জন্য ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

শ্রীকালী শঙ্কর দাস।

উপক্রমণিকা।

মনুষ্য যখন ধর্ম্ম চিন্তা করিতে প্রবৃত্ত হয়, তখন আপনাকে এই বিচিত্র জগতের অন্তর্ভূত একটী পদার্থ বলিয়া চিন্তা করে। প্রথমতঃ পিতা মাতা, তৎপর সাধারণ পরিবার, তৎপর প্রতিবাসী, তৎপর গ্রামবাসী, নগরবাসী, দেশবাসী, বিদেশবাসী, সাধারণ জগদ্বাসী মানবগণের প্রকৃতি ও সম্বন্ধের আলোচনা করিতে থাকে। এতৎ ব্যতীত চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতি জ্যোতিষ্কমণ্ডল, বায়ু ও আলোকপূর্ণ আকাশ, মেঘ, বজ্র, বৃষ্টি প্রভৃতি পদার্থনিচয় এবং জরায়ুজ, অণ্ডজ ও উদ্ভিজ্জ প্রভৃতির অন্তর্গত গূঢ়তত্ত্বসকল তাঁহার আলোচনার বিষয় হয়। আবার ইহার প্রত্যেকেরও আপনার মধ্যে যে একটী অকাট্য সম্বন্ধ সূত্র লম্বিত আছে তাহা এবং সেই সম্বন্ধসূত্রের মূলীভূত অদ্বিতীয় সচ্চিদানন্দ জগদ্বিধাতা পরম পুরুষ সহ নিজের ও সাধারণ জগতের সম্বন্ধ সমালোচনা না করিয়া থাকিতে পারে না। জগতের এই পারস্পরিক সম্বন্ধ ও জগৎ প্রতিষ্ঠাতা মঙ্গলময় আদিপুরুষের সঙ্গে নিজের ও প্রত্যেক জড়, প্রাণ ও আত্মার সম্বন্ধ মানব ধর্ম্মবিজ্ঞানের মূল উপাদান। এই উপাদান লইয়া ধর্ম্মক্রম নির্ম্মিত হইয়াছে। এই ক্রমের বীজ মাত্র এই গ্রন্থ মধ্যে রোপিত হইল। ইহার যে কয়েকটী অঙ্কুর আমার জ্ঞানের আয়ত্ত ছিল, তাহা পৃথক্ পৃথক্ অধ্যায় নামে অঙ্কুরিত করা গেল।

ধর্ম্ম বিজ্ঞান বীজ।

প্রথম অধ্যায়।

জগৎ।

জগতের সাধারণ তত্ত্ব অবগত হইতে হইলে, অগ্রে আলোচনা করিয়া দেখা আবশ্যক, জগৎ বলিতে বুঝায় কি? জগৎ বলিতে উৎপন্ন বা সৃষ্ট বস্তু বুঝায়। যাহা কোন দ্রব্যের সাহায্য ব্যতীত ঈশ্বর আপন শক্তিতে সৃষ্টি করেন, তাহাই সৃষ্ট, তাহাই জগৎ। জগৎ এক দিনে হয় নাই, কিন্তু ক্রমে হইতেছে। মনুষ্যাত্মা পূর্ব্বেও হইয়াছে, এখনও হইতেছে, পরেও হইবে, সুতরাং যাহা কিছু সৃষ্ট হইয়াছে, হইতেছে বা হইবে, তাহা সমুদায়ই জগৎ। ফলতঃ চক্ষু দ্বারা যাহা দেখি, কর্ণ দ্বারা যাহা শুনি, জিহ্বা দ্বারা যাহার আস্বাদ লই, নাশিকা দ্বারা যাহার গন্ধ পাই, চর্ম্ম দ্বারা যাহা স্পর্শ করি, এ সমুদায় ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বস্তুই জগৎ। এতদ্ব্যতীত সাক্ষাৎ অনুভূতি, অনুমান, উপমানাদি

দ্বারা যে সকল বস্তুতত্ত্ব অবগত হই, তাহাও জগৎ? এই জগৎ অগণ্য। জগতের প্রত্যেক বিষয়ের পরিচয় দেওয়া মনুষ্য শক্তির অতীত। সুতরাং পূর্ব্বাচার্য্যগণ তাদৃশ দুষ্প্রাপ্য ফলের আশা পরিত্যাগ করিয়াছেন। আমি কে যে তাহা পরিত্যাগ করিব না? তাদৃশ কার্য্য এক জন কি দুই জনের চেষ্টায় সম্পন্ন হইতে পারে না। দুই বৎসর কি পাঁচ বৎসর পরিশ্রম করিলেও কিছু হয় না। এমন কি সমস্ত পরমায়ু নিঃশেষ করিলেও ইহাতে সিদ্ধকাম হওয়া অসম্ভব। তবে এখন কর্ত্তব্য কি? কর্ত্তব্য এই, বস্তু সকলকে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া তাহার প্রত্যেক শ্রেণীর স্বভাব ও নিয়মাদি হইতে স্রষ্টার যে মঙ্গলভাব দোহন করিতে পারা যায়, বন্ধুদিগকে তাহাই উপহার প্রদান করা।

এই অসীম জগৎ, যাহার এক সীমা হইতে সীমান্তর গমন করিতে বা দর্শন করিতে কোন মনুষ্য সমর্থ হয় না, পৃথিবী সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র প্রভৃতি যাহার বাচ্য, ইহার অন্তর্নিহিত তত্ত্বসকল অবগত হইবার উপায় কি? জগৎ দেখিয়া যদি ধর্ম্মতত্ত্ব নিরূপণ করিতে হয়, জাগতিক ঘটনাবলীর পরিচয় না পাইলে, তাহা অবগত হওয়া দুষ্কর। অথচ উহার অধিকাংশ বিষয় পার্থিব বস্তুতত্ত্বের অন্তর্ভূত হইয়া আছে। এজন্যে অগ্রে জগতের মূল উপাদান গুলির প্রতি দৃষ্টি করা আবশ্যক। জগতের মূল উপাদান কি? পূর্ব্বকালের পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন, আকাশ, বায়ু,

জল, ভূমি, অগ্নি প্রভৃতি ভূত ; এবং দিক্, দেহী, মনঃ, এই সকল জগতের উপাদান। ভূত শব্দের প্রকৃত অর্থ কি ? অমিশ্র বা রূঢ় পদার্থ। আর কিছুরই সঙ্গে যাহার সম্মিশ্রণ নাই, যাহা ঠিক ও বিশুদ্ধ, তাহাই ভূত, সুতরাং যাহা ভূত তাহাই জড় জগতের মূল উপাদান। কিন্তু অধুনাতন পণ্ডিতগণ পূর্ব্বতন পণ্ডিতদিগের এই ভূতবাদের প্রতিবাদ করেন। তাঁহারা বলেন, অগ্নি, বায়ু, জল প্রভৃতি বস্তু বাস্তবিক অমিশ্র নহে মিশ্র, সুতরাং তাহারা ভূত বলিয়া অভিহিত হইতে পারে না। যে সকল অমিশ্র বস্তু অগ্নি, বায়ু, জল প্রভৃতির উপাদান, এবং স্বর্ণ রৌপ্যাদি যে সমস্ত ধাতব বস্তু অমিশ্র বলিয়া রাসায়নিক পরীক্ষায় প্রতিপন্ন হইয়াছে তাহাই ভূত। এতদ্ব্যতীত দেহী ও মনকেও জগতের উপাদান বলিয়াছেন। দেহী অর্থাৎ যাহার দেহ আছে। দেহ নাই কাহার ? এ জগতে সকল বস্তুই দেহবিশিষ্ট, সকল বস্তুই নির্দ্দিষ্ট আকৃতি বা শরীরবিশিষ্ট। সুতরাং দেহী বলাতে ধাতু, প্রস্তর, বৃক্ষ, লতা, কীট, পতঙ্গ বুঝিবার বাধা কি ? বাধা অনেক। দেহী বলিলে যাহার দেহ আছে, তাহাকে বুঝাইয়া আরও কিছু বুঝায়। "আমার এই দেহ" যাহার বোধ আছে, এবং দেহ সম্পর্কে সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব আছে, তাহাকেই দেহী বলিয়া বুঝিতে হইবে। সুতরাং দেহী বলিলে বৃক্ষ লতাদি বুঝিবার বাধা জন্মিল। কেননা যদি বলি অমুক দ্রব্যটী আমার, তবে

যাহার নিকট বলিলাম, তিনি কি বুঝিলেন ? তিনি বুঝিলেন, উল্লিখিত বস্তুতে আমার কর্ত্তৃত্ব আছে। আমি ইচ্ছাপূর্ব্বক ঐ বস্তুটী কার্য্যে প্রয়োগ করিতে পারি। অতএব যাহার দেহের প্রতি কর্ত্তৃত্ব নাই, আমার দেহ বলিয়া বোধ নাই, তেমন ধাতু, প্রস্তর, বৃক্ষ, লতাদি দেহী হইতে পারিল না। যাহা হউক, ভৌতিক পরমাণু সকল, আত্মা ও মন প্রভৃতিই যে জগতের মূল উপাদান তাহা নিশ্চিত।

ভৌতিক পরমাণু সকল নিয়মিত হইয়াই জগতের আকার প্রাপ্ত হইয়াছে। সুতরাং সমুদায় জাগতিক কার্য্য নিয়মের অধীন। নিয়ম ব্যতীত কোন ঘটনাই ঘটিতে পারে না। জগতের যত বিষয় বিদ্যমান, তাহার প্রত্যেক বিষয়ের মূলে নিয়ম আছে এ কথা সর্ব্ববাদী সম্মত। কেননা প্রসিদ্ধ জড়তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ এই মত অকাট্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন ; এবং নানাবিধ প্রমাণ প্রয়োগ করিয়া ইহার দৃঢ়তা সংস্থাপন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহারা চেষ্টা করুন বা না করুন, এমত যে অতিশয় দৃঢ় তাহার আর সন্দেহ নাই। এ বিষয়ে প্রসিদ্ধ ফরাসিস পণ্ডিত কোমত যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

কোমত বলেন, জড়তত্ত্ব নির্ব্বাচন করিতে মনুষ্য সমাজে তিন প্রকার ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে। প্রথম, পৌরাণিক, আধ্যাত্মিক বা ইচ্ছামূলক। দ্বিতীয়, দার্শনিক

কাল্পনিক বা শক্তিমূলক। তৃতীয়, বৈজ্ঞানিক, প্রামাণিক বা নিয়মমূলক। যখন মনুষ্য সমাজে জ্ঞানের ভাব অপরিস্ফুট ছিল, যখন মনুষ্যগণ প্রকৃতির সুন্দর সরল রেখার মধ্যবর্ত্তী ছিলেন, তখন তাঁহারা সকল বস্তুতেই এক একটী ইচ্ছাবিশিষ্ট কর্ত্তা অনুমান করিয়া থাকেন। যে বস্তুর উল্লেখ করেন, তাহার ইচ্ছা না থাকিলেও একটী ইচ্ছা কল্পনা করিয়া লন। যেমন অস্ফুট জ্ঞান বালক গতিশীল বন্দুক ও কৃত্রিম পুত্রকাদিতে ইচ্ছাবিশিষ্ট কর্ত্তা কল্পনা করে, যেমন বালকগণ অচেতন মৃৎপিণ্ডে বা উপলখণ্ডে আহত হইলে অথবা দেয়াল, কবাট ও কাষ্ঠাসন প্রভৃতিতে আঘাত পাইলে, ঐ সকল বস্তুতে ইচ্ছা বিশিষ্ট কর্ত্তা আছে বলিয়া প্রতিপ্রহার করে এবং তাহারই মত তাহারাও দুঃখ পাইল ভাবিয়া সন্তুষ্ট হয়। শিশুরা এরূপ করে কেন? তাহারা জগতের পূর্ব্বে আপনাকে দেখে, আপনার যেমন ইচ্ছা ভাবাদি আছে বলিয়া জানে, সেই রূপ জড় বস্তুতেও কল্পনা করে। তাহারা জানে তাহাদিগের যাহা ইচ্ছা তাহারা তাহাই করে, যাহা ইচ্ছা হয় না তাহা করে না। সুতরাং এ জগতে সকলকেই তাহারা আপনার মত ইচ্ছাবিশিষ্ট কর্ত্তা বলিয়া বিশ্বাস করে।

এইরূপ পৃথিবীর বাল্যাবস্থায় সরলপ্রকৃতি মনুষ্যগণও নিজের আনুরূপ্য লইয়া জগতের সকল ঘটনাতেই কর্ত্তা দেখিতেন। সুতরাং এই সকল কর্ত্তার ইষ্টানিষ্ট ফলদাতৃত্ব

শক্তি আছে বলিয়াও মান্য করিতেন। এই কারণে চন্দ্র, সূর্য্য প্রভৃতি জড়পিণ্ড দেবতা বলিয়া পূজিত হইয়াছে। এই কারণে অগ্নি, বায়ু, জল প্রভৃতি ভৌতিক বস্তু এবং মেঘ, বজ্র প্রভৃতি প্রাকৃতিক ঘটনার দেবত্ব সৃষ্টি হইয়াছে। অতি পূর্ব্বকালের ব্যাখ্যা বলিয়া কোমত ইহাকে—পৌরাণিক, এবং নিজের সচেতন ইচ্ছা বিশিষ্ট আত্মার আনুরূপ্য লইয়া হয় বলিয়া আধ্যাত্মিক ও ইচ্ছামূলক আখ্যা দান করিয়াছেন।

পরে যখন মনুষ্যের জ্ঞান ক্রমশঃ পরিমার্জ্জিত ও পরিস্ফুট হইতে থাকে, তখন কাজে কাজেই পূর্ব্ব সংস্কার পরিত্যাগ করা আবশ্যক হইয়া উঠে। একটি লোককে আমরা সাধু বলিয়া সম্মান করিতে পারি, যতক্ষণ তাহার চরিত্রে কোন কলঙ্ক না পাই, কিম্বা যতক্ষণ সেই কলঙ্কিত লক্ষণ গুলি আমার অজ্ঞাত ও অপরীক্ষিত থাকে। কিন্তু যদি পরীক্ষা করিয়া তাহাতে অল্প মাত্রও অসাধু ভাব দেখিতে পাই, অমনি সেই সাধুজনোচিত বিশ্বাস চলিয়া যায়, উহা এক মুহূর্ত্তও তিষ্ঠিতে পারে না। সেই রূপ চন্দ্র, সূর্য্য প্রভৃতি জড় পিণ্ড; অগ্নি, বায়ু, জল প্রভৃতি ভৌতিক পদার্থ; এবং মেঘ, বিদ্যুৎ প্রভৃতি প্রাকৃতিক ঘটনা, যত দিন অপরীক্ষিত ছিল, তত দিন দেবতা ছিল। যখন পরীক্ষায় জানা গেল যে চেতনের যে সকল লক্ষণ থাকা উচিত, তাহা তাহাদিগের নাই, তখন আর তাহাদিগের

দেবত্ব মনুষ্যহৃদয়ে অধিকার পাইবে কি রূপে? এই সময়ে মনুষ্য বুঝিতে পারিল, ঐ সকল বাস্তুবিক দেবতা নহে, উহারা জড়। তবে তাহারা কার্য্য করে কি রূপে? অগ্নি কত পুঞ্জ পুঞ্জ তৃণ কাষ্ঠ অবলীলা ক্রমে ভস্ম করিতেছে; বজ্র নিপতিত হইয়া কত মহা বৃক্ষ ও প্রাসাদমালা চূর্ণ করিতেছে; সমুদ্রের জল বিক্ষুদ্ধ হইয়া কত গ্রাম নগর ও পর্ব্বত পর্য্যন্ত প্লাবিত করিয়া ফেলিতেছে, এ সকল কার্য্য ইচ্ছা ও কর্ত্তৃত্ব না থাকিলে কিরূপে হয়? তখন অনেক তর্ক যুক্তির পর স্থির হইল যে, প্রত্যেক বস্তুতেই এক একটী কার্য্যকরী শক্তি আছে। সেই শক্তির বলে কার্য্য সকল সম্পন্ন হইতেছে। যেমন জলের শীতলতা অগ্নির দাহিকা শক্তি ইত্যাদি। এইরূপ মধ্যাবস্থায় বহুলপরিমাণ বহুদর্শনের পর "শক্তি" কল্পিত হয়। কোমত এই জন্য ইহাকে দার্শনিক, কাল্পনিক ও শক্তিমূলক আখ্যা প্রদান করিয়াছেন।

কিন্তু মনুষ্যের উন্নতিশীল জ্ঞান ইহাতে তৃপ্ত থাকিতে পারে না। কেননা এরূপ সিদ্ধান্তে কোন প্রকৃততত্ত্ব জানা যাইতে পারে না। অগ্নির দাহিকা শক্তি আছে, সেই জন্য সে তৃণ কাষ্ঠ প্রভৃতি দগ্ধ করিতে পারে, ইহাতে জ্ঞানের তৃপ্তি হইল কৈ? অগ্নিত কোন পদার্থ নহে। অবশ্য কোন নিয়মানুসারে অগ্নির উৎপত্তি হয় এবং দাহিকা শক্তি সেই নিয়মের ফল। অতএব মধ্যাবস্থার

কোন সিদ্ধান্ত সিদ্ধান্তের চরম সীমা বলিয়া স্বীকার্য্য নহে," সুতরাং ইহাতে জ্ঞান পরিতৃপ্ত হওয়া অসম্ভব। যখন ঈদৃশ দার্শনিক ব্যাখ্যাতেও মনুষ্য সন্তুষ্ট হইতে পারে না, তখন তাহারা প্রত্যেক বস্তু ও প্রত্যেক ঘটনার মধ্যে নিয়মানুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হয়। এইরূপ নিয়মানু-সন্ধিৎসু মনুষ্যই পরিতৃপ্ত হইতে পারে। কেননা তাহারা যত নিপুণ হইয়া চিন্তা করিতে থাকে, ততই রাশি রাশি নিয়মের বা প্রমাণের সূত্রসকল প্রত্যেক জগৎকার্য্যের মূলে দেখিতে পায়। ইহাকে কোমত বৈজ্ঞানিক, প্রামাণিক বা নিয়মমূলক উপাধি প্রদান করিয়াছেন।

কোমতের এই মতকে আমরা পণ্ডিতাভিমানীদিগের হৃদয়গ্রাহী বলিয়া স্বীকার করি। ইহা দ্বারা শিক্ষিতসমাজে যত দূর উপকার হওয়া উচিত, বস্তুতঃ তত দূর হইয়াছে কিনা সন্দেহ? কোমত বলেন, নিয়মেই সমস্ত বিশ্বব্যাপার চলিতেছে, নিয়ম ভিন্ন কিছুই হয় না ও হইতে পারে না, এবং নিয়ম ভিন্ন মনুষ্যের জ্ঞাতব্যও আর কিছু নাই। এ বড়ই দুঃখের বিষয় যে, নিয়ম বলিলেই যে নিয়ন্তাকে বুঝা অনিবার্য্য কোমতের মুখে একথাটী আসিল না। কেবল যে এই কথাটী আসিল না তাহা নহে। কোমত আবার বলিলেন, জগতের মূলকারণ মানুষের অপরিজ্ঞেয়। যদিও চেষ্টা করিলে এই সকল কথা দ্বারা কথঞ্চিৎ নাস্তিকতা খণ্ডিতে পারে, তথাপি কোমতের এই কথাতে দুইটী

অনিষ্ট হইয়াছে। প্রথমতঃ তিনি বলিয়াছেন, নিয়ম ভিন্ন মনুষ্যের আর জ্ঞাতব্য কিছু নাই, অথচ নিয়ম বলিলে নিয়ন্তাকে বুঝা স্বাভাবিক, এমন কি না বুঝিলেই চলে না। কোমত এই স্বাভাবিক বোধ্য বিষয়কে জ্ঞানের পথে আসিতে বলপূর্ব্বক বাধা দিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ "জগতের মূল কারণ অপরিজ্ঞেয়" বলাতে তিনি যে নিয়মমূলক ব্যাখ্যাকে চক্ষুষ্মত্তা প্রদান করিতে চাহিয়াছিলেন, চক্ষুষ্মতী হইয়াও উহা অন্ধ হইয়াছে।

কোমত জগতের তত্ত্বনির্ব্বাচনজন্য যে তিন প্রকার ব্যাখ্যার উল্লেখ করেন, তাহার উন্নতির ক্রম ধরিয়া দেখিলে আমরা ইহা অনায়াসে বুঝিতে পারি যে, কাল যত অতীত হইয়াছে, অনুসন্ধান যত বাড়িয়াছে, মনুষ্যগণ ততই ঈশ্বরের নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। কেননা পৌরাণিক সময়ে বরুণ জলের দেবতা বলিয়া পূজিত ছিলেন; দার্শনিক সময়ে সেই বরুণের দেবত্ব দূর হইয়া স্নেহশক্তির আধার বলিয়া গৃহীত হইয়াছেন ; পরে বৈজ্ঞানিক সময়ে সেই বরুণ উদজন ও অম্লজনের সমষ্টি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। অগ্নি পূর্ব্বে দেবতা, পরে দাহিকাশক্তিসম্পন্ন জড়, তৎপর রাসায়নিক কার্য্যের ফল বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। এইরূপে বুঝিতে অতি সহজ যে, যখন মনুষ্যগণ জড় বস্তুতে ঐশী শক্তি আরোপ করিতেন, তখন তাঁহারা প্রকৃত ঈশ্বরতত্ত্ব হইতে অনেক দূরে অবস্থান করিতেছিলেন। দার্শনিক সময়ে তাঁহারা

তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ নিকটসম্বন্ধে সম্বদ্ধ হইয়াছিলেন। তৎপর বিজ্ঞানসূর্য্য উদিত হইয়া মনুষ্যদিগকে আলোক দান করিল। তখন মনুষ্য বুঝিল যে নিয়ম ভিন্ন কিছুই হয় না। কোমত বলিয়াছেন, নিয়ম ভিন্ন মনুষ্য আর কিছুই জানিতে পারে না, একথা মিথ্যা। কেননা, নিয়ম কার্য্য। কার্য্য কি কখন কারণ ভিন্ন হইতে পারে? অতএব যেমন কার্য্য তেমন কারণ আছেই আছে; যেমন নিয়ম, তেমনই নিয়ন্তা আছেই। সুতরাং নিয়মের সঙ্গে সঙ্গে নিয়ন্তাকে বুঝাও স্বাভাবিক। কোমতও নিয়ন্তা না বুঝিয়া এই শৃঙ্খলাপূর্ণ জগতের কার্য্যে মনোযোগ দিতে সমর্থ হন নাই। তবে তাহা অপরিজ্ঞেয় বলিয়া চাপা দিয়া রাখিয়াছেন এই মাত্র। যাহা হউক, মনুষ্য যখন দার্শনিকদিগের কল্পিত বন্ধুরতাপূর্ণ সোপান অতিক্রম করে এবং বিজ্ঞানরূপ সমতল প্রশস্ত ক্ষেত্রে পদার্পণ করে, তখনই তাহারা সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের নিকটবর্ত্তী হয়। বিজ্ঞানই ঈশ্বরের বিচিত্র বিশ্বমন্দিরের প্রাঙ্গণভূমি। এই ভূমিতে পদার্পণ করিবামাত্র মনুষ্য বুঝিতে পারে, জগতের সমুদায়ই নিয়মের অধীন। সূর্য্য সৃষ্টিকাল হইতে শূন্য আকাশে ঝুলিয়া রহিয়াছে, নিয়মে। পৃথিবী প্রতিনিয়ত সেই সূর্য্যমণ্ডল প্রদক্ষিণ করিয়া বেড়াইতেছে, নিয়মে। চন্দ্র সেই সূর্য্য ও পৃথিবীর মধ্য দিয়া পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিতেছে, নিয়মে। বিদ্যুৎ নির্ঘোষিত হয়, নিয়মে।

পক্ষিসকল উড়িয়া যায়, নিয়মে; কুলায় নির্ম্মাণ করে, নিয়মে; ডিম্ব প্রসব করে ও শাবক পোষণ করে, নিয়মে। বায়ু বহিয়া জগতে প্রাণ বিতরণ করে, নিয়মে। ধূলি উড়িয়া যায়, নিয়মে। মনুষ্য মনে কখন কুভাব কখন সুভাব উদিত হয়, নিয়মে। অগ্নি প্রজ্বলিত হয়, নিয়মে; নির্ব্বাণ হয়, নিয়মে; এবং তৃণ কাষ্ঠাদি দগ্ধ করে, নিয়মে। মেঘ আকাশে সজ্জিত হয়, নিয়মে; বারিবর্ষণ করে, নিয়মে। যেমন নিয়ম ভিন্ন কার্য্য হয় না, তেমনি নিয়ন্তা ব্যতীতও নিয়ম হয় না। কোমত বলিয়াছেন, নিয়ম ভিন্ন মনুষ্যের আর কিছু জ্ঞাতব্য নাই, আমরা বলি, নিয়ম ভিন্ন মনুষ্যের অতি সহজ জ্ঞাতব্য নিয়ন্তা।

সুতরাং আমরা এস্থলে কোমতের শাসন মান্য করিতে পারি না। কেননা উৎপন্ন বলিলে উৎপাদক, সৃষ্টি বলিলে স্রষ্টা এবং নিয়ম বলিলে নিয়ন্তা, স্বাভাবিকরূপে আসিয়া উপস্থিত হয়। কোন কোন সম্প্রদায় বলেন, জগতের মূল উপাদান ভূত বা পরমাণু সকল নিত্য। সেই পরমাণু-পুঞ্জের যে পৃথক পৃথক প্রকৃতি আছে, তাহারা সেই প্রকৃতির বলে নিয়মিত হইয়া কার্য্য করে, সুতরাং সৃষ্টি-কর্ত্তার অস্তিত্ব স্বীকার করা অনাবশ্যক। আমরা এরূপ অন্ধতা স্বীকার করিতেও সম্মত নহি। প্রত্যেক উৎপন্নের উপযোগিতা দেখিলে, তাহাদিগের অন্তর্নিহিত নিয়ম ও শৃঙ্খলা দেখিলে, উৎপাদক বা স্রষ্টার মহান্ ভাব আপনা-

আপনি হৃদয়ে মুদ্রিত হয়। সুতরাং যাঁহারা দেখিয়া শুনিয়াও তাদৃশ মঙ্গলনিস্যন্দী ভাব গ্রহণ করিতে সম্মত নহেন, তাঁহাদিগকে অন্ধতার দোষ হইতে চেষ্টা করিলেও বাঁচান যায় না।

জগতের আভ্যন্তরিক ক্রিয়া হইতে আমরা কোন প্রাণবাহী শক্তির পরিচয় পাইতেছি। আবার জগতের বিপুলতা, জগতের সংখ্যাতিশয্য, ও জগতের মনোহর কৌশলপূর্ণতা দ্বারা স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হয় যে সেই শক্তি পরিমিত হইতে পারে না। পরিমিত শক্তির বলে তাদৃশ কার্য্যকলাপ সুন্দর প্রণালীমতে চলিতে পারে না। সুতরাং যাঁহার শক্তি অসীম, যাঁহার জ্ঞান অসীম, এইরূপ একটী অসীম গুণযুক্ত কর্ত্তার হস্তে জগতের সমুদায় কর্ত্তৃত্ব ভার না দিয়া আমরা কোনরূপেই থাকিতে পারি না।

কিন্তু মনস্তত্ত্ববিৎ পণ্ডিত জনষ্টুয়ার্ট মিল ঈশ্বরকে তেমন অনন্ত গুণের আধার বলিয়া স্বীকার করিতে সঙ্কুচিত হইয়াছেন। কেবল মিল কেন? কোমতও বলিয়াছেন "নিঃসন্দেহ প্রকৃতিকার্য্যে দোষ আছে"। ইহাঁরা এরূপ বলেন কেন? হয়ত তাঁহারা প্রাকৃতিক কার্য্যকলাপে অসামঞ্জস্য দর্শন করিয়াছেন, হয়ত ঈশ্বরের অপার কার্য্য প্রণালীর মধ্যে দয়া ও প্রেমের বৈষম্য দেখিয়াছেন। নিজের সূক্ষ্ম বুদ্ধিতে তাহার নিগূঢ় কারণ বাহির করিতে পারেন নাই, এজন্য ঈশ্বরকে অনন্ত শক্তি, অনন্ত দয়া, অনন্ত

প্রেম ও অনন্ত জ্ঞানের আধার না বলিয়া, শক্তিমান্, জ্ঞানবান্, দয়াবান্ মিল স্বীকার করিয়াছেন; কিন্তু কোমত তাহাও করেন নাই। তিনি কেবল এই বলিয়া নাস্তিক হইতে নিষেধ করিয়াছেন যে, যদি ঈশ্বরকে মানা যায়, তবে আমাদিগের কার্য্যকরী বুদ্ধিবৃত্তির সহিত সাদৃশ্য রক্ষা পায়, নতুবা বিশৃঙ্খল উপস্থিত হইবার কোন বাধা দেখা যায় না। কোমত যদি ঈশ্বর না মানিয়া কার্য্যসাধিকা বুদ্ধির সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিতে পারিতেন, তবে বোধ হয়, নাস্তিক হইতেন। তাঁহারা যে প্রকৃতির দোষ আছে বলিয়া প্রকৃতির স্রষ্টার ত্রুটি প্রতিপন্ন করিয়াছেন, তদপেক্ষা ঈশ্বরকে অস্বীকার করাই ভাল ছিল। কেননা ইহাতে প্রকৃতির কার্য্যপ্রণালীর গভীরতার মধ্যে তাঁহাদিগের অনেক যত্নে প্রবেশ করা বিফল হইয়াছে। বহু দিন শিক্ষা করিয়া, বহু আয়াস স্বীকার করিয়া, বহু গুরুর মত লইয়া তাঁহারা প্রাকৃতিক কার্য্যবিষয়ে কিয়ৎপরিমাণে যে জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তাহা দৃঢ় করিবার জন্য বাধ্য হইয়া তাঁহারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু যাঁহার সৃষ্টিকৌশল অল্পমাত্র বুঝিতেই তাঁহাদিগের জ্ঞান পরিশ্রান্ত ও প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছে, সেই স্রষ্টা ভূমা ঈশ্বরের কার্য্যে ত্রুটি আছে বলিয়া নিজের অভ্রান্ততা ও সেই অভ্রান্ত ঈশ্বরের ভ্রান্তিমত্তা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা কি সামান্য কৌতুকাবহ? তাঁহারা বড় জ্ঞানী, সুতরাং তাঁহাদের জ্ঞানের পরিমাণ অধিক

হওয়া উচিত, কিন্তু এ স্থলে অজ্ঞান ও অহঙ্কারের পরিমাণ বেশি হইয়া তাঁহাদের ভ্রম জন্মাইয়া দিয়াছে। কেননা ইহা অতি সহজেই বুঝা যাইতেছে, সৃষ্টির অপার কৌশল ও নিয়ম দর্শন করিয়াই তাঁহারা ঈশ্বরকে স্বীকার না করিয়া পারেন নাই, অথচ নিজের ক্ষুদ্রতা ও ভ্রান্তি পশ্চাতে রাখিয়া ঈশ্বরের ক্রটি দেখাইতে অগ্রসর হইয়াছেন। ধিক্ মানুষের বিদ্রোহিতা! ! ধিক্ মানুষের কৃতঘ্নতা!! তাহাদিগের এই রূপ দুশ্চেষ্টা দ্বারা ঈশ্বরের কিছুই ক্ষতি নাই, কিন্তু আমাদিগের আছে। যিনি ঈশ্বর তিনি ছোট হইলেও ঈশ্বর! ক্ষুদ্র কীটোপম প্রজার কি সাধ্য সেই ঈশ্বরের ক্ষতি করিতে পারে? কিন্তু ইহাতে প্রজার ক্ষতি হইতে পারে, যেহেতু প্রজা দুর্ব্বল। তাঁহারা ঈশ্বরের প্রতি যেরূপ আচরণ করিয়াছেন, তাহাতে আমাদের বিস্তর ক্ষতি হইয়াছে। কিন্তু একেবারে সব ক্ষতি করিতে পারেন নাই, উপকারও করিয়াছেন। উপকার কি? তাঁহারা ঈশ্বরকে যে অতি নিকৃষ্টভাবে স্বীকার করিয়াছেন, ইহাতেও অনেক অনিষ্ট নিবারণ হইয়াছে। ইহা দ্বারা তাঁহাদিগের উদ্ধত ও অন্ধ শিষ্যগণের অনেক প্রতিক্রিয়া করা হইয়াছে। যাহাদিগের দৌরাত্ম্যে ধর্ম্মাধর্ম্ম কর্ম্মাকর্ম্ম সমান হইতেছিল, সাধুধর্ম্মার্থিগণ সর্ব্বদা বেদনা পাইতেছিলেন, তাহাদিগের সাম্য লাভের এই এক মাত্র পথ আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাতেই আমরা অনেক উপকৃত হইয়াছি; কিন্তু সুখী হইতে

পারিলাম না কেন? ঈশ্বরের অপমান সহ্য করা যায় না এই জন্য। আমাদিগের একজন সামান্য বন্ধুর অপমান আমরা সহ্য করিতে পারি না, যিনি চিরকালের বন্ধু দীন হীনের বন্ধু তাঁহার অপমান কি সহনীয়? কখনই সেই জীবনসর্ব্বস্ব প্রাণের প্রাণ পরম পিতার অপমান ও অনাদর সহ্য করা যায় না। সুতরাং আমরা অসুখী।

এই সকল প্রদর্শিত উপায় ধরিয়া আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে, ঈশ্বর জগতের স্রষ্টা। সুতরাং ঈশ্বর হইতে জগৎ উদ্ভূত হইয়াছে ইহা বুঝিলাম। ঈশ্বর নিয়মের সহিত জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, জগৎ সেই নিয়মে প্রতিষ্ঠিত হইয়া আছে, ইহাও বুঝা গেল। এই সকল জগতের মধ্যে আমাদিগের প্রধান আলোচ্য বিষয় পৃথিবী। তবে আনুষঙ্গিকরূপে দুই একটী কথা অন্যত্রকারও বলা যাইতে পারে। জগতের স্বভাবানুসারে ইহাকে তিন ভাগে বিভক্ত করা গেল। প্রথম জড় জগৎ, দ্বিতীয় প্রাণি জগৎ, তৃতীয় অধ্যাত্ম জগৎ।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

জড় জগৎ।

জড় জগৎ কি? জড় বলিলে আমরা কি বুঝিব? জড় বলিলেই আমাদিগের মনোমধ্যে কতকগুলি অভাবের ভাব মুদ্রিত হয়। যাহার চলিবার বলিবার চিন্তা করিবার বুঝিবার ও বোধানুসারে কার্য্য করিবার শক্তি নাই, জড় বলিলে এরূপ কতকগুলি অভাবান্বিত বস্তুর ভাব আমাদিগের মনে পড়ে। বস্তুতও আমরা যাহাকে জড় বলি, তাহা এইরূপ অভাবশালীই বটে। পূর্ব্বে যে ভূতসকলের কথা বলা গিয়াছে, সেই ভৌতিক পরমাণু যাহার মূল উপাদান, তাহা এইরূপ অভাবগ্রস্ত জড়। জড়রাজ্যের অভাবের কথা চিন্তা করিলে মনে বিস্ময় উপস্থিত হয়। যখন ভাবিতে বসি, তখন জড়রাজ্য দুঃখের আলয়রূপে দেখিতে পাই। যাহাদের এত অভাব তাহারা কাহারও মুখাপেক্ষা করে না, তাহারা আপন অভাব দূর করিবার জন্য যত্নশীলও নহে। কি চমৎকার! অভাব আছে অথচ অভাব বুঝে না। অভাব না বুঝিলে দূর করিতে চেষ্টা হয় কাহার? যাহার দরিদ্রতার সীমা নাই, সে তাহা বুঝে না, ইহা কি সামান্য রহস্য? জড়ের যে এত অভাব, ইহার কারণ কি? ইহার কারণ কেবল, উপা-

দান। যেমন উপাদানে গঠিত, তাহা তেমনই গুণশালী। ভৌতিক পরমাণু সকল অচেতন, বোধ, ভাব ও ইচ্ছা বিহীন, সুতরাং অন্যসহস্রপ্রকার গুণশালী হইলেও তদ্দ্বারা সংগঠিত পদার্থ নিচয়ের সে অভাব থাকিবেই থাকিবে।

এই যে ভৌতিক পরমাণুসংগঠিত জড় রাজ্যের কথা বলিলাম, ইহার দুইটী প্রধান গুণ আছে। এক আকৃতি, অন্য বিস্তৃতি। সর্ব্বনিয়ন্তা পরমেশ্বর বস্তু সকলকে যেং গুণ বা প্রকৃতি প্রদান করিয়াছেন, তাহারা সেই সকল গুণানুসারে পরিচিত হইয়া থাকে। ভৌতিক পরমাণুর গুণ অনেক, কিন্তু প্রধান গুণ আকৃতি ও বিস্তৃতি। কেননা এই দুইটী গুণ সর্ব্বাগ্রে গৃহীত হইয়া থাকে, এবং এই দুইটী গুণ পরস্পর অপরিহার্য্য, একটী থাকিলে অন্যটিও থাকা চাই। যাহার আকৃতি আছে, তাহার বিস্তৃতি একান্তই থাকিবে; এবং বিস্তৃতিমৎ বস্তুর আকৃতি অবশ্যম্ভাবী। আকৃতি আছে, বিস্তৃতি নাই; এরূপ হইতে পারে না। আবার বিস্তৃতি থাকিলেও আকৃতি না থাকিলে চলে না। যাহার আকৃতি আছে, তাহা যদি এমত সূক্ষ্ম হয় যে আমরা উহা চক্ষু দ্বারা দেখিতে না পাই, তথাপি তাহা যে কিয়ৎপরিমাণ স্থান ব্যাপিয়া থাকিবে ইহার কোন সংশয় নাই।* আবার যাহা স্থান ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছে, তাহাও কোন না কোন আকার বিশিষ্ট হইবেই হইবে। কীটাণুসকল অতি সূক্ষ্ম, অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্য

ভিন্ন তাহাদিগকে আমরা দেখিতে পাই না, কিন্তু সেই যন্ত্র-বলে যখন তাহারা আমাদিগের ইন্দ্রিয়গোচরে সমানীত হয়, তখন তাহাদিগের আকৃতি ও বিস্তৃতি অতি সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি। এই রূপ যে সকল গন্ধবাহী পরমাণু বায়ু-যোগে আমাদিগের নাসিকা যন্ত্রে প্রবিষ্ট হয়, তাহাও কিয়ৎপরিমাণ স্থান ব্যাপিয়া থাকে, এবং এই সকল পরমাণু বহুসংখ্যক একত্রিত হইলে যে তাহারা আমাদিগের দৃষ্টিশক্তির আয়ত্ত হয়,ইহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই। যেমন মৃগনাভির গন্ধবাহী পরমাণুর যে সূক্ষ্ম অংশ আমাদিগের নাসিকাতে প্রবিষ্ট হয়, তাহার ব্যাপকতা ও আকৃতি কিছুই আমরা অনুভব করিতে পারি না, কিন্তু একটী মৃগ-নাভির দানা অবশ্যই আকার বিশিষ্টরূপে আমরা দেখিতে পাই, এবং স্থান ব্যতীত যে সেই দানাটী থাকিতে পারে না তাহাও আমরা বুঝি।

ভৌতিক পরমাণুর এই দুইটী গুণ ব্যতীত আরও অসংখ্য গুণ আছে। সেই সকল গুণ বিস্তার করিয়া বর্ণন করা এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে, সুতরাং সে সকল পরি-ত্যাগ করিয়া চলিলাম। কিন্তু এ কথাটী না বলিয়া পারি না যে তাহাদিগের যত কেন গুণ থাকুক না, তাহার সকল গুণই আমাদিগের ইন্দ্রিয়গণের উপযোগী। আমরা কখন শ্রবণ, কখন দর্শন, কখন ঘ্রাণ, কখন রসন এবং কখন স্পর্শ দ্বারা ভৌতিক বস্তু সকলের প্রকৃতি বা গুণ

অবগত হইয়া থাকি। শব্দ একটী ভৌতিক প্রকৃতি, ইহার সঙ্গে আমাদিগের শ্রবণেন্দ্রিয়ের উপযোগিতা আছে। প্রবহমাণ উষ্ণ শীতলাদির সহিত শ্রবণের কোন উপযোগিতা নাই কিন্তু স্পর্শেন্দ্রিয়ের আছে। এইরূপ ভৌতিক আকৃতি ও বিস্তৃতির সহিত দর্শনেন্দ্রিয়ের উপযোগিতা, সুগন্ধিদুর্গন্ধ্যাদির সহিত নাসিকার উপযোগিতা আছে। ভৌতিক বস্তুর এমন কোন বাহ্য গুণ নাই, যাহা ইন্দ্রিয়গণের অতীত। ইন্দ্রিয়গণেরও এমন কোন বৃত্তি নাই, যাহা জড়রাজ্য অতিক্রম করিয়া চলিতে পারে। ইন্দ্রিয়গণের সহিত ভৌতিক জগতের ঈদৃশ উপযোগিতা কি চমৎকার কৌশল !! ভৌতিক বস্তু ব্যতীত ইন্দ্রিয়গণ এক পদও অগ্রসর হইতে পারে না ; আবার ইন্দ্রিয় ভিন্ন জড় বস্তুও অকর্ম্মণ্য। এই রূপ উপযোগিতার প্রয়োজন কি ? চিন্তা করিলে শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠে, হৃদয় ভক্তিরসে আর্দ্র হইয়া যায়। আমরা যখনই মনোযোগ দিয়া চিন্তা করিতে বসি, তখনই বুঝিতে পারি, মনুষ্যজাতিকে নানাবিধ উপায়ে সুখী করাই তাদৃশ উপযোগিতার প্রয়োজন।

এস্থলে শুদ্ধ মনুষ্যজাতি বলাতে দোষ হইল কেহ কেহ বুঝিতে পারেন। যাহা বলা গেল, তাহা দ্বারা কেবল এইমাত্র প্রতিপন্ন হইতেছে যে জড় বস্তুর সহিত ইন্দ্রিয়গণের উপযোগিতা আছে। কিন্তু ইন্দ্রিয় কি কেবল মনুষ্যের ? না। ইতর জন্তুগণেরও ইন্দ্রিয়বৃত্তি

আছে। তবে " মনুষ্যজাতিকে সুখী করাই তাদৃশ উপযোগিতার প্রয়োজন " বলাতে অবশ্যই দোষ হইয়াছে? না। ইতর জন্তুদিগের জ্ঞান ভাবাদির সদ্ভাব নাই। সুতরাং চিন্তা, যত্ন ও অধ্যাবসায়ের সামঞ্জস্য তাহাদিগের মধ্যে দৃষ্ট হয় না। এজন্য বস্তু গুণ, ইষ্টানিষ্ট ও ফলাফল চিন্তা করিয়া তাহারা কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে পারে না। তাহা না পারিলেও জড়ের উপযোগিতার ফল সম্পূর্ণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। অতএব অতি সহজে বুঝা যাইতেছে যে, ইন্দ্রিয়গণ ভৌতিক বস্তুর উপযোগী হইলেও তাহারা কেবল উপযোগী মাত্র। জ্ঞান, ভাব ও ইচ্ছা এবং চিন্তা ও যত্নের সমাধান ব্যতীত শুদ্ধ ইন্দ্রিয়মাত্র দ্বারা কোন প্রয়োজন সিদ্ধ হইতে পারে না। পূর্ব্বে বলা গিয়াছে যে, বস্তুর গুণেই বস্তু পরিচিত হয়; কিন্তু কাহার নিকটে? বস্তুর গুণানুসারে বস্তুকে গ্রহণ করা কি ইন্দ্রিয়ের সাধ্য? কখনই না। ইন্দ্রিয়গণ বস্তুজ্ঞানের দ্বার মাত্র, গ্রহীতা নহে। জ্ঞানই গ্রহীতা। আবার ইচ্ছা ও ভাব সহায় না হইলে সে জ্ঞানও অচল। পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি প্রাণী, বৃক্ষ, লতা, গুল্ম প্রভৃতি উদ্ভিদ, সকলেই ভৌতিক বস্তুর গুণে কখন উপকৃত কখন বা অপকৃত হইতে পারে, কিন্তু সেই সকল বস্তুকে উপকারী কি অপকারী বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে না। আবার উপকার হউক, কি অপকার হউক, মানুষের নিকট

অগৃহীত থাকিতে পারে না। অতএব যদিও ইতর জন্তু-গণের মধ্যে প্রাকৃতিক উপযোগিতার স্থল কিয়ৎ পরিমাণে স্বীকার করা যায়, তথাপি পূর্ব্বোক্ত গুণসকলের অস-ম্ভাব হেতু মনুষ্যকেই সুখলাভসম্বন্ধে সর্ব্ব প্রধান বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবেক।

জড় বস্তু একটী কি দুইটী গুণের আধার নহে। অবস্থা ভেদে প্রত্যেক জড় বস্তু অগণ্য গুণের আধার। সঙ্কো-চন, প্রসারণ, অবসাদন, উত্তেজন, পরিবর্ত্তন, পোষণ, নিয়োজন, ও বিয়োজন প্রভৃতি অসংখ্য গুণ এবং ক্ষারত্ব, অম্লত্ব, তিক্তত্ব, কষায়ত্ব, কটুত্ব প্রভৃতি অগণিত রস জড় রাজ্যে অবস্থান করে। আবার এক বস্তুর সঙ্গে অন্য বস্তু মিলিত হইলে নূতন গুণ ও রস উৎপন্ন হয়। জড় যে এত গুণ ও রস পোষণ করে, ইহার কোনটী কি তাহার নিজের প্রয়োজনে আইসে? ভাবিয়া দেখিলে একটীও না। পূর্ব্বে ভৌতিক বস্তুর যে সকল অভাবসূচক লক্ষণ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তাহা দ্বারা জানা যায়, তাহারা ইন্দ্রিয়জ্ঞানবিরহিত; এবং জ্ঞান, ভাব ও ইচ্ছা প্রভৃতিও তাহাদিগের নাই। আবার জড়রাজ্যের গুণ ও রসসকল ইন্দ্রিয়গণের সাহায্যেই বোধ্য, অন্য প্রকারে নহে। যখন জড়ের ইন্দ্রিয়জ্ঞান নাই, তখন যে তাহার নিজের গুণ রসাদি অনুভব করিবার, নিজের সামর্থ্য নাই, ইহা অতি সহজে বোধ্য।

জড় যে কি রূপ গুণশালী, সে নিজে তাহা কিছুই জানে না; এবং জড়েতে যে সকল গুণ ও রস আছে, তাহা তাহার নিজের কোন প্রয়োজনেও আইসে না। অথচ বিধাতা জড় রাজ্যে এত গুণ এত রস ছড়াইয়া রাখিয়াছেন কেন? ইহা ভাবিলে হৃদয় পুলকে পূর্ণ হয়। ইহার প্রত্যেক গুণ ও রস মনুষ্যজাতির কৃতজ্ঞতা ও ভক্তির উদ্দীপক। জননীর স্তন্য হইতে চন্দ্র, সূর্য্য প্রভৃতি প্রকাণ্ড পদার্থনিচয় যতই চিন্তা করি, ততই দেখিতে পাই, ঈশ্বরের মঙ্গল হস্ত সর্ব্বদা আমাদিগের মস্তকোপরি প্রসারিত রহিয়াছে।

জড়ের গুণ ও রস সে নিজে অনুভব করিতে পারে না, সুতরাং স্বয়ং যথোপযুক্ত মতে যোগ বিয়োগ করিয়া উপ-কৃতও হইতে পারে না। এই জন্য জড় জগতে কোন উপকার অপকার সম্বন্ধও দৃষ্ট হয় না, কিন্তু জীবগণের উপকার অপকার সর্ব্বদাই দৃষ্ট হইতেছে। জীবগণের মধ্যে জড়ীয় গুণ কার্য্য করিতে পারে সত্য, কিন্তু মনুষ্য ভিন্ন কোন জীব ইচ্ছা মত উপকার লাভ করিতে পারে না। জড়ীয় গুণ জ্ঞানসহযোগে প্রযুক্ত না হইলে সর্ব্বথা মন্দ ফল প্রসব করাই সম্ভব। জ্ঞানই জড়ের সম্পূর্ণ উপযোগি-তার স্থল। জ্ঞান ব্যতীত জড় একেবারে অন্ধ ও অক-র্ম্মণ্য। সুতরাং নিশ্চিতরূপে জানা যাইতেছে যে জড় পরাধীন। জড়ের যাহা কিছু কার্য্য জগতে প্রতিষ্ঠিত হই-

য়াছে ও হইবে তাহা সম্পূর্ণ পরাধীনতায়। ইহা বড়ই এক রহস্য যে যাহার গুণে কার্য্য হয় সে কিছুই নহে, কিন্তু অন্যে তাহার ফল ভোক্তা। অন্ধ যেমন নিজের বলে প্রয়োজনীয় বস্তু গ্রহণে অসমর্থ, জড়ও সেই রূপ অন্য কর্ত্তৃক পরিচালিত ও প্রযুক্ত না হইলে উপযুক্ত কার্য্য করিতে অসমর্থ।

পূর্ব্বোক্ত আকর্ষণ, বিকর্ষণ, অবসাদন ও উত্তেজন প্রভৃতি ভৌতিক পরমাণুর গুণ নানা স্থানে নানা ভাবে প্রাকৃতিক নিয়মের অনুগামী হইয়া প্রকাশ পায়, তাহা দ্বারা আমাদিগের কখন উপকার ও কখন অপকার হইয়া থাকে। কখন ওষধিসকলের প্রাণপোষক গুণ বায়ু জল প্রভৃতির সহিত মিলিত হইয়া অশেষ মঙ্গল উৎপাদন করে, কখন তাহা প্রাণ বিনাশের কারণ হয়। কখন বিদ্যুদালোকের সাহায্যে অজ্ঞাত পথ জ্ঞাত হয়; কখন সেই বিদ্যুতের ভয়ঙ্কর শব্দে মূর্চ্ছা আনয়ন করে। কখন দুগ্ধ, দধি, ঘৃত, মধু প্রভৃতি দ্বারা শরীর পুষ্ট হয়, কখন এই সকল প্রাণপোষক বস্তুই বিষ-স্বরূপ হইয়া প্রাণ বিনাশ করে। যখন ভৌতিক বস্তু হইতে মন্দ ফল উৎপন্ন হইয়া আমাদিগের অনিষ্ট সাধন করে, তখন ঈশ্বরের মঙ্গল অভিপ্রায়ের প্রতি সন্দিহান হইয়া আমরা অধোগমন করি, কিন্তু প্রণিধান করিয়া দেখিলে আর সে রূপ হইতে পারে না। পূর্ব্বে প্রদর্শিত

হইয়াছে, ভূতের নিজের চিন্তা ভাবাদি নাই। ভৌতিক পরমাণুসকল অন্য প্রকৃতির অনুগত। জ্ঞানবলে প্রযুক্ত না হইয়া তাহা হইতে অবিতথ মঙ্গল আসিতে পারে না। আবার ইহাও বলা হইয়াছে যে ভূতের নিজের কোন প্রয়োজন নাই, প্রয়োজন চেতনের। সুতরাং যাহার জ্ঞান আছে, প্রয়োজনও তাহারই আছে। যাহার প্রয়োজন সে অন্ধ নহে, প্রকৃতি অন্ধ। যাহার প্রয়োজন সে যদি অন্ধভাবে না চলে, তবে তাহার মঙ্গল অসীম। জগতে সকল ঘটনাই নিয়মানুসারে ঘটে। ভৌতিক বস্তু সুফল প্রসব করে নিয়মে, আবার যখন দেখি তাহা হইতে কুফল জন্মিল, তখন বলি নিয়মের ব্যতিক্রমে। তবে কোথায় কি নিয়মে কোন ফল ফলিল, সে সকল অবগত হইবার শক্তি মনুষ্যের আছে। মনুষ্য জ্ঞানবলে সেই সকল নিয়ম হইতে আপন উপযুক্ত ফল বাছির করিয়া লইতে পারে। যে বিদ্যুৎ অন্ধভাবে পরিচালিত হইয়া লোকের প্রাণ বিনাশ করে, সেই বিদ্যুৎ জ্ঞানের আয়ত্ত হইয়া প্রাণ বিতরণ করে; এবং ভৃত্যবৎ দেশে দেশে সংবাদ বহন করে। যে বিষ অন্ধ ভাবে প্রযুক্ত হইয়া প্রাণ সংহার করে, সেই বিষ জ্ঞানপ্রভাবে প্রযুক্ত হইয়া প্রাণদান করে। অগ্নি বায়ু জল ও মৃত্তিকা প্রভৃতি ভৌতিক বস্তুসকল প্রাকৃতিক নিয়মের অনুগত হইলেও মনুষ্য ইচ্ছামতে তাহাদিগের পরিমাণের হ্রাস বৃদ্ধি; স্থল বিবেচনা করিয়া

প্রয়োগ; এবং কখন নিষ্পেষণ, কখন বিলোড়ন, কখন সঞ্চালন, কখন সন্তপ্ত করিতে পারে। মনুষ্য যাহা ইচ্ছা করিতেছে, তাহাতে তাহাদিগের এক বিন্দুও অনিচ্ছার ভাব নাই। যখন তাহারা মনুষ্যের অধীনতায় মনুষ্যের ইচ্ছামতে প্রযুক্ত হয়, তখনও তাহারা প্রাকৃতিক নিয়মের বাহিরে কিছুই করিতে পারে না। ভৌতিক বস্তু কোথায় কি ভাবে প্রযুক্ত হইলে কি ফল ফলিবে, মনুষ্য জ্ঞানবলে তাহা জানিতেছে এবং তাহাদিগকে আপন বশে রাখিয়া প্রয়োগ করিতেছে। সুতরাং সম্ভব ও আবশ্যকানুরূপ ফল পাইবার কোন বাধা জন্মিতেছে না।

যদি ভৌতিক বস্তু সকলের স্বাধীন ইচ্ছা ও চেষ্টা থাকিত, যদি তাহাদিগের জ্ঞান ও ভাব থাকিত, তবে কদাচ তাহারা অন্যের বলে চালিত ও প্রযুক্ত হইত না। সুতরাং তাহাদিগের সাহায্যে এখন জ্ঞানরাজ্যের সীমা যে পরিমাণে বিস্তৃত হইয়াছে, এত দূর কখনও আশা করা যাইত না। ইহা দ্বারা নিশ্চয় জানা যাইতেছে, জড় বস্তু অন্ধভাবে চিরকাল পরানুবর্ত্তন করিবে, মনুষ্য চতুরতা পূর্ব্বক তাহার ফলভোগ করিবে; এবং ঈশ্বরের অনন্ত প্রেম, অনন্ত দয়া ও অনন্ত মঙ্গল ভাবের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া অহর্নিশি কৃতজ্ঞ থাকিবে।

কেবল মৃৎপাষাণপ্রভৃতি বস্তুই যে পরাধীন, তাহা

নহে। বৃক্ষলতাদি উদ্ভিদসকলও এইরূপ। আশ্চর্য্য! যাহাদিগের জীবনমরণের সংবাদ পাওয়া যায়, অতি স্পষ্টরূপে যাহাদিগকে জীবিত থাকিতে ও মরিতে দেখা যায়, তাহারাও নিশ্চল, নিস্তব্ধ ও ইচ্ছাশূন্য। যদি ইহারা এরূপ না হইত, ওষধি, ঔষধ, মহা বৃক্ষ, ফল-বৃক্ষ, শাক ও স্তূপ প্রভৃতি দ্বারা আমরা এখন যত উপকার প্রাপ্ত হইতেছি, এত উপকার কখনই পাইতে পারিতাম না। আরও এক চমৎকার ঘটনা এই যে, যে বস্তু যত প্রয়োজনীয়, সে বস্তু তত সুলভ। যে বস্তু যত অল্প প্রয়োজনীয়, সে বস্তু তত দুর্লভ। লৌহ বড় প্রয়োজনীয়, অধিক পরিমাণে ব্যবহার না করিলে চলে না, এ জন্য তাহা অতি সুলভ। যত ব্যবহার করিতে পারি, ততই পাই। স্বর্ণ তত প্রয়োজনীয় নহে, কেবল অলঙ্কার গঠন ও নানাবিধ চাকচিক্যসাধন ও কখন কখন শরীর পোষ-ণের জন্য অল্প পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, এ জন্য তাহা অতি দুর্লভ। বহু কষ্টে অতি অল্প পরিমাণে পাওয়া যায়, যাহা পাওয়া যায়, তাহাতেই প্রয়োজন সম্পন্ন হইতে পারে। আবার যে দেশে যে বস্তুর সদ্ভাব অধিক, সে বস্তুর উপযোগিতাও সেই দেশে অধিক। বাদাম, পেস্তা, আকরোট প্রভৃতি উষ্ণতাসাধক, এ জন্য তাহা গ্রীষ্মপ্রধান দেশে জন্মে না; ইক্ষু, আনারস প্রভৃতি উষ্ণপ্রধান দেশের প্রধান সামগ্রী। আবার

শীতকালে যে বস্তু জন্মে তাহা উষ্ণবীর্য্য, গ্রীষ্মকালের উৎপন্ন বস্তু শীতবীর্য্য। ইহা দ্বারা আমরা স্পষ্ট বুঝিতে পারি, মনুষ্যজাতির অশেষ মঙ্গল সাধনই জড় জগতের প্রয়োজন। নাস্তিকেরা মানুন আর না মানুন, আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিব, জগতের প্রতিপরমাণু হইতে ঈশ্বরের মঙ্গল ভাব বিজৃম্ভিত হইতেছে।

জড় জগৎ কি? কোথা হইতে আসিল? কি রূপে অবস্থিত? ইহার স্বভাব ও প্রয়োজন কি? সংক্ষেপতঃ বলা হইল, এখন প্রাণিজগতের বিষয় বলিতে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে।

তৃতীয় অধ্যায়।

প্রাণিজগৎ।

প্রাণিজগৎ কাহাকে বলে? যাহার প্রাণ আছে, তাহাকেই প্রাণিজগৎ বলা যাইতে পারে। প্রাণ কি? প্রাচীন কালের পণ্ডিতগণ শরীরস্থ পঞ্চ বায়ুকে প্রাণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা, প্রাণ, অপান, সমান, উঁদান, ব্যান। শরীরগামী এই বায়ুপঞ্চকের সমষ্টি সাধারণভাবে প্রাণ শব্দের বাচ্য। বায়ু নানাবিধ নাই, একই বায়ু স্থলভেদে বিভিন্ন নামে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। হৃদয়ে প্রাণ, গুহ্যে অপান, নাভিতে সমান, কণ্ঠদেশে উদান, এবং সমস্ত শরীর ব্যাপিয়া ব্যান বায়ু অবস্থান করে। আধুনিক পণ্ডিতগণ বায়ুর ভূতত্বের সঙ্গেং উহার প্রাণত্বও বিদূরিত করিয়া দিয়াছেন। তাঁহারা প্রাণকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জড় পদার্থের সহিত স্বরূপতঃ এক করেন নাই। প্রাণের কার্য্য দর্শনে তাহার একটী লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ব্যক্তিত্বসাধক সংযোগ ও বিয়োগকর আন্তরিক দ্বিবিধ গতি তাঁহাদিগের মতে প্রাণ। ফলতঃ যেখানে ইন্দ্রিয়ের গমনের অধিকার নাই, সেখানে এই রূপ লক্ষণ দ্বারা পদার্থ নির্ণয়ই যুক্তিযুক্ত। উদ্ভিদ হইতে সমুদায় জীবে এই প্রাণের ক্রিয়া দৃষ্ট হয়। ইহাই জড়ীয় উন্নতির চরম সীমা বলা যাইতে পারে।

পূর্ব্বাচার্য্যগণ চেতন ও অচেতন দুই শ্রেণীতে পদার্থ সকল বিভক্ত করিয়াছেন। ইহাতে মনুষ্যপশুপ্রভৃতি এক শ্রেণী ও বৃক্ষপ্রস্তরাদি সমুদায় অপর শ্রেণী ভুক্ত হইয়াছে। যথার্থরূপে বিভাগ করিলে, নিম্নতর উদ্ভিদ সজীব জড় এবং কীটপতঙ্গগোমনুষ্যপ্রভৃতিকে সাধারণতঃ প্রাণী বলা যায়। কেননা উহাদিগের মধ্যে তারতম্যে চেতনের ক্রিয়া আছে। চেতনত্বসম্বন্ধে মনুষ্য সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ। কেননা আর সকলের মধ্যে যাহা দেখিতে পাওয়া যায় না, তাঁহাতে তাহা আছে। তাঁহাতে জ্ঞান আছে, বুদ্ধি আছে, ভাব আছে, ইচ্ছা আছে। সুতরাং বোধবিশিষ্ট জ্ঞানী মনুষ্যদিগকে পশুপক্ষীর শ্রেণী ভুক্ত করাতে মনুষ্যজাতির বিশেষ অগৌরব করা হইয়াছে। এই দোষপরিহারমানসে প্রাণি-জগৎসম্বন্ধে একটী স্বতন্ত্র অধ্যায় লিখিত হইতেছে। ইহাতে উহার সাধারণ ভাবগুলি কিছু২ উল্লিখিত হইবে। পূর্ব্বকালের বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ জগৎকে চেতন অচেতন দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। সুতরাং এই সুযোগে পুরাণপ্রণেতা-গণ পশুপক্ষীর পরলোক ও পাপপুণ্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন: এবং মনুষ্যদিগকেও পাপ করিলে পশুপ্রভৃতি নিকৃষ্ট যোনি প্রাপ্ত হইবার ভয় দেখাইয়াছেন। ঐ সকলের অবৈধতা প্রতিপন্ন করিবার মানসেই প্রাণিজগৎ বলিয়া একটী স্বতন্ত্র অধ্যায় করা আবশ্যক, নতুবা প্রয়োজন ছিল না।

আমরা সৃষ্টিকার্য্যের প্রতি মনোযোগ দিয়া চিন্তা

করিলে দেখিতে পাই, সমস্ত জগতেই একটি আপেক্ষিক উৎকৃষ্টতার ভাব আছে। সাধারণ জড় রাজ্যের বিষয় আলোচনা করিয়াও তাহার মধ্যে আমরা এই আপেক্ষিক উৎকৃষ্টতা দেখিতে পাইয়াছি। অগ্নি,বায়ু,জল,ধাতু,প্রস্তর ও মৃত্তিকা হইতে লতা গুল্মাদি উৎকৃষ্ট ও উন্নত। মহাবৃক্ষ ও ফলবৃক্ষাদি গুল্মলতাপ্রভৃতি হইতে উৎকৃষ্ট। আবার সে দিন আমরা যে মাংসভোজী বৃক্ষের কথা শুনিয়াছি, তাহা যে সমস্ত বৃক্ষশ্রেণী হইতে উন্নত, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ইতঃপর প্রাণীদিগের মধ্যে অনুসন্ধান করিলেও এই আপেক্ষিক উন্নতির চিহ্ন দেখিতে পাই। প্রাণীদিগের মধ্যে কীটজাতি সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট। যে সকল কীট মনুষ্যের উদরে জন্মগ্রহণ করে, যাহারা পচা ক্ষত, কিম্বা দুর্গন্ধময় বাস্পমধ্যে জন্মে, তাহারা সকলেই এক রূপ। আবার বিছা প্রভৃতি সরীসৃপ তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট। তদপেক্ষা টিকটিকী, গিরগিটী, সাপ, গোসাপ প্রভৃতি উন্নত। এইরূপ উন্নতির স্রোত বানর ও বনমানুষে গিয়া সীমা বদ্ধ হইয়াছে।

চেতনা। পূর্ব্বে যে প্রাণের লক্ষণ বলা হইয়াছে, উহাকে জীবনী শক্তি বলা যায়। চেতনা তদপেক্ষা উচ্চ। চেতনাশক্তিবলে জীবগণ জগতে ইচ্ছামতে বিচরণ করিতে পারে; এবং এই জন্য উহারা পূর্ব্বতন পণ্ডিতবর্গের কৃপায় মনুষ্যের সঙ্গে সবর্গত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে।

ইন্দ্রিয়বোধ। প্রাণীদিগের ইন্দ্রিয় আছে, অর্থাৎ দর্শন, শ্রবণ, রসন, ঘ্রাণ ও স্পর্শন শক্তি আছে। কিন্তু ইহাদিগের ইন্দ্রিয়জ্ঞান অতি যৎসামান্য। ইহারা ইন্দ্রিয়শক্তি দ্বারা কোন বস্তুর প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হইতে পারে না, কেবল সামান্য ভাবে একটা বস্তু বলিয়া বুঝে মাত্র। এই ইন্দ্রিয়শক্তি সকলের সমান নহে, কোন কোন পশু পক্ষী এই শক্তির তীক্ষ্ণতা জন্য সর্ব্বদা মনুষ্য সমাজে পূজিত। কুকুরের শ্রবণশক্তি ও ঘ্রাণশক্তি এত প্রবল যে একটা পতঙ্গ উড়িলেও তাহারা টের পায়, এবং ব্যাঘ্র প্রভৃতি বন্য জন্তুর গন্ধ পাইবামাত্র তাহাদিগের উদ্দেশে ধাবিত হয়। আবার জলৌকা প্রভৃতি অনেক প্রাণীর ইন্দ্রিয়জ্ঞানেরত কথাই নাই, অনেক ইন্দ্রিয়ই নাই। সর্পদিগের শ্রবণেন্দ্রিয় নাই, এজন্য তাহারা চক্ষুঃশ্রবা বলিয়া প্রসিদ্ধ। এইরূপ ইতরপ্রাণীদিগের কাহার ইন্দ্রিয়শক্তি অধিক, কাহারও অল্প। আবার কাহার অধিকাংশ ইন্দ্রিয় নাই।

বুদ্ধি। ইতরপ্রাণিগণের বুদ্ধি আছে, কিন্তু অতি অল্প। যতটুকু হইলে তাহাদিগের চলিবার সম্ভব, ততটুকু মাত্র বুদ্ধি তাহাদিগের আছে। এই বুদ্ধিবলে ইহারা বাসস্থান নিরূপণ ও নির্ম্মাণ করে, ভাবী বিপৎপাত হইতে রক্ষা পাইবার চেষ্টা করে, কথন২ কৃতজ্ঞতা প্রতিহিংসা প্রভৃতিও প্রকাশ করিয়া থাকে, এবং উপদিষ্ট কার্য্য

করিতে ও কথা শিখিতেও সক্ষম হয়; কিন্তু এই বুদ্ধির ভাগ সর্ব্বত্র সমান নহে। এমন কি; কোন২ স্থানে একবারেই নাই বলিলে হয়।

ইচ্ছা। ইহাদিগের ইচ্ছা আছে। যখন ইন্দ্রিয়শক্তি আছে, তখন সুখ দুঃখ বোধ না থাকিলে চলে না। সুতরাং সুখের প্রতি ইচ্ছা, দুঃখের প্রতি অনিচ্ছা হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু ইহাদিগের ইচ্ছা বিশুদ্ধ জ্ঞানানুমোদিত নহে। উহা অন্ধ, প্রকৃতি ও ইন্দ্রিয়গণের অধীন। সুতরাং ইন্দ্রিয়গণ যে দিকে টানে, ইহারা সেই দিকেই যায়, তাহার বৈধাবৈধ বিবেচনা করিতে পারে না। পতঙ্গ সকল অগ্নির চাকৃচিক্য দেখিয়া বিমুগ্ধ হয়, হরিণ বংশীরব শুনিলে বিমুগ্ধ হয়, মৎস্যগণ মাংসখণ্ডাবৃত বড়িশ দেখিয়া প্রতারিত হয়, ইহা প্রসিদ্ধ। কেবল প্রতারিত হয় তাহা নহে, প্রাণ পর্য্যন্ত হারায়। অতএব ইহাদিগের বুদ্ধি ও তৎসহযোগিনী ইচ্ছা ইন্দ্রিয়গণের অনুগত সুতরাং অন্ধ।

ইতর জন্তুদিগের চেতনা শক্তি, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়বৃত্তি ও ইচ্ছা প্রভৃতি অল্প পরিমাণে আছে বলিয়া ইহারা কথা শিখিতে ও কার্য্য করিতে পারে। কথা শিখিবার সামর্থ্য পক্ষিগণের মধ্যেই প্রচুর। শুক ও সারী প্রভৃতি পক্ষিজাতি এই বাক্‌শক্তির জন্যই জগতে পূজিত। হস্তী, অশ্ব, গো, মহিষ প্রভৃতি কার্য্যের জন্যই আদৃত। কিন্তু ইহাদিগের শিক্ষিত ভাষা ও কার্য্যপ্রণালী শিক্ষার সীমাব্র

মধ্যে পর্য্যবসিত। পশুপক্ষিপ্রভৃতিরা বড় সুশিক্ষিত হইলেও তাহাদিগের শিক্ষার যতটুকু সীমা চিরকাল তন্মধ্যে বিচরণ করিবে, শিক্ষিত ভাষা অতিক্রম করিয়া এক পদও অগ্রসর হইতে পারিবে না। পশুরা বিবিধ কার্য্য করিতে পটু, পক্ষীরা নানাবিধ কৌশলময় বাক্য বলিতে পটু, ইহা অনেক স্থলে দেখা ও শুনা গিয়াছে। কিন্তু এরূপ কখন দেখা কি শুনা যায় নাই যে তাহারা আপনার শিক্ষাপদ্ধতি অতিক্রম করিতে পারিয়াছে। পশুগণ প্রতিদিন কিম্বা প্রায়শঃ যে কার্য্যে প্রবর্ত্তিত হয়, অথবা কার্য্য করিতে দেখে, তাহাই করিতে পারে; পক্ষীগণ প্রতিদিন আপন প্রভু ও প্রভুর পরিবার মধ্যে যে সকল কথা শুনিতে পায়, অথবা যাহা বলিবার জন্য উত্তেজিত হয়, তাহা বলিতে পারে; কিন্তু সেই প্রদর্শিত সীমার এক বিন্দুও বাহিরে যাইতে পারে না। একটি শুক ও সারমেয় দস্যু গৃহে শিক্ষিত ও পালিত হইলে, তৎ-পরিবারোচিত ভাষা ও কথঞ্চিৎ কার্য্যপ্রণালী শিক্ষা করিতে পারে, কিন্তু সেই শুক ও সারমেয় স্থানান্তরিত হইলে, নূতন স্থানোচিত ভাষা ও কার্য্যকলাপে মনোযোগ দিতে অসমর্থ। যে শুক কিম্বা সারিকা বৈষ্ণব গৃহোচিত শিক্ষা পাইয়াছে, সে শাক্ত গৃহে নীত হইলে আপন শিক্ষিত বিষ্ণু কৃষ্ণাদি নাম ভিন্ন অন্য নাম বলিবে না, এবং তাড়িত কিম্বা তিরস্কৃত হইলেও "বিষ্ণু আমার উপাস্য, আমি

এ নাম পরিত্যাগ করিয়া অন্য নাম বলিব না” বলিতে পারে না। অথবা যে কুকুর তস্করের গৃহে শিক্ষিত, সে চৌর্য্যের সাহায্য করিতে পারিবে; কিন্তু পরোপকার প্রভৃতি ধর্ম্মের সাহাষ্য করিতে পারিবে না। কেবল ইহাই বুঝিতে পারিবে না; তাহা নহে। তাহারা ইষ্টানিষ্ট বুঝিতে পারিবে না। উচিত, অনুচিত, পাপ, পুণ্য, দণ্ড, পুরস্কার, সত্য, মিথ্যা, বস্তুগুণ, কার্য্যকারণ এ সকল কিছুই বুঝিবে না। কেন বুঝিবে না? জ্ঞান ভাবাদি নাই এই জন্য। সুতরাং সেই সকল কার্য্য করিবার প্রয়োজন কি? বিষ্ণু কৃষ্ণাদি নামই বা কেন উচ্চারিত হয়? শাক্ত মহাশয়েরই বা তাহাতে অরুচি কেন? সে তাহা জানে না এবং বুঝে না। কেবল স্বতই যে বুঝে না, তাহা নহে; বুঝাইলেও বুঝে না। এক জন একটী পশুকে “পরের শস্য ভক্ষণে অপরাধ” বুঝাইলেন, বুঝিল না। প্রহার করিলেন, তবুও বুঝিল না। আবার পরের শস্য খাইল। কারণ কি? আত্মজ্ঞান নাই, সুতরাং মানাপমান বোধও নাই। আত্মা থাকিলেই আত্মাদর থাকে, আত্মাদর থাকিলেই মানাপমান বোধ থাকে। যখন আত্মা নাই, আত্মাদর নাই, তখন উন্নতি অবনতিও নাই। পশুদিগের, পক্ষীদিগের এবং অন্যবিধ প্রাণীদিগের মধ্যে সামাজিকতা আছে; কিন্তু তাহা কেবল প্রয়োজনীয় বস্তুসংগ্রহ, বিপদ হইতে আত্মমোচন ও বাসস্থান নিরূপণেই সীমাবদ্ধ। সুতরাং তাহাকে প্রকৃত সামাজিকতা বলা

যায় না। ঐ সকল কার্য্য তাহাদের প্রকৃতিমূলক বলা যাইতে পারে। তাহাদিগের যেমন প্রকৃতি, ঠিক সেই রূপে চলে, তাহার এক বিন্দুও অন্যথা করে না। আত্মা ভিন্ন প্রকৃতি ও শিক্ষার প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইবার আর কাহারও সাধ্য নাই। বস্তুতঃ জ্ঞান, যাহা সমস্ত মোহান্ধকার বিনাশের একমাত্র সাধন; উদার প্রীতি, যাহা জগৎ ও ঈশ্বরের রসবত্তা ও বিশুদ্ধ সৌন্দর্য্য গ্রহণে সমর্থ; স্বাধীন ইচ্ছা, যাহা সমস্ত পাপমলিনতার প্রতিকূলে অগ্রেসর হইতে সক্ষম, ইতর প্রাণীদিগের তাহা নাই, অতএব ইতর জন্তুদিগকে সাত্মক বলিলে বড়ই দোষ হয়। যাহার আত্মা নাই, তাহার উন্নতি অবনতিও নাই, ধর্ম্মাধর্ম্ম নাই, সত্য মিথ্যা নাই, ইহকাল পরকাল নাই। ফলতঃ যাহার জন্য মনুষ্যের মহত্ত্ব তাহাদিগেতে তাহার কিছুই নাই।

যেমন এক দিকে তাহাদিগের অভাবের সীমা নাই, অন্য দিকে তেমনি তাহাদিগের সদ্ভাবও অনেক আছে। তাহারা আহার্য্য বস্তুর স্বাদ বৃদ্ধি করিতে পারে না, এজন্য স্বাদবৃদ্ধির প্রয়োজনও হয় না, সচ্ছন্দ অনায়াসলভ্য আহার্য্যে উদর পূর্ত্তি করে। বস্ত্র প্রস্তুত করিতে পারে না, সুতরাং বস্ত্র প্রস্তুত করিতে প্রয়োজনও হয় না; ইহাদিগের দেহ, স্বভাবজাত নানাবিধ উৎকৃষ্ট উপকরণে সজ্জিত। বস্তুতঃ ভাবিয়া দেখিলে ইহাদিগের যাহা প্রয়োজন তাহা আছে। জগৎপাতার অব্যাহত নিয়মের

প্রসাদে, অক্ষুণ্ণ সমদর্শিতা ও বিচারশক্তির প্রসাদে, অনেক অভাব থাকিলেও অচলতা নাই।

ইহাদিগের যাহা আছে, তাহার উপযোগিতা আছে, যাহা নাই তাহার উপযোগিতাও নাই। ইহাদিগের কিয়ৎ পরিমাণে চেতনা, কিয়ৎ পরিমাণে বুদ্ধি শক্তি নিতান্তই প্রয়োজনীয়। ইহাদিগের এই সকল বৃত্তি যথাযথ না থাকিলে সংসারের যত কার্য্য তাহারা এখন সম্পন্ন করিতেছে, তাহা করিতে পারিত না। যদি অশ্বের চেতনা, ইন্দ্রিয়বোধ ও বুদ্ধি শক্তি না থাকিত, উহাকে যথানিয়মে পথের উপর দিয়া তীব্র বেগে চালান এবং পথবাহী অন্য পশু ও মনুষ্যকে তাহার পদ প্রহার হইতে রক্ষা করা দুষ্কর হইত। আবার রণক্ষেত্রের নির্ভীকত্ব ও গতিচাতুর্য্য শিক্ষা দিয়া আত্মরক্ষার সাহায্যও লওয়া যাইত না। এতদ্ব্যতীত হস্তী, উষ্ট্র প্রভৃতি জন্তুকে এখন আমরা যেরূপ উপকারী বলিয়া বুঝিতেছি, এরূপ বুঝিতে কদাচ সমর্থ হইতাম না। বলদ ও গর্দ্দভ প্রভৃতি জন্তুর যদি পূর্ব্বোক্ত বৃত্তিসকল যথাযথ না থাকিত, তাহারা এত কার্য্যসাধনোপযোগী কখন হইত না। আবার এখন তাহাদিগের যেরূপ অবস্থা ও যেরূপ স্বভাব আছে, তাহা অপেক্ষা তরতম হইলেও পূর্ব্বোক্ত কার্য্যসকল চলিবার পক্ষে বাধা জন্মিত। উন্নতিশীল জ্ঞান, উদারভাবগ্রাহিতা ও স্বাধীন ইচ্ছা প্রভৃতি থাকিলে তাহাদিগকে বশে রাখিয়া

কার্য্য চালান দুষ্কর হইত। বশে রাখিতে না পারিলেও বিশ, ত্রিশ, চল্লিশ, আশী, নব্বই টাকায় বলদ ; শত সহস্র মুদ্রায় অশ্ব এবং দ্বিসহস্র বিশ সহস্র মুদ্রায় হস্তী ক্রয় করা বোধ হয় নিষ্ফল হইত। কোন২ সম্প্রদায় পশু প্রভৃতিকে কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া কষ্ট দেওয়া পাপ মনে করেন। বস্তুতঃ যদি তাহাতে পাপ হওয়া স্বাভাবিক হইত, তবে তাহারা এরূপ কার্য্যোপযোগী হইত না। যখন তাহারা কার্য্যের উপযোগী, তখন কার্য্যকরাণ ও তজ্জন্য কথঞ্চিৎ শ্রান্তি প্রদান পাপ নহে। তবে নিষ্ঠুরতা অবশ্যই পাপ। যে সকল প্রাণী দুর্ব্বল, রুগ্ন ও বৃদ্ধ, যাহাদিগের কার্য্য করিবার বস্তুতঃ সামর্থ্য নাই, যাহারা আপন শরীরের গুরুত্ব বহন করিতেই অসমর্থ, অর্থের লোভে তাহাদিগকে কার্য্যে নিযুক্ত করা ও মরণোপম যন্ত্রণা দেওয়া অবশ্যই পাপ। নতুবা কেবল কার্য্য করা যদি পাপ হয়, তাহা হইলে মনুষ্যের পক্ষেও কার্য্য করা পাপ হইতে পারে। যখন শরীর আছে, যখন শরীরের বল ও স্পর্শ শক্তি আছে, তখন কথঞ্চিৎ শ্রান্তি বোধ হওয়া স্বাভাবিক। তাদৃশ শ্রম উপকারী ব্যতীত অপকারী নহে। কেননা শ্রম দ্বারা শারীরিক রক্ত ও মাংস প্রভৃতি উপাদান সতেজ হয়। সুতরাং দীর্ঘ জীবন লাভ করা যায়। শ্রম করা আবশ্যক জন্যই কৃপানিধান পরেশ্বর তাহার উপযোগিতা দিয়াছেন। নতুবা এরূপ উপযোগিতা থাকিত না।

চতুর্থ অধ্যায়।

অধ্যাত্ম জগৎ।

অধ্যাত্ম জগৎ কি? যে জগতে সর্ব্বাপেক্ষা আত্মা প্রধান এবং আত্মাকে আশ্রয় করিয়াই আর সকল বসতি করে, তাহাকেই আমরা অধ্যাত্ম জগৎ বলিব। আত্মা কি? এ প্রশ্নটী নিতান্ত সহজ নহে। জগতে এরূপ কোন পদার্থ নাই, যাহা দ্বারা আত্মার সাদৃশ্য প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে। জগতে যত ভৌতিক উপাদান আছে, তাহার কোন উপাদানে আত্মা নির্ম্মিত হয় নাই, সুতরাং আত্মার পরিচয় দিবার নিমিত্ত কোন নির্দ্দিষ্ট বস্তুর সাহায্য পাইবার আশা নাই। এই জন্য আমরা আত্মসম্বন্ধে কয়েকটী নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ মাত্র বলিতে পারি। যথা—জ্ঞান, ভাব, ইচ্ছা এই তিনটী আত্মার নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ; অথবা এই তিনটীকে আত্মার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বলা যাইতে পারে। এই তিনটী লক্ষণ যাহাতে অবস্থান করে, তাহাই আত্মা শব্দে অভিহিত। এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, এই লক্ষণত্রয় কিসে অবস্থান করে? ইহার উত্তরে আমরা এইরূপ বলিব, আত্মাতে। বিষয় ও বিষয়ীর সম্বন্ধনির্ব্বাচন শক্তির নাম জ্ঞান; হর্ষ শোকাদি রসগ্রাহিতার নাম ভাব; এবং কার্য্যে প্রবর্ত্তিনী শক্তির নাম ইচ্ছা। জ্ঞান আত্মাকে বিষয় বিষয়ীর সম্বন্ধের কথা বলিয়া দেয়, ভাব তাহার মধ্যে রসালতা দোহন

করিতে নিবুক্ত হয়, এবং ইচ্ছা সেই সম্বন্ধ ও সৌন্দর্য্য দেখিয়া যখন বিমুগ্ধ হয়, তখন আত্মাকে কার্য্য করিবার জন্য উত্তেজিত করে। সুতরাং ইহাই সত্য যে এই লক্ষণত্রয় যাহার আছে, তাহাই আত্মা। জিজ্ঞাসু পাঠক! তুমি যদি ইহাতে আপত্তি কর, যদি বল "আমাকে স্পষ্টরূপে না দেখাইলে মানিব না।" তবে আমি বলিব, জগতে যাহা লক্ষ্য বা বিশেষ্য নামে খ্যাত, তাহার একটীকেও স্পষ্টরূপে বুঝাইবার উপায় নাই। সকলকেই লক্ষণ বা বিশেষণ দিয়া বুঝিতে হইবে। কেননা জগতে এরূপ কোন বস্তুর সৃষ্টি হয় নাই, যাহা সম্পূর্ণরূপে অন্য বস্তুর সমান হইতে পারে। যেমন আম্র একটী বিশেষ্য বস্তু; কিন্তু আম্রের সমান, আম্র ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না। সেই রূপ কোন বস্তু সম্পূর্ণ ভাবে অন্য বস্তুর সমান হইলে, তাহার পার্থক্য রহিল কৈ? যদি পার্থক্য কিছুই না থাকিল, তবে অন্য বস্তুর সমান, সুতরাং সে বস্তু এ বস্তু একই হইয়া যায়। মনে কর, যে ব্যক্তি হস্তী কিরূপ জানে না, তাহাকে হস্তী বুঝাইতে হইবে। তখন তুমি কি করিবে? তুমি হয়ত, একটী হস্তীর প্রতিমূর্ত্তি এক খানি ফলকে অঙ্কিত করিয়া দেখাইবে; অথবা তুমি যদি আরও নিপুণ হও, এবং অধিক স্পষ্ট করিয়া বুঝাইতে চাও, তবে না হয় মৃত্তিকা প্রভৃতি উপকরণ লইয়া একটী সুন্দর হস্তীর মূর্ত্তি গঠন করিয়া দেখাইবে। কিন্তু তাহাতে হস্তী দেখান হইল কৈ? সে

কেবল হস্তীর আকার দেখান হইল। অতএব পুনর্ব্বার তোমাকে তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও স্বভাবের লক্ষণ করিতে হইবে, নতুবা সম্পূর্ণ রূপে হস্তী বুঝাইতে পারিবে না। আর যদি যথার্থ হস্তী আনিয়া দেখাও তবে সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হইতে পার। সুতরাং হস্তীর অনুরূপ হস্তী ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারিল না। এই জন্যে আমরা বলি, আত্মার অনুরূপ আত্মা ভিন্ন আর কিছুই নাই।

এখন মনে কর, হস্তীর যেমন পার্থিব শরীর মাত্র দেখা যায়, কিন্তু তাহার আভ্যন্তরিক অমূর্ত্ত কোন বিষয় দেখা যায় না, সেই রূপ আত্মাও অতীন্দ্রিয় অমূর্ত্ত বস্তু সুতরাং তাহা দেখাইবার কোন উপায় নাই। জড় বস্তুতে আকর্ষণ, বিকর্ষণ প্রভৃতি যে শক্তি আছে, তাহা দর্শনাদির অনায়ত্ত সুতরাং তাহার কার্য্য ও লক্ষণাদিকে আশ্রয় করিয়া আমরা তাহা বুঝিয়া থাকি। অতএব অমূর্ত্ত বস্তু জানিতে হইলেই কেবল লক্ষণ ও কার্য্য ধরিয়া জানিতে হইবে*। তবে অমূর্ত্ত

* একটু গভীররূপে চিন্তা করিলে পাঠকগন দেখিতে পাইবেন, যে সকল বস্তু আমরা দেখি, তাহার কেবল গুণ অনুভব করি, কিন্তু প্রকৃত বস্তু দেখিতে পাই না। জড় পদার্থ কি? এ প্রশ্নের উত্তরেও, আমরা কেবল কতকগুলি লক্ষণ মাত্র নির্দ্দেশ করিতে পারি, তদ্ভিন্ন আর কিছুই করিতে পারি না। আত্মা অদৃশ্য বলিয়া যাঁহারা তাহার অস্তিত্বে অবিশ্বাস করেন, তাঁহারা অদৃশ্য শক্তি ও প্রাণ সম্বন্ধে কি বলিবেন? আমাদের অনুভব অতিরিক্ত জড় বস্তুর অস্তিত্বের প্রমাণ নাই। কোন২ দার্শনিক এই জন্য জড় পদার্থকেও মনোভাব মাত্র বলেন। তাঁহাদের যুক্তিকে এ পর্য্যন্ত কেহ খণ্ডন করিতে পারেন নাই, খণ্ডন করিবার সম্ভাবনাও নাই।

ও অতীন্দ্রিয় আত্মাকে লক্ষণ ধরিয়া বুঝিলে বাধা কি ? অতএব আমরা বলিব, পূর্ব্বোক্ত লক্ষণত্রয় যাহার আছে, তাহাই আত্মা। কেহ কেহ জ্ঞান ভাব ইচ্ছার সমষ্টিকেই আত্মা বলেন। যাহারা এরূপ বলেন, তাহাদিগকে আমি দোষ দিতে চাই না, কিন্তু আমার নিকট উহা সুন্দর বলিয়া বোধ হয় না।

কেননা জ্ঞান যে বিষয় বিষয়ীর সম্বন্ধের কথা বলে তাহা শুনে কে ? ভাব যে রসালতা বুঝাইয়া দেয়, তাহা গ্রহণ করে কে ? এবং ইচ্ছাই বা কার্য্য করিবার জন্য কাহাকে উত্তেজিত করে ? যেমন দয়া, ভক্তি, স্নেহ আত্মা নহে, কিন্তু আত্মার বৃত্তি ; সেই রূপ জ্ঞানভাবাদিও আত্মা নহে, কিন্তু আত্মার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ; সুতরাং আত্মাতেই অবস্থান করে এবং যাহার যেমন স্থল, পাইলেই কার্য্য করে।

এই সকল প্রমাণ দ্বারা বুঝা যাইতেছে, আত্মা বিদ্যমান। কিন্তু কোন কোন পাণ্ডিত্যাভিমানী সম্প্রদায় বলেন, মানবদেহে আত্মা বলিয়া দেহাতিরিক্ত কোন বস্তু নাই। দেহে যে জড়ীয় উপাদান সকল আছে যে, তাহাদিগের পরস্পর সংযোগেই চৈতন্য জন্মে ; এবং অজ্ঞ লোকেরা এই চৈতন্য শক্তিকেই আত্মা বলে। আত্মা যদি কোন নির্দ্দিষ্ট বস্তু হয়, তবে তাহার নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান থাকা আবশ্যক। যদি আত্মার নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান স্বীকার করা যায়, তবে যে স্থানে আত্মা অবস্থান করে, তদ্ব্যতীত অন্যান্য স্থানের বোধ-

শক্তি না থাকা সম্ভব: কিন্তু তাহা হয় না। আবার আত্মাকে সর্ব্বশরীরগামী বলিলেও দোষ হয়। কেননা তাহা হইলে তাহার নির্দ্দিষ্ট বস্তুত্ব থাকে না। শরীরের কোন সামান্য অংশ অর্থাৎ হস্তপদাদি ছেদন করিলে সজীব থাকা অসম্ভব। অপিচ মস্তিষ্কের ক্রিয়াবিকার কি বিধানবিকার ঘটিলে, মনুষ্য মনুষ্যত্ব হইতে বঞ্চিত হয়। যে ব্যক্তির মস্তিষ্ক সুস্থ ও সক্রিয়, সে কেমন সুন্দর? সে কেমন আশ্চর্য্য ভাবে সদসৎ নির্ব্বাচন করিতে সমর্থ? সে কেমন চমৎকার ভাবে জ্ঞানগর্ভ উপদেশ দিয়া লোকের হৃদয় মন আকর্ষণ করে? আবার সেই ব্যক্তির মস্তিষ্ক বিকৃত হইলে আত্মহত্যা ও অগম্যাগমনপ্রভৃতি দুষ্কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেও সঙ্কুচিত হয় না। যখন শরীরের প্রধান অংশ মস্তিষ্ক বাঁচাইয়া সামান্যাংশ হস্তাদির ছেদনে, মনুষ্যত্বের ব্যাঘাত জন্মে না; এবং মস্তিষ্ক সুস্থ ও সক্রিয় থাকিলেই আত্মা বাঁচিল, মস্তিষ্ক অসুস্থ ও বিকৃত হইলেই আত্মা মরিল, তখন মস্তিষ্ককেই আত্মা বলিতে বাধা কি? অর্থাৎ লোকে যাহাকে আত্মা বলে তাহা কোন বস্তু নহে; কিন্তু মস্তিষ্কের গুণ। আবার বিজ্ঞানপ্রসাদে জানা যাইতেছে যে, কোন প্রকার জড়ীয় পরমাণু যন্ত্রযোগে মৃতপ্রায় দেহে প্রবেশ করাইতে পারিলে সেই মৃতপ্রায় দেহে পুনর্ব্বার প্রাণ সঞ্চার হয়। যদি জড়ের অভাবে মনুষ্য জীবন হারাইল এবং জড়ের সংযোগসাধন ব্যতীত আত্মার অন্য প্রমাণ না

থাকিল, তবে আর শরীরাতিরিক্ত আত্মা স্বীকার কেন ?”

যাঁহারা এই সকল আপত্তি আনিয়া আত্মার অস্তিত্ব খণ্ডন করিতে চেষ্টা করেন, তাঁহারা ভ্রান্ত। যে কারণে ভ্রান্ত বলা হইল, ক্রমশঃ সেই কারণ সকল প্রদর্শিত হইতেছে।

আপত্তিকারীদিগের প্রথম কথার উত্তর এই—আত্মা নিরাকার। আকারবিশিষ্ট পদার্থেরই স্থানব্যাপ্তি নিরূপণ আবশ্যক, আত্মাকে দেহব্যাপী চৈতন্যই বল, আর মস্তিষ্ক ব্যাপীই বল কিছুই ক্ষতি হইতেছে না। যাহা জড় নহে, জড় অঙ্গচ্ছেদে তাহার বিনাশ সম্ভাবনা কোথায় ? যদি আত্মার নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান মস্তিষ্ক বলা যায়। তাহা হইলে অগ্নি যেমন লৌহের এক প্রান্তে সংলগ্ন হইলেই অপর প্রান্তে সঞ্চারিত হইয়া ক্রিয়া প্রকাশ করে, আত্মাও সেইরূপ মস্তিষ্কে থাকিয়াই সর্ব্বেন্দ্রিয় কিম্বা সর্ব্বশরীরগামিনী ক্রিয়া অনুভব করে বলিতে পারা যায়। হস্তপদাদি শরীরের কোন সামান্যাংশ ছিন্ন হইলেও আত্মা নির্ব্বিঘ্ন। আবার মস্তক প্রভৃতি মর্ম্মস্থান আহত হইলেও আত্মার নির্ব্বিপন্নত্ব অসম্ভব হয়, ইহা শরীরের ধর্ম্ম আত্মার নহে। শরীর বিনাশে কাজেই আত্মা শরীর হইতে পৃথক হইয়া ঈশ্বরের সুশীতল ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করে।

দ্বিতীয় কথার উত্তর এই—নিরাকার আত্মার ইহ-

লৌকিক কার্য্যসাধনের জন্য শরীর চাই। আত্মার যে সকল কার্য্য পৃথিবীতে প্রকটিত হয়, তাহা শরীর যোগে। শরীর ব্যতীত পৃথিবীর কোন কার্য্য সম্পন্ন হওয়া অসম্ভব। যদি অসম্ভব না হইত, তবে শরীর থাকিত না; আত্মা স্বতঃ কার্য্য করিতে পারিত। কিন্তু বিধাতা সেরূপ নিয়মে আত্মাকে পৃথিবীতে সৃষ্টি করেন নাই। তিনি আত্মার সমুদায় ইহলৌকিক কার্য্য সম্পন্ন হইবার উপায়-স্বরূপ শরীর প্রদান করিয়াছেন; এবং বাহিরের পদার্থ সকলের সহিত সেই শরীরের উপযোগিতা রক্ষা করিয়াছেন। সুতরাং শরীরযোগে কার্য্য হওয়া বিধাতার নিয়ম; অন্যথা নিয়ম ভঙ্গ হইবেক। নিয়ম ভঙ্গ হইলে কার্য্য চলিবে না। ঐশিক নিয়মের ব্যতিক্রম করে, কাহার সাধ্য? অতএব আত্মা যখন যাহা চিন্তা করে, মস্তিষ্কের পরমাণু সকলের মধ্য দিয়া সঞ্চারিত হইয়া বাক্যে তাহা আবির্ভূত হয়, অথবা চক্ষুরাদি অন্যবিধ যন্ত্রে বিস্ফুরিত হয়। আমরা অনেক সময়ে অনেক বিষয় চিন্তা করি, কিন্তু কাহার সাধ্য না বলিলে তাহা বুঝে? সে চিন্তার ভাব বদনে যদিও অল্পমাত্র সূচিত হয়, তাহাও জড়ীয় যোগ। অতএব কেবল মস্তিষ্ক নহে, সমস্ত শরীরের পারস্পরিক যোগাকর্ষণাদি যত ক্ষণ সুচারুরূপে চলিতে থাকে, ততক্ষণ আত্মারও ক্রিয়া স্বতন্ত্রতাসম্পন্ন বলিয়া বোধ হয়। নতুবা যাহার যোগে ক্রিয়া প্রকাশ পাইবে উহা অসুস্থ ও বিকৃত হইলে

ক্রিয়া চলিতে পারে কি রূপে? শরীর যন্ত্র, আত্মা যন্ত্রী। এই শরীর যন্ত্র দ্বারা আত্মা কার্য্য করিবে; ইহা বিধাতার নিয়ম। সুতরাং মস্তিষ্কাদি যন্ত্রীয় অঙ্গ বিকৃত হইলে যন্ত্রী আত্মারও পরিষ্কৃত জ্ঞান, সুপবিত্র ভাব ও স্বাধীন ইচ্ছা প্রভৃতি ক্রিয়া চলিতে পারে না। বংশী ভগ্ন হইলে বংশীবাদক চেষ্টা করিয়া কি সেইরূপ মধুর ধ্বনি করিতে পারেন? আপত্তিকারী বলেন, "শরীর বিকৃত কিম্বা শরীরের প্রধান অংশ মস্তিষ্কাদি বিকৃত হইলে, আত্মা বিকৃত হয় কেন? যদি শরীর হইতে আত্মা স্বতন্ত্র, তবে শরীর বিকৃত হইলেও, আত্মা অবিকৃত থাকুক?" আমরা বলি, বস্তুতঃ তাহাই হয়, শরীর বিকৃত বা বিধ্বস্ত হইলেও আত্মা অবিকৃত ও অবিনাশী থাকে। কেবল বিকৃত বা বিনষ্ট শরীরে আত্মার ক্রিয়া অচল হয় মাত্র। যেমন বংশী-বাদক অবিকৃত থাকিয়াও বংশীর বিকৃতিজন্য কার্য্য করিতে অক্ষম, সেইরূপ। শরীর, আত্মার কার্য্য সাধনোপযোগী যন্ত্র। মস্তিষ্ক সেই যন্ত্রের প্রধান অংশ। কেননা যে কার্য্য বাহিরে সঞ্চারিত হয়, তাহা মস্তিষ্কের মধ্য দিয়া ভিন্ন সঞ্চারিত হইবার পথ নাই। যাহা হউক, বংশী যন্ত্রের উপরে বাদকের কথঞ্চিৎ কর্ত্তৃত্ব চলে, যেহেতু সে যন্ত্র তাহার স্বকৃত, কিন্তু শরীর যন্ত্রের উপর আত্মার কোন কর্ত্তৃত্ব নাই, যেহেতু শরীর ঈশ্বরদত্ত। সুতরাং শরীর ভগ্ন হইলে আত্মা তাহা রক্ষা করিতে অসমর্থ। এইরূপ মাদক-

সেবী প্রমত্ত কিম্বা উন্মত্ত ব্যক্তি যখন দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, তখন তাহার মস্তিষ্ক বিকৃত সুতরাং আত্মার বিশুদ্ধ জ্ঞান, বিশুদ্ধ ভাব ও ইচ্ছা তাহার মধ্য দিয়া সঞ্চারিত হইতে পারে না। এই জন্যে কি আত্মার অস্তিত্ব অসম্ভব হইতে পারে? কখনই না। জগতে যত প্রকার জড়ীয় পরমাণু আছে, তাহার একটীতেও জ্ঞান, ভাব ও ইচ্ছা নাই। সুতরাং জড়ের সংযোগবিয়োগে যে গুণ উৎপন্ন হয়, তাহাও জড় হইবে। তাহাতে চেতনের লক্ষণ থাকিতে পারে না। এ পর্য্যন্ত যত জড়ীয় গুণ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার একটীতেও চেতনের চিহ্ন মাত্র নাই। গুড় কিম্বা দ্রাক্ষা রস হইতে যে মাদকতা জন্মে তাহা জড়। উদজন ও অম্লজন যোগে জল হইয়াছে, তাহাও জড়। চুণ হরিদ্রা যোগে যে রক্তবর্ণ হয় ও পারদ এবং গন্ধক যোগে যে হিঙ্গুল উৎপন্ন হয়, সকলই জড়। জড়ের গুণ জড় বৈ জ্ঞান হইতে পারে না। জড় হইতে কিরূপে যে জ্ঞান ভাবাদি উৎপন্ন হইবে, আপত্তি কারিগণ কি তাহার উত্তর দিতে পারেন? যাহারা পৃথক পৃথক অবস্থায় অজ্ঞান ছিল, সংযুক্ত হইয়া তাহারা কিরূপে সজ্ঞান হইবে? ইহা কি মনে কল্পনা করিতেও সাহস জন্মে?

তৃতীয় কথার উত্তর এই—জড়ীয় পরমাণুগুণে মানব শরীর কার্য্যক্ষম থাকে;এবং কোন বিশেষঅংশের বিয়োগ হইলে শরীর বিনষ্ট হইয়া যায়; কেননা শরীর জড়। সুতরাং

যে যে বস্তুর সংযোগবিধানে তাহা কার্য্যোপযোগী থাকিবে, তাহা চাই, অভাব হইলে চলিবে না। আত্মা জড় নহে, সুতরাং শরীরের ক্ষতিতে আত্মার অল্প মাত্রও ক্ষতি নাই। বিদ্যুতের অভাবে যাহার শরীর বিনষ্ট হইতে ছিল, বিদ্যুৎ প্রয়োগে পুনর্ব্বার তাহা আত্মার কার্য্যোপ-যোগী হইতে পারে। ভয়ঙ্কর বিষদুষ্ট বায়ুতে যাহার শরীর ভঙ্গ হইতেছিল, তৎ প্রতিকারক ঔষধের গুণে তাহা সুস্থ ও সক্রিয় হইতে পারে। সর্পাদির বিস দ্বারা হতচেতন মুমূর্ষু ব্যক্তি জলসেক কিম্বা অন্যবিধ জড়শক্তি প্রভাবে সুস্থ হইতে পারে। কেন পারে? ঐ সকল বস্তু জড় এবং শরীরও জড় সুতরাং জড়ের সহিত জড়ের সম্বন্ধ হইলে কার্য্যকর হইবে। কিন্তু আত্মা জড় নহে, এ জন্য আত্মার কোন ক্ষতি হইতে পারে না; কিন্তু আত্মার ক্রিয়া প্রতিরুদ্ধ হইতে পারে মাত্র। অতএব বিদ্যুৎ বিষময় দ্রব্য কিম্বা সলিলাদি স্বতন্ত্র, আত্মা স্বতন্ত্র। জড়ে জ্ঞান ভাবাদি নাই, যাহাতে যাহা নাই, তাহাতে তাহা আসিবে কি রূপে? যদি বিদ্যুৎ প্রভৃতি জড় বস্তুতে জ্ঞান ভাবাদি থাকিত, তবে তাহারাও দার্শনিক পণ্ডিতদিগের মত কখন ঈশ্বরকে স্বীকার, কখন অস্বীকার করিত পারিত। তাহারাও "এমত সত্য নহে" বলিতে পারিত, এবং ঈশ্বর, পরকাল, বস্তুগুণ ও কার্য্যকারণ প্রভৃতি লইয়া বিতণ্ডা করিতে অগ্রসর হইত। অধিকন্তু পৃথিবীর অন্যান্য বস্তুর সহিত তাহাদিগের উপকা-

অপকার সম্বন্ধও থাকিত। সুতরাং জড় বস্তুতে জ্ঞান ভাবাদি আছে ইহা স্বীকার করা ভ্রম। যদি জ্ঞান ভাবাদি স্বীকার করা ভ্রম বলিয়া বুঝিতে পারা যায়, "তবে আত্মা দেহ হইতে ভিন্ন" বুঝিবার বাকি রহিল কি? আর এক কথা এই, যে স্থানে আত্মা আছে, সে স্থানেই আত্মজ্ঞান আছে; যে স্থানে আত্মা নাই, সে স্থানে আত্ম-জ্ঞানের চিহ্নও দৃষ্ট হয় না। এ জন্য চেষ্টা করিলেও পশুর আত্মজ্ঞান জন্মান ও মনুষ্যের আত্মজ্ঞান দূর করা যায় না। আমি বুঝিতেছি, আমি আছি, এ জ্ঞান মানুষের সহজ। আমি বুঝিতেছি, আমি দ্রষ্টা, শ্রোতা, ঘ্রাতা, অনুমন্তা, তুমি যদি যুক্তি দ্বারা ইহা খণ্ডাইতে চাও, তাহা কি পারিবে? আমার আত্মজ্ঞানে কখন অবিশ্বাস জন্মাইতে পারিবে না; আমার জ্ঞান ভাবাদি রহিত করিতে পারিবে না। যে স্থানে জ্ঞান ভাবাদি আছে, সে স্থানে তোমার কোন যুক্তি খাটিবে না; আর যে স্থানে নাই, সে স্থানেও তোমার চেষ্টা কার্য্যকরী হইবেক না। পশুর আত্মজ্ঞান নাই, ঈশ্বর পরকাল নাই, সত্যাসত্য নাই, তুমি কি তাহা তাহাদিগকে আনিয়া দিতে পার? তুমি কি পশুকে বস্তুশক্তি বুঝাইয়া তদনুরূপ শিক্ষা দিতে পার? তুমি কি পশুর নৈসর্গিক সংস্কার বিরুদ্ধে তাহাকে এক পদও অগ্রসর করিতে পার? কখনই না। যদি পশুর আত্মজ্ঞান থাকিত, তবে দুষ্কর্ম্মের জন্য অনুতাপ হইত; পশুর প্রবৃত্তি রাজ্-

দণ্ড ব্যবস্থিত হইত ; এবং হন্তা পশুর কারাবাস করিতে হইত। তাহা হয় না কেন ? পশুর জ্ঞান নাই, সুতরাং তৎকৃত দুষ্কর্ম্ম সজ্ঞানকৃত হয় না। সজ্ঞানকৃত অপরাধ না হইলে দণ্ড হয় না এবং হইয়াও কোন ফল নাই। কেননা দণ্ডবিধান দণ্ডিত ব্যক্তির শিক্ষার জন্য। কিন্তু সহস্র বৎসর পরিশ্রম করিলেও পশু প্রভৃতি ইতর প্রাণিগণের শিক্ষা হইতে পারে না। অতএব নিঃসংশয় বলা যাইতে পারে, মনুষ্য দেহে আত্মা বিদ্যমান।

আত্মা অপূর্ণ। জড়ের সঙ্গে তুলনা করিতে গেলে আত্মাকে সদ্ভাবসম্পন্ন বলিয়া বোধ হয়। বস্তুতও আত্মা জড় অপেক্ষা সদ্ভাবান্বিত। জড়ের যাহা নাই, আত্মার তাহা আছে। জড়ের আত্মজ্ঞান নাই, আত্মার আছে। জড়ের ঈশ্বর পরকাল বোধ নাই, আত্মার আছে। জড় অন্ধ, আত্মা চক্ষুষ্মান্। জড়ের ইচ্ছা, যত্ন ও অধ্যাবসায় নাই, আত্মার আছে। কিন্তু যেমন এক দিকে আছে, তেমনি অন্য দিকে নাই। জ্ঞান আছে, বুঝিতে পারে, কিন্তু সকল বুঝে না, কিছু বুঝে আবার কিছু বুঝে না। প্রীতি পবিত্রতা আছে ; কিন্তু তাহা তেমন প্রশস্ত নহে ; সকল দিকে সমান প্রীতি ও সমান পবিত্রতা রক্ষা করিতে পারে না। সুতরাং তাহাতে কখন প্রীতি কখন বিদ্বেষ, কখন পবিত্রতা কখন অপবিত্রতা দর্শন করা যায়। উহা যেমন চক্ষুষ্মান্, তেমনই অন্ধ। এক বিষয়ের

এক দিক্ দেখিতে পায়, অপর দিক্ দেখিতে পায় না। সুতরাং আত্মার সকল বিষয়েরই পরিমাণ আছে। উহার কিছুই অসীম নহে, সকলই সসীম। এই সীমা অতিক্রম করিলেই পাপ জম্মে। সুতরাং সর্ব্বদা আপন সীমাতে থাকিবার জন্য সতর্ক থাকা আবশ্যক। আত্মা যদি অসীম গুণ যুক্ত হইত, তবে সতর্ক হইবার প্রয়োজন ছিল না, উহার সর্ব্বজ্ঞত্বাদি গুণ থাকিত। এখন পৃথিবী যেরূপ রোগ, শোক, দুঃখ, দারিদ্র্যের আলয় বলিয়া বোধ হইতেছে, এরূপ হইত না, এবং মানুষ না বুঝিয়া কিছুই করিত না। বিষ-দুষ্ট অন্ন পানাদি আহার করিয়া পীড়িত হইত না; সুবায়ু ও বিষ দুষ্ট বায়ু কোথায় কখন প্রবাহিত হইবে, অগ্রেই জানিতে পারিয়া সাবধান হইতে পারিত; অকাল মৃত্যু, অকাল জন্ম, গর্ভস্রাব ও গর্ভপাত প্রভৃতি দুর্ঘটনা দ্বারা মনুষ্য জাতির বর্ত্তমানানুরূপ ক্লেশ কদাচ হইতে পারিত না; রোগ হইলেও চিকিৎসকের প্রয়োজন হইত না; এবং নানা বিধ বিজ্ঞান দর্শনাদি শাস্ত্রের প্রয়োজন থাকিত না। শারীরবিজ্ঞান, ভূতত্ত্ববিজ্ঞান, জ্যোতির্ব্বিজ্ঞান, পদার্থ-বিজ্ঞান প্রভৃতির আবিষ্কার জন্য মনুষ্য কদাচ ক্লেশ পাইত না। অতএব আত্মা সদ্ভাবান্বিত হইলেও অপূর্ণ। এই অপূর্ণতার জন্যই তাহাকে অন্যের প্রতি নির্ভর করিতে হয়। এই জন্যই সে একেবারে সকল বিষয় বুঝিতে ও সকল কার্য্য করিতে পারে না। এই জন্য সকল দিক

দেখিয়া আপনাকে নির্দ্দোষ রাখা তাহার পক্ষে কঠিন হইয়া পড়ে। এই জন্য একাকী এক স্থানে বাস করাও কষ্ট কর। এই জন্য সে আপন প্রয়োজনীয় সাংসারিক দ্রব্য গুলিও কেবল আপনার যত্নে প্রস্তুত করিতে পারে না। এই জন্য সমাজ চাই, বন্ধু বান্ধব চাই, নতুবা চলে না। পদে পদে পাপের আবর্ত্তে পড়িবার আশঙ্কা আছে। পদে পদে সাংসারিক ও পারত্রিক বিঘ্ন বিপত্তি ও ক্লেশ কল্পনা আসিতে পারে।

আত্মা আশ্রিত।—জগতের একটী বস্তুও নিরাশ্রয় নাই, সকলই আশ্রিত। সেই রূপ আত্মাও আশ্রিত। আশ্রয় ভিন্ন এক মুহূর্ত্তও উহা অবস্থান করিতে পারে না। যেমন মাধ্যাকর্ষণ জড়ের আশ্রয়, যেমন উত্তর মেরু চুম্বকের আশ্রয়, যেমন লৌহ বিদ্যুতের আশ্রয়, সেই রূপ ঈশ্বর আত্মার আশ্রয়। এ জগতের কোন বস্তু দ্বারা উহার অভাব দূর হইতে পারে না; এবং জগতের ক্ষতিতেও উহার কোন ক্ষতি হয় না। সুতরাং জড়ীয় পরমাণু কিম্বা তাহার সংযোগ বিয়োগাদি উহার আশ্রয় হইতে পারে না। অতএব আপাততঃ আমরা আত্মাকে শরীরধারী বলিয়া বুঝিলেও শরীর উহার আশ্রয় হইতে পারে না; অথচ উহা অপূর্ণ। পদে পদে আত্মা অভাবে জড়িত হইতেছে, এবং নিজের বলে তাহার প্রতিকার করিবার সাধ্য নাই। পদে পদে আত্মা স্খলিত ও পতিত হইতেছে, পদে

পদে ভ্রষ্ট ও বিচ্যুত হইতেছে, সুতরাং আশ্রয় না থাকিলে তিষ্ঠিবার সাধ্য নাই। যদিও উহার বল অতি অল্প, যদিও উহা শোক মোহাদি দ্বারা আক্রান্ত হইয়া নিরাশ হয়, যদিও তাহার প্রতিকার করিতে গিয়া সে প্রায়শঃ হতাশ্বাস হইয়া ফিরিয়া আইসে, তথাপি যত ক্ষণ সে পূর্ণ মঙ্গলের আধার ঈশ্বরেতে অবস্থান করে, যত ক্ষণ সেই মঙ্গলময় পিতা ও স্নেহময়ী জননীর ক্রোড়ে বসিয়া থাকে, তত ক্ষণ উহার ভয় নাই, বিঘ্ন নাই, আপদ্ নাই, এবং পড়িবার বা মরিবার সম্ভাবনা নাই। শিশু যেমন জননীর ক্রোড়ে থাকিতে পারিলে ভয় করে না; আত্মাও সেইরূপ ঈশ্বরের চরণে স্থান পাইলে নির্ভয়ে থাকে। আত্মা যদি নিজের বলের প্রতি নির্ভর করে, আত্মা যদি আপনার বলের পরিমাণ না বুঝে এবং নিজের দুর্ব্বলতার পরিমাণ বুঝিয়া যদি সেই অচ্যুত অক্ষয় অচল পুরুষের আশ্রয় গ্রহণ না করে, যদি সর্ব্বতোভাবে নিজের কর্ত্তৃত্ব ছাড়িয়া ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্বে বিশ্বাস না করে, তবে তাহার বাঁচিবার আর উপায় থাকে না। অন্য দিকে আবার ঈশ্বরের করুণাতে দৃঢ় বিশ্বাসী হইতে পারিলে আর পতনের ভয় নাই। আমরা যদি সাধুদিগের জীবন লইয়া আলোচনা করি তবে দেখিতে পাই, সংসারে তাঁহাদিগের হিতৈষী কেহই নাই, উপকারী বন্ধু নাই, সকলেই শত্রু। পৃথিবীর লোকেরা সাধুদিগকে পদে পদে নির্যাতন করিতে

চেষ্টা করিয়াছে, পদে পদে তাঁহাদিগকে লাঞ্ছনা ও তিরস্কার করিয়াছে, তাঁহাদিগের শোণিত পান করিতেও কুণ্ঠিত হয় নাই; তথাপি তাঁহাদিগের আত্মার ঔজ্জ্বল্য, মহত্ত্ব এবং অমৃতত্ব বিনষ্ট করিতে পারে নাই কেন? তাঁহারা ঈশ্বরের আশ্রিত, তাঁহারা বাহিরের লোকদিগকে ভয় করেন না, বাহিরের প্রলোভনকে তুচ্ছ মনে করেন এবং কখনও আপন আশ্রয় ঈশ্বরকে ছাড়িয়া সংসারের অনুসরণ করেন না। এই জন্য তাঁহারা কখন পতিত, ভ্রষ্ট, নিরাশ বা নিরুদ্যম হন না। নির্ভয়ে ঈশ্বরের চরণ ধরিয়া পড়িয়া থাকেন।

আত্মা পবিত্র। —আত্মা পবিত্র, এ কি কথা? সংসারে পবিত্রাত্মার প্রমাণ কোথায়? এত পাপ এত জঘন্যতা যাহাতে, সে কি আবার পবিত্র? যদি এত পাপী আত্মা পবিত্র, তবে অপবিত্র কে? প্রিয় ভ্রাতঃ! তুমি আত্মার স্বভাবের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, উহার স্বরূপ ও লক্ষণ গুলি সুন্দর করিয়া পাঠ কর, দেখিবে উহা পবিত্র। ঈশ্বর যে অবস্থায় উহাকে সৃষ্টি করেন, সেই অবস্থা সম্মুখে ধরিয়া দেখ, উহা পবিত্র। বস্তুতঃ উহাতে পাপ মলিনতার লেশ মাত্রও নাই। জ্ঞান বিবেক আত্মার মন্ত্রী, আত্মা দেহ-রাজ্যের রাজা। উহারা কি সৎ কি অসৎ উহাকে বলিয়া দেয়। ভাব সেই মন্ত্রীর অনুবর্ত্তী ও সহকারী, সে বিষয়ের মধ্যে রসালতা অন্বেষণ করে। ইচ্ছা ইহাদিগের মধ্যবর্ত্তিনী

হইয়া আত্মাকে কার্য্যের জন্য পরিচালিত করে। এই বৃত্তি তিনটী অবিকৃত থাকিলে আত্মাতে অপবিত্রতা আসিবার আশঙ্কা নাই। ইহাই উহার স্বাভাবিক অবস্থা। জ্ঞান বিবেক প্রকৃতিস্থ থাকিলে ভাল মন্দ অনায়াসে বুঝা যায়। ভাব যদি অবিকৃত ভাবে তাহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হয়, তবে যাহা সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর ও পবিত্র, যাহার তুল্য সুন্দর ও বিশুদ্ধ বস্তু নাই তাহারই প্রতি উহাকে আসক্ত করিবে। ইচ্ছা এই আসক্তির সহায়তায় অনায়াসে উহাকে জ্ঞান বিকের উপদিষ্ট পথে পরিচালিত করিবে। তবে আর পাপ আসিবে কি রূপে? ফলতঃ আত্মা যখন স্বরূপে অবস্থান করে, তখন উহাতে পাপ নাই, মলিনতা নাই, কলঙ্ক নাই এবং অপবিত্রতার চিহ্ন মাত্রও নাই। তবে এরূপ বিশুদ্ধ আত্মাতে এত অপবিত্রতা কেন? যখন উহার স্বভাব বিকৃত হয়, তখন উহা সংসারের নানা কৃত্রিমতাতে পড়িয়া আপনাকে আপনিই ভুলিয়া যায়, এবং বিশুদ্ধ জ্ঞান অন্ধভাবে কার্য্য করে, সুতরাং আত্মাকে মলিন ও অপবিত্র বলিয়া বোধ হয়। ইহার প্রমাণ দিবার জন্য, আমরা শিশুর পবিত্র ছবি, বিপন্ন ব্যক্তির কাতরতা ও কাকুপূর্ণ বাক্য, মৃত্যু শয্যায় শয়িত ব্যক্তির আত্মগ্লানিপূর্ণ হৃদয়ের ভাব ও ঋষিদিগের আশ্রমস্থ পবিত্রতার কথা উল্লেখ করিতে পারি। প্রিয়তম! তুমি সর্ব্বদা যে সকল শিশুদিগকে দেখিতে পাও, তাহাদিগের মধ্যে কি অপবিত্রতা দেখিয়াছ? শিশু কি সংসারের মান সম্ভ্রম

বুঝে ? শিশু কি রাজার অনুরোধ, পিতা মাতার অনুরোধ অথবা সাংসারিক বিষয়ানুরোধে আপনার যাহা করিবার তাহা ভুলে ? শিশুর সরলতা, শিশুর মাধুর্য্য, শিশুর সুস্নিগ্ধ ও সহাস্য বদন কেমন পবিত্র ! শিশুর স্বাধীন ও নির্ভীক চিত্ত দেখিয়াছ কেমন মনোহর ! তাহার যাহা ইচ্ছা হয়, সে যাহা বুঝে, তাহাই করে। যাহা জানে তাহাই বলে, তাহার বাহিরে যায় না। শিশুর জ্ঞান যত টুকু পরিস্ফুট, সে তত টুকু কার্য্য করে। সংসারের অনুরোধে তাহার বিপরীত করে না। শিশুর প্রেম কেমন নিরপেক্ষ ? শিশুর দয়া কেমন অব্যাহত ? শিশুর কার্য্য কেমন স্বার্থপরতা-শূন্য ?* শিশুর জ্ঞান অপরিস্ফুট ; তথাপি তাহার ভাব ও ইচ্ছা জ্ঞানের অনুবৃত্তি পরিত্যাগ করে না। যদি ক্রমশঃ জ্ঞানপরিস্ফুটের সঙ্গে সঙ্গে ভাব ও ইচ্ছা তাহার অনুগত থাকে, যদি সংসারের কৃত্রিমতা প্রথম হইতে তাহাকে আশ্রয় করিতে না পায়, তবে কি মানব আত্মাতে কোন কালেও অপবিত্রতা আসিতে পারে ? আশ্রমবাসী ঋষিগণ সর্ব্বদা কপটতা ছলনা চাতুরী প্রভৃতি সাংসারিক আকর্ষণ হইতে দূরে অবস্থান করেন, এই জন্য তাঁহাদিগের জীবন অনেকাংশে পবিত্র। তথাপি যে, কখন কখন তাঁহাদিগকে কলঙ্কিত হইতে দেখা যায়, তাহাও কেবল প্রবহমাণ সাংসারিকতা হইতেই উৎপন্ন হয়। যখন নগর ও গ্রাম হইতে প্রবাহিত দোষ সমুদায় অরণ্যবাসী

মুনিদিগের আশ্রমে গিয়া বিশ্রাম করে, সেই সংসর্গে ঋষি-দিগের পবিত্রতা বিনষ্ট হয়। যদি রাজা কিম্বা নগরবাসী ধনী লোকের সঙ্গে ঋষিদিগের কখন সাক্ষাৎ না ঘটিত, যদি ঋষিগণ পতনোন্মুখ রাজন্যকুল রক্ষা করিতে গিয়া স্বভাবের ব্যভিচার দর্শন না করিতেন, তবে কোন দিন তপঃস্বাধ্যায়নিরত মুনিজনের চরিত্রকে অপবিত্রতা স্পর্শ করিতে পারিত না।

আবার দেখ, ঘোরতর ঝটিকাপ্রবাহে সিন্ধু সলিল বিক্ষুব্ধ হইল, তরঙ্গ সকল মাতঙ্গের ন্যায় ঘোরতর গর্জ্জন করিয়া চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত করিল, দেখিয়া দার্শনিক নাস্তিক্যাভিমানীর কুতর্ক প্রস্রবণ শুকাইল। এত কাল যত গর্ব্ব পোষণ করিয়াছিলেন, যত সম্বল সঞ্চয় করিয়াছিলেন, যত সহায় সংগ্রহ করিয়াছিলেন, এক মুহূর্ত্তে সকল পলায়ন করিল। তখন তিনি প্রাণপণে "দয়াময় রক্ষা কর" বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। এক পলকে সকল অহঙ্কার চূর্ণ হইল। নাস্তিক আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না; সুতরাং ঈশ্বরকে খোঁজ করাও আবশ্যক বোধ করেন না। সহসা পুত্র মরিল, অথবা জীবনসর্ব্বস্ব পত্নী মরিল, তখন তিনি সকল তর্ক ভুলিলেন। স্ত্রী পুত্রদিগকে পূর্ব্বে যেমন মৃৎপিণ্ড কিম্বা কাষ্ঠপাষাণবৎ মনে করিতেন, এ সকল জড়ীয় শক্তি বলিয়া লোকের সঙ্গে বিতর্ক করিতেন, এবং "ক্লোরোফরম" ও "হাইড্রোসিয়ানিকম এসিড্‌" প্রভৃতি বিষের

শক্তি দেখাইয়া আত্মার অস্তিত্ব অপ্রমাণ করিতে চেষ্টা করিতেন, এখন আর তাহা মনে রাখিতে পারিলেন না, হৃদয় ফাটিয়া উঠিল; দুই চক্ষু দিয়া দরদর ধারায় জল পড়িতে লাগিল, অথবা বাষ্পভরে কণ্ঠ অবরুদ্ধ হইল। ভায়া নির্ব্বাক্ নিস্পন্দ ভাবে শোকের সমুদ্রে ডুবিয়া পড়িলেন।

প্রিয় ভ্রাতঃ! এস, এখন আমরা একবার মৃত্যুশয্যায় শয়িত ব্যক্তিকে দেখিয়া আসি। দেখ ঐ যে ব্যক্তি মৃত্যুর করাল দ্রংষ্ট্রাঘাতে ছুট ফট করিতেছেন, ইনি পূর্ব্বে সংসারমদে মত্ত হইয়া অনেক পাপ করিয়াছেন। ইনি বাহিরে সৎকর্ম্মী বলিয়া ভাণ করিতেন, গোপনে দুষ্কর্ম্ম করিতেন। অর্থলোভে মিথ্যা বলিতেন এবং চোর দস্যু প্রভৃতিকে কারাবাসের ভয় হইতে বাঁচাইতেন। লোকের নিকট বলিতেন, তিনি কেবল পরের উপকারের জন্যই জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। নরহন্তাকে মিথ্যা বলিয়া বাঁচাইতেন, লোকের নিকট পরোপকার ব্রতের মহিমা ঘোষণা করিতেন। আবার গোপনে পাপক্ষয়মানসে চান্দ্রায়ণ করিতেন, লোকের কাছে পুণ্য সঞ্চয়ের ইচ্ছা জানাইতেন। আবার মুখে, "মাতৃবৎ পরদারেষু" পাঠ করিতেন, গোপনে অন্যের কুলবধূর কলঙ্কোৎপাদনের চেষ্টা প্রাণ দিয়া করিতেন। এ রূপ সহস্র কোটি কোটি পাপ গোপনে করিতেন, লোকে তাহা জানিতে পাইত না।

এখন সংসারের ভোগ ঐশ্বর্য্য, মান মর্য্যাদা, স্ত্রী পুত্র সমু-দায় ছাড়িয়া যাইতেছেন। এখন বুঝিয়াছেন, যাহার জন্য এত পাপ করিয়াছেন, তাহা তাঁহার হইল না। যাহা-দিগের তুষ্টির জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা-দিগকে তুষ্ট করিতে পারিলেন না। যে জন্য সহস্র সহস্র পাপানুষ্ঠান করিয়াছেন, সে প্রয়োজন পর্য্যবসিত হইয়াছে। এখন ইন্দ্রিয়গণ অবসন্ন, পরিবার বন্ধু বান্ধব মান সম্ভ্রমের আর প্রয়োজন নাই, সকল প্রয়োজন শেষ হইয়াছে। সুতরাং পূর্ব্বকৃত পাপতরঙ্গে মন পুনঃ পুনঃ আহত হইতেছে এবং তজ্জন্য তিনি শোক ও অনুতাপ অকপট ভাবে ব্যক্ত করিতে-ছেন। আপন দুষ্কর্ম্মে অন্ধ হইয়া পূর্ব্বে যাহাদিগকে শত্রু বলিয়া কল্পনা করিয়াছিলেন তাহাদিগের নিকট অশ্রুপূর্ণ লোচনে কাতর ভাবে ক্ষমা চাহিতেছেন। আর ঊর্দ্ধ দৃষ্টি করিয়া সেই বিশ্বরাজের প্রতি কাতর ভাবে সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করি তেছেন। এত কাল যাহা যত্নপূর্ব্বক গুপ্ত রাখিয়াছিলেন; সহস্র ব্যক্তির অনুরোধ পরিত্যাগ করিয়াও পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই; যাঁহারা পরম বন্ধু বলিয়া পরিচিত ছিলেন, তাঁহারাও সে সকল গুপ্ত পাপ ঘুণাক্ষরের ন্যায় অনুভব করিতে পারেন নাই; আজ সে দিন, সে সংসারের অনুকূল দিন ফুরাইয়াছে; আজ শত্রু মিত্র সমান হইয়াছে, আজ যাহারা শত্রু ছিল, তাহাদের নিকটই সকল পাপ ব্যক্ত করিয়া বলিতেছেন, আর গুপ্ত রাখিতে পারিলেন না। আর

সংসারের কুটিল স্বার্থপর অনুরোধ কার্য্যকর হইল না। অনুতাপানল প্রজ্বলিত হইয়া সেই পাপ ভাণ্ডার পুড়িয়া ছার খার করিল। যেমন স্বাভাবিক পবিত্র ভাব লইয়া আসিয়াছিলেন, সেই রূপ পবিত্র ভাব লইয়া পিতার নিকট যাইতে পারিলেন না বলিয়া এত অনুতাপ। প্রিয় ভ্রাতঃ! বুঝিলে স্বভাব কেমন সুন্দর? দেখিলে, আত্মা কেমন পবিত্র? বস্তুতঃ আত্মাতে পাপ নাই, বিশুদ্ধ জ্ঞান যখন অন্ধ হয়, প্রেম তখন কাজে কাজেই অপাত্রে স্থাপিত হয়, ইচ্ছা দুর্ব্বল হয়, দুরভিলাষ অতি সহজে আত্মাকে লইয়া পাপ পথে প্রস্থান করে। আবার যখন সমুদায় আকর্ষণ, সমুদায় বন্ধন, ও সমুদায় কৃত্রিমতা চলিয়া যায়, অনুতাপানল সমুদায় পাপাবরণ দগ্ধ করিয়া ফেলে, আত্মা তখন স্বতঃ নির্ম্মল হইয়া উঠে। পূর্ব্বে বলা গিয়াছে আত্মা পরিমিত, আত্মা সসীম। জ্ঞানের এই সীমা যখন উল্লঙ্ঘিত হয়, তখনই আত্মা অপবিত্র হয়, নতুবা আত্মা আপন সীমাতে চিরকাল পবিত্র।

আত্মা অমর।—আত্মার বিনাশ নাই। কোন পার্থিব উপাদানে উহা নির্ম্মিত হয় নাই। যে উপাদানে উহা নির্ম্মিত, তাহার সঙ্গে বাহ্য জগতের কোন সম্বন্ধ নাই, সুতরাং কোন প্রাকৃতিক ঘটনাদ্বারা উহার অনিষ্ট অসম্ভব। উহা অগ্নিতে পোড়েনা, জলে পচেনা, বায়ুতে শুষ্ক হয় না, অস্ত্রাদি দ্বারাও ছিন্ন হয় না। বস্তুতঃ ভৌতিক প্রকৃ-

তির এমন কোন শক্তি নাই, এমত কোন ভৌতিক কারণ জগতে নাই, যাহাতে উহার বিনাশ হইতে পারে। এ জন্য ইহলোকস্থ পদার্থনিচয়ের শক্তি আত্মাতে সংক্রমিত হইতে পারে না।

শরীর ভৌতিক পদার্থে নির্ম্মিত, সুতরাং পার্থিব বস্তুর শক্তিতে শরীরের উপচয় ও অপচয় হইতে পারে, এবং সর্ব্বদাই পার্থিব পরমাণুপুঞ্জের অনিষ্টকর শক্তিতে শরীর বিনষ্ট হইতে দেখা যায়; কিন্তু আত্মার সঙ্গে পার্থিব বস্তুর সেরূপ কোন সম্বন্ধ দেখা যায় না। যদিও পার্থিব শরীরের সহিত আত্মার এমন একটী গাঢ় সম্বন্ধ ও যোগ দৃষ্ট হয় যে সে যৌগিক সম্বন্ধ বিনষ্ট হইলে উহাকে অনুভব করা কষ্টকর হইয়া উঠে, তথাপি শরীর বিনষ্ট হইলেও উহার কোন ক্ষতি হইতে পারে না। বাল্য, যৌবন ও বার্দ্ধক্যসম্ভূত পরিবর্ত্তন সকল ক্রমে ক্রমে শরীরের উপর দিয়া চলিয়া যাইতেছে, আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। প্রথমতঃ যে চর্ম্ম কোমল মসৃণ ও চিক্কণ ছিল, তাহা ক্রমে দৃঢ় বন্ধুর হইয়া উঠিল, এবং পরিশেষে শুষ্ক লোলিত হইয়া পড়িল, জানিতে পাইলাম না। সূক্ষ্ম পাণ্ডুর রোম সকল দৃঢ় ও কৃষ্ণবর্ণ হইল, পরিশেষে একেবারে বিশুষ্ক ও কৃষ্ণবর্ণ হইয়া গেল; কিন্তু কিরূপে হইল, জানিলাম না। শরীরের রক্ত মাংস মেদ, বসা, শিরা ও ধমনী সকল প্রথমতঃ কোমল ও অনাবৃত ছিল, ক্রমে দৃঢ় ও আবৃত হইল। এখন

আবার ক্রমে ক্রমে শিথিল হইয়া পড়িল। আগে দন্ত সকল সূক্ষ্ম ও মৃদু ছিল, তৎপর দৃঢ় ও স্থূল হইল, এখন ক্রমে ক্রমে খসিয়া পড়িল। এই সকল পরিবর্ত্তন কিরূপে ঘটিল আমরা তাহার এক বিন্দুও জানিতে পাইলাম না। কেন পাইলাম না? এ সকল বাহ্য পরিবর্ত্তন শরীরের, আত্মার নহে। সুতরাং শরীর পরিবর্ত্তিত হইতেছে, আত্মা তাহা জানিতেছে না। জড়ীয় প্রকৃতির অতীত আত্মা বাল্য যৌবন বার্দ্ধক্য দ্বারা আক্রান্ত হয় না। ফলতঃ বাল্য যৌবন বার্দ্ধক্য আত্মার নাই। আত্মা যত পরিণত হইতে থাকে, যত অধিক দিন অতিক্রম করে, ততই জ্ঞান ধর্ম্মে সমুন্নত হইয়া উঠে, অবনত হয় না। যেমন বাল্য যৌবন বার্দ্ধক্য শরীরের অবস্থা আত্মার নহে, সেই রূপ মৃত্যুও শরীরের বিনাশ আত্মার নহে।

আত্মা অনেক। যত শরীর তত আত্মা। কেহ কেহ বলেন, "আত্মা একটী মাত্র, তাহাই প্রতি শরীরে প্রতিভাত ও প্রতিফলিত হইতেছে। যেমন বহু দর্পণ সূর্য্য কিরণে রাখিলে প্রত্যেক দর্পণে এক একটী সূর্য্য আছে বলিয়া বোধ হয়, সেই রূপ, একই আত্মা সমস্ত মানব দেহে জ্যোতি বিস্তার করিয়া আছে।" এ মতটীও ভ্রমাত্মক। একটী আত্মা কখন বহু দেহে থাকিয়া কার্য্য করিতে পারে না। সূর্য্যকিরণ যেমন দর্পণে প্রতিবিম্বিত হয় মাত্র কার্য্য করে না; মানবদেহে আত্মার যদি সেই রূপ প্রতিবিম্ব-

গতনমাত্র কার্য্য হইত, তাহা হইলে ঐ উপমাটীকে কথঞ্চিৎ হৃদয়গ্রাহী বলিয়া স্বীকার করা যাইত। কিন্তু দেহের সহিত আত্মার সেরূপ সম্বন্ধ নহে। আত্মা মানবদেহে থাকিয়া কার্য্য করে। মানবদেহস্থ আত্মা জ্ঞানযোগে নানা বিষয় আয়ত্ত করে; ভাব ও ইচ্ছানুসারে সমুদায় কার্য্য সম্পন্ন করে। "এক আত্মার গুণ সকল দেহে সঞ্চরিত হয়" স্বীকার করিলে দোষ পড়ে। কেননা প্রত্যেক দেহস্থ আত্মার কার্য্য ও কার্য্যসাধিকা শক্তি আমরা একরূপ দেখি না। আত্মা এক হইলে প্রত্যেক মানবাত্মার ভাব কার্য্যাদি একরূপ হইত। এক জনের রুচি ও কামনার সঙ্গে অন্য ব্যক্তির রুচি ও কামনার মিল থাকিত এবং এক জনের অবস্থা ও ব্যবস্থার সঙ্গেও অন্যের সম্পূর্ণ ঐক্য থাকা সম্ভব ছিল। এক জন যাহা উৎকৃষ্ট বলিয়া গ্রহণ করে, অন্যে তাহা অপকৃষ্ট বলিয়া পরিত্যাগ করে। এক ব্যক্তি যাহা প্রার্থনা করে, অন্য ব্যক্তি পাইলেও তাহা বিষবৎ পরিহার করে। এক জন বিচিত্র পালঙ্ক, বিচিত্র সৌধ, মনোরম পুষ্পোদ্যান চিত্তবিনোদক বলিয়া জানেন, এবং যাহাতে এই সকল পাইতে পারেন প্রাণপণে তাহার চেষ্টা করেন। অন্য জন ইহার নশ্বরতা ও আসক্তিজনকতা দেখিয়া পরিত্যাগ করেন। অবস্থাভেদে কাহার সুখেও দুঃখ উপস্থিত হয়, কেহ দুঃখে থাকিয়াও সুখ ভোগ করে। এক আত্মা কি এত বিচিত্র ভাবাপন্ন হইতে পারে? আবার দেখ

জননী জন্মিলেন; কিন্তু পুত্র জন্মিবার অনেক বিলম্ব রহি-য়াছে। যে সকল প্রাকৃতিক উপকরণ সংগৃহীত হইলে পুত্র জন্মিবে, তাহা সংগৃহীত হয় নাই, এবং সে সকল সংগৃহীত না হইলেও পুত্র জন্মিবে না নিশ্চিত। যখন উপকরণসকল একত্রিত হইল, তখন পুত্র জন্মিল। এত কাল পুত্রের আত্মার সেই অংশ কোথায় ছিল? তাহার ক্রিয়া সকলই বা কিসের উপর বিন্যস্ত ছিল? প্রত্যেক মনুষ্যের মুখচ্ছবি, রুচি ও বাসনা এবং বুদ্ধিগত বিচিত্রতা যেমন পৃথক্, প্রত্যেক মানবদেহে আত্মাও তেমনই পৃথক্ পৃথক্ হইবে।

জন্মের কথা যেমন বলা হইল, মৃত্যুও ঠিক সেই রূপ। যেমন এক ব্যক্তির জন্মিবার বহু দিন পূর্ব্বে তাহার মাতার জন্ম হওয়া স্বাভাবিক, এবং তৎকালে পুত্রের আত্মাংশের অবস্থানোপযোগী স্থান নাই; যেমন তাহাদিগের রুচি ও বুদ্ধিগত বৈচিত্র্য দর্শনে এক আত্মার সর্ব্বত্রাবস্থান সম্ভব পর বলিয়া বোধ হয় না, সেই রূপ এক জন মরিলে, সঙ্গে সঙ্গে সকলেরই মরা উচিত। এক জন শোকগ্রস্ত হইলে সকলেরই শোকগ্রস্ত হওয়া উচিত; এক জন উদাসীন হইলে সকলে উদাসীন হয় না কেন? এক জন গৃহী হইলে সকলেই গৃহী হয় না কেন? এক জন সাধু হইলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে সকলেই সাধু হয় না কেন? আবার চোরের সঙ্গেই বা সাধুর সম্মিলন হয় না কেন? এক আত্মা যদি সমুদায় মানব

দেহের অধিষ্ঠাতা হয়, তাহা হইলে একের বাল্য, একের যৌবন, অপরের বার্দ্ধক্য, অপরের মৃত্যু কখন সম্ভব পর হইতে পারে না।

আত্মা স্বাধীন। আত্মা আপনি আপনার অধীন। আত্মা কখনও পরের অধীনতা স্বীকার করে না ও করিতে পারে না। জড়রাজ্যের তত্ত্বসকল দ্বিতীয় অধ্যায়ে যেরূপ বিবৃত হইয়াছে, তাহাতে প্রদর্শিত হইয়াছে জড় নিতান্ত পরাধীন। পর কে? সজ্ঞান ও সচেতন আত্মা। আত্মা আর জড় এই দুই প্রকার বস্তু লইয়া জগৎ। জড় ও আত্মা ভিন্ন জগতে আর যখন বস্তু নাই, তখন জড় আত্মার পর আত্মা জড়ের পর, ইহা ভিন্ন আর কি হইতে পারে? জড় আত্মার অধীন, আত্মা স্বাধীন। জ্ঞান, ভাব, ইচ্ছা, এই তিনটী আত্মার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ। সূর্য্য যেমন অন্ধকার ভেদ করিয়া উদিত হয়, জ্ঞান সেই রূপ সমস্ত মোহজাল ছিন্ন করিয়া স্ফুরিত হয়। সুতরাং জ্ঞানের নিকটে যে, কোন রূপ অন্ধকার তিষ্ঠিতে পারে না ইহা নিশ্চিত। ভাব জ্ঞানের পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়া সৌন্দর্য্য ও পবিত্রতা গ্রহণ করে; আত্মা সেই সৌন্দর্য্য ও পবিত্রতা দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া যায়। এই সময়ে ইচ্ছা এত তীব্র ভাবে আত্মাকে উত্তেজিত করে যে উহার সেই তীব্রতা অনিবার্য্য। যেমন জল তেজের বিরোধী হইলেও মেঘে বিদ্যুদগ্নি নিবারিত থাকে না, সেই রূপ ইচ্ছা বিস্ফুরিত হইলে, যত প্রতিবন্ধ থাকুক আত্মার

কার্য্য অপ্রকাশ থাকে না। জ্ঞানবিবেকবলে যাহা কিছু কর্ত্তব্য বলিয়া অবধারিত হয়, ইচ্ছা সত্বরা হইয়া তাহা সম্পন্ন করে। ইচ্ছার এই সত্বরতার নিকট কোন প্রতিবন্ধক এক মুহূর্ত্তও তিষ্ঠিতে পারে না। এই জন্য পূর্ব্বতন পণ্ডিতগণ জড়কে বিষয় এবং আত্মাকে বিষয়ী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যাহার বিষয়, সেই বিষয়ী। সুতরাং অতি সহজে বুঝা যাইতেছে যে, বিষয় আত্মার অধীন, কাজে কাজেই আত্মা স্বাধীন। আত্মার এই স্বাধীনতা বিষয়ের নিকটেই সঙ্গত। কিন্তু ঈশ্বর যিনি সমুদায় জগতের এক মাত্র স্রষ্টা, যাহাতে আত্মা ও জড় আশ্রিত ভাবে রহিয়াছে, তাঁহার নিকটে অসঙ্গত। আত্মার তাদৃশ বল ও সৌন্দর্য্য যিনি প্রদান করিয়াছেন, তিনি কি আত্মার পর হইতে পারেন? কখনই না। প্রত্যুত তিনি আত্মার আপনার অপেক্ষাও আপনার। সুতরাং যিনি ধন, মান, জ্ঞান, বল ও বুদ্ধি সমুদায়ের মূল কারণ, তাঁহার অধীনতা পরাধীনতা নহে। বরং যিনি আপনার, তাঁহার বিরুদ্ধে কার্য্য করিলেই প্রকৃত পরাধীনতা প্রকাশ পায়। অতএব ঈশ্বরের একান্ত অনুগত থাকিয়া বিষয়াকর্ষণের প্রতিকূলে অগ্রসর হওয়াই প্রকৃত স্বাধীনতার লক্ষণ। এই কথাটী অন্যভাবে অতি সহজে বুঝা যাইতে পারে। যে কার্য্য বিষয়াসক্তির প্রতিকূল, ঈশ্বরের আনুগত্যে তাহা সাধিত হইবে; আর ঈশ্বরের প্রতিকূলে যাহা সম্পন্ন করিবার জন্য চেষ্টা হয়, তাহা বিষয়াসক্তির অনুকূল না

হইয়া যায় না। সুতরাং ইহা অতি সহজে বুঝা যাই-তেছে যে, আমরা যতই ঈশ্বরের অনুগত হইতে পারিব ততই স্বাধীন হইব ; এবং যতই বিষয়ের আকর্ষণে আকৃষ্ট হইব ততই পরাধীন হইব। এই স্বাধীনতার অধিকার কেবল মনুষ্যের আছে, অন্য কাহারও নাই। মনুষ্য ইচ্ছাপূর্ব্বক পাপ পরিত্যাগ করিতে পারে ; ইচ্ছাপূর্ব্বক পরম মঙ্গলা-ধার ঈশ্বরের অনুগত হইতে পারে আর কেহ পারে না ; সুতরাং আত্মা স্বাধীন।

আত্মা শরীরী। আত্মা অপূর্ণ, এজন্য অনেক হওয়া আবশ্যক। অনেক আত্মা সম্মিলিত হইয়া পরস্পরকে সাহায্য করিলে অপূর্ণতা নিরসন এবং দুঃখ দূর হইতে পারিবে, এ জন্য সর্ব্বমঙ্গলাকর পরমেশ্বর আত্মার অনেকত্ব সম্পাদন করিয়া যেমন অপূর্ণতানিবন্ধন দুঃখ দূর করিবার উপায় করিয়াছেন, সেই রূপ আবার শরীর প্রদান করিয়া আত্মাসকলের পরস্পর ঘনিষ্ঠতালাভের সূত্রপাত করিয়া দিয়াছেন। শরীর আছে বলিয়াই পিতা মাতা পুত্র কন্যা এবং তাহাদিগের সম্বন্ধ ও কর্ত্তব্যের প্রয়োজন। শরীর আছে বলিয়াই ভ্রাতা ভগ্নী ও তৎসম্বন্ধোচিত কর্ত্তব্য আছে। শরীরের জন্যই পিতামহ, মাতামহ, মাতুল ও পিতৃস্বসা মাতৃস্বসা প্রভৃতি পরীবার ও তৎসম্বন্ধোচিত কর্ত্তব্য অবশ্য-ম্ভাবী হইয়াছে। শরীরের জন্যই রোগ, শোক, দুঃখ, দারিদ্র্য প্রভৃতি আছে ; এবং সেই জন্যই তাদৃশ পতনো-

সুখ দুঃখরাশির প্রতিকার চিন্তা আছে। শরীরের জন্যই মান, মর্য্যাদা, সুখ, সম্পদ, আহ্লাদ ও আমোদ আছে। শরীরের জন্যই বাল্য যৌবন ও বার্দ্ধক্য প্রভৃতি অবস্থা আছে। এই সকল অবস্থার জন্যই উন্নতি অবনতি আছে; গুরু শিষ্য সম্বন্ধ আছে; এবং উভয়ের প্রতি উভয়ের কর্ত্তব্য আছে। শরীরের জন্য শারীরবিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান, ভূতত্ত্ব-বিজ্ঞান, জ্যোতির্ব্বিজ্ঞান। শরীরের জন্যই শিল্প, সাহিত্য ও গণিত প্রভৃতির প্রয়োজন। শরীরের জন্যই অন্ন বস্ত্র, শরীরের জন্যই সুপথ্য কুপথ্যের বিচার, শরীরের জন্যই ঘর দ্বার সমুদায়ের প্রয়োজন। ফলতঃ শরীর ব্যতীত জগতের সমুদায় প্রয়োজন উঠিয়া যায়। শরীর আছে বলিয়াই পূর্ব্বোক্ত প্রয়োজন ও কর্ত্তব্য সকল আছে। আবার সেই সকল কর্ত্তব্য ও প্রয়োজন আছে বলিয়াই পরস্পর আত্মা সকলের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা ও যোগাকর্ষণ আছে, এবং সেই ঘনিষ্ঠতা ও যোগাকর্ষণের বলেই আত্মার প্রীতি সদ্ভাব বর্দ্ধিত হইতে পারিতেছে। সেই প্রীতি সদ্ভাবাদির বলেই আবার পাপ পুণ্য, সুখ দুঃখ, বিপদ সম্পদ প্রভৃতি অপূর্ণ আত্মার অবস্থা সমুদায়ের হ্রাস বৃদ্ধি হইতেছে। অতএব শরীর চাই, শরীর না থাকিলে আশা ভরসা, উন্নতি, বিনতি, ভক্তি কৃতজ্ঞতা, দয়া দাক্ষিণ্য প্রভৃতি সমস্ত নির্ম্মূল হইয়া যায় এবং জগৎ ভাব শূন্য ও নীরস হইয়া উঠে। তাদৃশ জগৎ সৃজনে ঈশ্বরের রুচি নাই। সুতরাং তিনি শরীর-

বিহীন আত্মার সৃষ্টি করেন নাই। যে অবস্থায় আত্মা স্থাপিত হইয়াছে, এ অবস্থায় শরীর না থাকিলেই চলে না। করুণাময় পরমেশ্বর জাগতিক কার্য্যকলাপের যেরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন, সেরূপ না করিয়া অন্য রূপ করিলে কি হইত, তাহা চিন্তা করিবার আমাদের অধিকার নাই। কিন্তু তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থার এক বিন্দুও অন্যথা করিলে আমাদিগের রাশি রাশি বিঘ্ন বিপত্তি আসিতে পারে। বর্ত্তমানাবস্থায় সেই ব্যবস্থার বাহিরে এক পদও অগ্রসর হইবার আমা-দিগের ক্ষমতা নাই, ইহাই আমাদিগের চিন্তনীয়।

জগতে আত্মার অবস্থান জন্য ঈশ্বর যে রূপ ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন, এবং তাহার পক্ষে যে সকল কর্ত্তব্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন, সেই সমস্ত নির্ব্বাহ করিবার জন্য যেমন শরীর থাকা আবশ্যক, তেমনি শরীরের আবার ইন্দ্রিয় থাকা প্রয়োজন। ইন্দ্রিয়ানুরূপ আবার ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি থাকা আবশ্যক। ইন্দ্রিয়বৃত্তি ও ইন্দ্রিয়বোধ থাকি-লেই তাহার বিষয় থাকা চাই। যাহার পক্ষে যাহা আবশ্যক, তাহার পক্ষে তাহা আছে, কাহারও এক বিন্দু অভাব নাই। ইন্দ্রিয়পরিরঞ্জিত এই শরীর লইয়া আত্মা শরীরী বলিয়া অভিহিত হন। শরীর আত্মার রথ, মন সারথি, ইন্দ্রিয়গণ অশ্ব, আত্মা এই শরীর-রথে চড়িয়া জগতে ভ্রমণ করেন; অথবা শরীর আত্মার কার্য্যসাধক যন্ত্র, শরীর-যন্ত্র দ্বারা আত্মা জগতের কার্য্য করেন।

শরীরযন্ত্রের সাহায্যে আত্মার যে সকল কার্য্য করিবার ব্যবস্থা আছে, সেই সকল কার্য্য সাধনোপযোগী মনোবৃত্তি থাকাও নিতান্ত প্রয়োজন। কেননা মনই ভাব রাজ্যের রাজা; ইন্দ্রিয় সকল তাহার আবির্ভাবের স্থান মাত্র। পূর্ব্বে যে সকল সম্বন্ধ ও সম্বন্ধোচিত কর্ত্তব্যের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, সেই সকল কর্ত্তব্য শরীর দ্বারা সংসাধন করিতে হয়। কিন্তু শরীর কার্য্য করিতে পারে না, শরীর অবশ। সুতরাং শরীর কার্য্যের সাধন হইলেও তাহার পরিচালনী বৃত্তি চাই। সেই জন্য ভক্তি, বিনয়, কৃতজ্ঞতা, দয়া, ক্ষমা, ন্যায়পরতা, বীতরাগিতা, আশা অধ্যাবসায়, সরলতা, উদারতা, প্রীতি ও বৎসলতা, লজ্জা ও সহিষ্ণুতা প্রভৃতির সৃষ্টি হইয়াছে। এই বৃত্তি সকল আছে বলিয়া, এই সকল বৃত্তিনিষ্ঠ বিষয়ও আছে। পিতা, মাতা, গুরু, প্রভু, রাজা, পতি, পত্নী, পুত্র কন্যা, সুহৃদ, সখা, ভ্রাতা ভগিনী, দরিদ্র, রুগ্ন, প্রজা, শিষ্য ও ভৃত্য প্রভৃতি ঐ সমস্ত বৃত্তির বিষয়। শরীর আছে বলিয়া এই সমস্ত শরীরনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে; সম্বন্ধ আছে বলিয়া তৎপালনোপযোগিনী বৃত্তি আছে; বৃত্তি আছে বলিয়া তাহার উপযোগী বিষয় আছে। পতি পত্নী আছে বলিয়া তদনুরূপ ভাব আছে। পুত্র কন্যা আছে বলিয়া বৎসলতা প্রভৃতি আছে। পিতা মাতা প্রভৃতি গুরু জন আছে বলিয়া ভক্তি বিনয় কৃতজ্ঞতা আছে। দুঃখী

দরিদ্র শোকাতুর আছে বলিয়া দয়া দাক্ষিণ্য আছে। কষ্ট যন্ত্রণা আছে বলিয়া ধীরতা, সহিষ্ণুতা, অধ্যবসায় আছে। ইষ্ট জন বিয়োগ আছে বলিয়া শোক মোহ এবং তৎসহনে ক্ষমতা আছে। পাপ পূর্ণ এই জগতে ঘৃণাস্পদ লজ্জাকর বিষয় আছে বলিয়া ঘৃণা ও লজ্জা আছে এবং তাহা হইতে বিমুক্তি লাভের জন্য অনুতাপ করিবার সামর্থ্য আছে। ঈশ্বর ও ঐশ্বর্য্য আছে বলিয়া সমুদায় দুঃখ ও অশান্তি হইতে নিষ্কৃতি লাভ করত সুখ শান্তিতে চিরপরিতৃপ্তি প্রাপ্ত হইবার আশা ও ভরসা আছে।

পঞ্চম অধ্যায়।

একাত্মবাদ নিরসন।

যে সকল দার্শনিকেরা নিজ২ বুদ্ধির সীমা অতিক্রম করিয়া দর্শনশাস্ত্রের অবতারণা বা আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে কোন না কোন সম্প্রদায় এই একাত্ম-বাদ ভ্রান্তিতে নিপতিত হইয়া উহার পরিপুষ্টি ও পরিবর্দ্ধন করিয়াছেন দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষীয় হিন্দু শাস্ত্রের অধিকাংশ স্থানেই এই ভ্রান্তির অধিবাস আছে। কিন্তু কোথাও আভাস, কোথাও অতি অল্প। পণ্ডিত-বর শঙ্করাচার্য্য হইতে এ দেশে উহা এক রূপ বদ্ধ মূল হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, একাত্মবাদিগণের চেষ্টায় আমাদিগের ভূরিশ অনিষ্ট হইয়াছে। কেননা উহা নাস্তি-কতার সুদৃঢ় মূল। এই মূল মানবহৃদয়ে বদ্ধ হইলে ক্রমে তাহা হইতে ঘোরতর নাস্তিকতা উৎপন্ন হয়। মনুষ্য ঈশ্বর হইয়া যায়, সুতরাং ইহকাল, পরকাল, উপাসনা, ধ্যান ধারণা প্রভৃতি কিছুই থাকে না; ধর্ম্মাধর্ম্ম, পাপ পুণ্য, দণ্ড পুরস্কার প্রভৃতিও একবারে বিলুপ্ত হইয়া যায়। অন্যতঃ কেহ কেহ বলেন, এই মত প্রচার হওয়াতে ভারতবাসি-গণের কুসংস্কার অনেক পরিমাণে হ্রাস হইয়াছে, সুতরাং ইহা দ্বারা যে বহু উপকার সংসাধিত হইয়াছে তাহাতে

আর সংশয় নাই। যখন এ সম্বন্ধে দ্বিবিধ মত চলিতেছে, তখন ঐ দুই মত কত দূর বিশুদ্ধ একবার আলোচনা করিয়া দেখা যাউক।

একাত্মবাদিগণ যে সকল কথা লইয়া বাগ্বিতণ্ডা করিয়াছেন, তাহার সমস্ত গুলির উল্লেখ করিবার সময় ও স্থান নাই এবং প্রয়োজনও বোধ হয় না। এ জন্য স্থূল স্থূল কথা গুলির আলোচনা ও অবতরণা করা যাইতেছে।

১। ইহাঁরা বলেন, সচ্চিদানন্দ অদ্বিতীয় ব্রহ্মই বস্তু, অজ্ঞান মায়া প্রভৃতি সমস্ত জড় অবস্তু *।

২য়। তাঁহারা এই অবস্তুর দুইটী ভাব কল্পনা করেন, এক এসমষ্টি, দ্বিতীয় ব্যষ্টি। সমষ্টিতে বল অধিক; ব্যষ্টিতে বল অল্প। সমষ্টি ও ব্যষ্টি ভাবাপন্ন অবস্তুসম্মিলিত বস্তু সাধারণতঃ তাঁহারা চৈতন্য শব্দে উল্লেখ করেন।

৩য়। মায়াসমষ্টিতে উপহিত চৈতন্যকে বলাধিক্য প্রযুক্ত তাঁহারা বিশুদ্ধসত্ত্বপ্রধান বলিয়া নিশ্চয় করেন। এই বিশুদ্ধসত্ত্বপ্রধান চৈতন্য লূতাতন্তুর ন্যায় জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ রূপে বর্ত্তমান আছেন। কেননা

* ইহাঁরা অজ্ঞানকে ঐশী শক্তি বলেন। শক্ত বস্তুতে শক্তি বা গুণ আধেয় ভাবে অবস্থান করে, এইজন্য অজ্ঞান ইহাঁদের মতে অবস্তু। বস্তুর যাহা শক্তি বা গুণ, তাহা অবস্তু হইতে পারে, কিন্তু ব্রহ্মরূপ বস্তুর গুণের নাম অজ্ঞান হইতে পারে না। কেননা ব্রহ্মকে সচ্চিদানন্দ, বলিয়া যাঁহারা নির্দ্দেশ করেন, তাঁহারাই যদি সেই ব্রহ্মের গুণকে অজ্ঞান বলেন তবে ব্রহ্মের চিদাত্মত্ব রহিল কৈ?

সৃষ্টির সমস্ত কার্য্য ইহাঁরই উপরে নির্ভর করে। ইনি সর্ব্বান্তর্যামী সর্ব্বজ্ঞ ও ঈশ্বর নামে খ্যাত। মলিনসত্ত্ব-প্রধান চৈতন্য, বিশ্ব, বৈশ্বানর ও তৈজস প্রভৃতি নাম ইহাঁতে আরোপিত হইয়াছে।

৪র্থ। অধ্যারোপ অপবাদ ন্যায় দ্বারা এই অবস্তূপহিত বস্তুকে পৃথক্ করিয়া বুঝিবার এবং অবস্তু সম্ভূতভ্রান্তি দূর করিবার উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। আর "তত্ত্বমসি" "অহং ব্রহ্ম" প্রভৃতি ভ্রান্তিপোষক বাক্য সত্য বলিয়া প্রমাণ করিতে যত্ন করা হইয়াছে। এইত গেল একাত্ম-বাদিগণের সামান্য মত। এ বিষয়ে আমাদিগের কি মত তাহা এখন ক্রমে ব্যক্ত করা যাইতেছে।

১ম। বস্তু কি? সচ্চিদানন্দ অদ্বিতীয় ব্রহ্ম। কেন? ব্রহ্মই আছেন, ব্রহ্মই সত্য, ব্রহ্মই নিত্য, ব্রহ্মই অবিনাশী, ব্রহ্মই সমস্ত জ্ঞানের ও সমস্ত আনন্দের আধার, এই জন্য। অবস্তু কি? মায়া বা অজ্ঞান। কেন? তাহা নাই, তাহা মিথ্যা, তাহাতে জ্ঞান ও আনন্দের কণামাত্রও নাই এই জন্য। যাহা আছে, তাহা অবশ্যই বস্তু, যাহা নাই তাহা অবশ্যই অবস্তু হইবে। অতএব মায়া বা অজ্ঞান যে কিছুই নয়, একাত্মবাদিগণের কথাই তাহার অকাট্য প্রমাণ*।

---

* বেদান্তমতে এই অজ্ঞান সৎ এবং অসৎ উভয় রূপে অনির্ব্বচনীয়। পঞ্চদশীতেও ঐরূপ উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু যাহা সৎ তাহা সৎই, যাহা অসৎ তাহা কখন সৎ হইতে পারে না। অজ্ঞান ব্রহ্মের

২য়। যাহা নাই, যাহা মিথ্যা, তাহার সমষ্টি হইতে পারে না। বস্তুতঃ যাহার অস্তিত্ব নাই তাহার সমষ্টি এ কথা শুনিলে হাসি ও দুঃখ দুইই উপস্থিত হয়। বামে অঙ্কস্থান শূন্য রাখিয়া কেবল শূন্য দ্বারা যিনি রাশির গণনা করেন তিনি কি উন্মাদ নহেন? সুতরাং আমরা বলিতে পারি যে মিথ্যাকে কৌশল ক্রমে সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়া আবার তাহাকে মিথ্যা বলিয়া বুঝিবার উপদেশ দেওয়াতে লোকের জ্ঞান চক্ষু আবৃত করিবার জন্য এক রূপ চাতুর্য্যজাল প্রস্তুত করা হইয়াছে। আবার যাহা সত্য যাহা নিত্য যাহা বস্তু, তাহার সঙ্গে মিথ্যা বা অবস্তুর সম্মিলন হয় না হইতেও পারে না। বস্তুতঃ যাহা নাই কিছু নয়, তাহার সহিত সম্মিলন হইবে কি রূপে? সুতরাং ঊর্ণনাভ যেমন স্বকৃত জালের নিমিত্ত ও উপাদান উভয়বিধ কারণ, মায়ী ঈশ্বরও তেমনি নিমিত্ত ও উপাদান কারণ, ইহা বলা যাইতে পারে না। ঊর্ণনাভের যে কর্তৃত্ব আছে, তাহাই তাহার স্বকৃত জালের নিমিত্ত, আর ঊর্ণনাভের শরীর সেই জালের উপাদান। তবে কি ব্রহ্মের শরীর আছে? অজ্ঞান বা মায়া কি ঈশ্বরের শরীর?

শক্তি, সুতরাং অজ্ঞান সৎ। আবার অজ্ঞানের উৎপত্তি বিনাশ আছে এই জন্য তাহা অসৎ। এরূপ হইতে পারে না; কেননা যাহা ব্রহ্মের শক্তি তাহা চির কালই সৎ থাকিবে, অসৎ কখন হইবে না। যাঁহারা এরূপ কল্পনা করেন তাঁহারা ভ্রান্ত।

যদি মায়া ঈশ্বরের শরীর হয় তবে সে মায়া অবস্তু হইবে কিরূপে? সুতরাং মায়া মিথ্যা বা অবস্তু হইতে পারে না এবং ঈশ্বরে জগৎ ভ্রান্তি বলিয়া একাত্মবাদিগণ যে আড়ম্বর করিয়াছেন তাহাও হইতে পারিল না। কেননা তাঁহাদিগের কথা দ্বারা মায়া ঈশ্বর হইতে ভিন্ন বা অবস্তু বলিয়া প্রমাণ হয় না। আর যদি মায়াকে অবস্তু বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চাও, তবে বস্তু অবস্তুতে সম্মিলন হইতে পারে না, সুতরাং ঈশ্বরে জগৎ ভ্রান্তি হইতে পারিল না।

৩য়। যখন বস্তুতে অবস্তুর উপস্থিতি হইতে পারে না*, যখন মায়া কিছুই নয়, তখন তাহাতে উপাদান হইবার বস্তু কোথায়? যখন উপাদান হইবার কিছুই নাই, তখন তাহার বিশুদ্ধসত্ত্বপ্রাধান্য এবং মলিনসত্ত্বপ্রাধান্য কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে, এবং তন্নিষ্ঠ ব্রহ্ম ঈশ্বর, প্রাজ্ঞ, বিশ্ব, বৈশ্বানর প্রভৃতি কল্পনাই বা কিরূপে হইতে পারে?

৪র্থ। অধ্যারোপ ন্যায় কি? অবস্তুতে বস্তু জ্ঞান। যেমন রজ্জু সর্প নহে, অথচ রজ্জুতে সর্প বলিয়া ভ্রান্তি জন্মে, ইহাকে অধ্যারোপ বলা যায়। এইরূপ অধ্যারোপ ন্যায়ও

---

* মায়া ব্রহ্মের শক্তি কিম্বা গুণ বলিয়া স্বীকার করিলে ব্রহ্মেতে মায়া থাকিতে পারে। সে গুণ বা সে শক্তি কখন সুখ দুঃখ ও ক্ষুধা তৃষ্ণার অনুগত হইতে পারে না। যে বস্তুর যে শক্তি তাহা সেই বস্তুর উপযুক্ত হইবে অনুপযুক্ত হইতে পারে না। অগ্নির দাহিকা শক্তি অগ্নির অনুরূপ। উহা তৃণ কাষ্ঠ ভষ্ম করে, অগ্নিকে ভষ্ম করিতে পারে না।

এ স্থলে সঙ্গত হইতে পারে না। কেননা রজ্জুতে যে সর্প বলিয়া ভ্রান্তি জন্মে তাহা কাহার? যাহার সর্প বিষয়ক জ্ঞান আছে। এক দিন যে সর্প আপন চক্ষুতে কোথাও দেখিয়াছে, যে সর্পের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে, রজ্জু দেখিলে তাহারই সর্প বলিয়া ভ্রান্তি জন্মিতে পারে। কিন্তু যে কথন সর্প কিরূপ জানে না, সর্পের অস্তিত্ব মাত্রেও বিশ্বাস করে না, তাহার তদ্বিষয়ক ভ্রম জন্মিতে পারে না। অতএব যে মায়া অবস্তু, যাহার বস্তুতঃ অস্তিত্ব নাই, তদ্বিষয়ক জ্ঞান আসিবে কোথা হইতে? যদি মায়াবিষয়ক জ্ঞান পূর্ব্ব হইতে না আসিতে পারে, তবে ভ্রমও আসিতে পারে না*।

৫ম। এতদপেক্ষা আরও এক চমৎকার রহস্য আছে। "আমি ব্রহ্ম" এবং "তুমিও ব্রহ্ম" এই কথা লইয়া একাত্মবাদী নাস্তিকগণ মারামারি করিয়াছেন, কিন্তু ইহার ভিতরে প্রবেশ করিয়া দোষানুসন্ধান করিয়াছেন এরূপ বোধ হয় না। আমি ব্রহ্ম অথচ আমি রজ্জুতে সর্প দেখিতেছি, তুমি ব্রহ্ম অথচ তুমি শুক্তিতে রজত দেখিতেছ কেন? আমিও ব্রহ্ম তুমিও ব্রহ্ম, তবে ভ্রান্তি কাহার? ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ

---

* পঞ্চদশী প্রণেতার মতে মায়া ব্রহ্মের শক্তি, সুতরাং অক্রিয়া এবং অনাদিসিদ্ধা বা নিত্যা। এরূপ হইলে তজ্জন্য ভ্রান্তি হইতে পারে না। কেননা শক্তির প্রতি শক্তের কর্তৃত্ব, শক্তের প্রতি শক্তির কর্তৃত্ব নাই। আমার শক্তি দ্বারা আমি কার্য্য করিতে পারি, ভ্রান্ত হইতে পারি না।

সুতরাং ব্রহ্মের ভ্রান্তি নাই, ইহা স্বতঃসিদ্ধ। “অহং ব্রহ্মের ভ্রান্তি” বলিলেও সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মেরই ভ্রান্তি বলা হইতেছে। সুতরাং “ব্রহ্ম সৎস্বরূপ, ব্রহ্ম আনন্দ-স্বরূপ” এ সকল সত্য বিনাশ প্রাপ্ত হইতেছে। ইহা যদি বিনাশ পাইল, তবে সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের উপরে সাঙ্ঘাতিক খড়্গাঘাত করা হইল। ব্রহ্মের এত দুর্গতি, এত অবমাননা কেন? ব্রহ্ম এত বিড়ম্বিত হইলেন কেন? এ কি একাত্ম-বাদিগণের মহিমা? অথবা তাঁহাদের কল্পিত মায়ার প্রভাব * ?

ইহাঁরা যে মায়াকে প্রথমতঃ অবস্তু বলিয়াছেন, পরে আবার সেই মায়াকে এত দূর প্রবল প্রতাপ অর্পণ করি-য়াছেন যে ব্রহ্মের উপরেও তাহার আধিপত্য! যে মায়া অবস্তু, সে মায়ার এত প্রভাব হইল কিরূপে? হায়! অবস্তুর এত ক্ষমতা হইল যে সে বস্তুর উপরে, সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের উপরে আধিপত্য করিল? কি চমৎকার! কি

---

* মায়া যদি স্বতন্ত্রা হন, তবেই তদ্দর্শনে ব্রহ্মের ভ্রান্তি হওয়া সম্ভব; কিন্তু একাত্মবাদিগণ তাহা বলেন না। তাহা বলিলে ব্রহ্মের অদ্বৈতত্ব বিনষ্ট হইয়া যায়। তথাপি মায়ার অসীম প্রভাব কল্পনা করিয়াছেন, ইহা অল্প আশ্চর্য্য নহে। আবার মায়া যদি শক্তি, তবে তাহাতে ভ্রান্তি হইবে কিরূপে? কেননা শক্তিতে ভ্রান্তি নাই, ত্রুটিতেই ভ্রান্তি। পরব্রহ্মে এক বিন্দুও ত্রুটি নাই, এই জন্য তিনি সর্ব্বশক্তিমান্। অনন্তশক্তি অনন্ত জ্ঞান ব্রহ্ম ভ্রান্ত,—ইহা অপেক্ষা দুঃখের সংবাদ আর কি আছে?

অসঙ্গত ভ্রান্তি! অনেকে এই মতকে আবার অতি উচ্চ জ্ঞানে আলিঙ্গন করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের প্রতি আ-মার বিনীত নিবেদন, যদি তাঁহারা বা অন্য কেহ এই মায়া-ত্মক মতে যোগ দিতে যান, তবে অগ্রে ইহার গূঢ় অবস্থা ঘটিত সত্যাসত্য বিশেষরূপে আলোচনা করিয়া দেখিবেন। যদি বিশ্বাস যোগ্য হয়, পরে গ্রহণ করিবেন। সহসা অন্য কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া ইহাতে বিশ্বাসস্থাপন করিলে সত্যের প্রতি অন্ধদৃষ্টি হইয়া পড়িবেন।

যাহা বলা হইল তদ্দ্বারা সুন্দর বুঝা যাইতেছে যে একাত্মবাদ মিথ্যা, অলীক এবং অপ্রামাণ্য, সুতরাং অগ্রাহ্য। যদি একাত্মবাদ অগ্রাহ্য, তবে গ্রাহ্য কি? অবলম্বনীয় কি? কোন্ মত আশ্রয় করিলে আমাদিগের মঙ্গল? ইহার এক মাত্র উত্তর এই, যাহা বিশ্বাসসিদ্ধ, তাহাই অবলম্ব-নীয়। বিশ্বাস্য এবং বিশ্বাস রাখিবার স্থানই বা কোথায়? একাত্মবাদিগণ ব্রহ্মের যে লক্ষণ উদ্ধৃত করিয়াছেন, আমরা কেবল মাত্র সেইটী ধরিয়া আলোচনা করিলে বিশ্বাস রাখিবার অনেক স্থান পাইতে পারিব, কিন্তু তদ্ব্য-তীতও পূর্ব্বতন শ্রুতিসকল অনুসন্ধান করিলে আরও সুন্দর বিশ্বাসের ভূমি পাইতে পারা যায়।

একাত্মবাদীরা বলেন, ব্রহ্ম সৎস্বরূপ, চিৎস্বরূপ, আনন্দ স্বরূপ এবং অদ্বিতীয়। সৎস্বরূপ কি? যিনি সকল দেশে ও সকল কালে সমানরূপে বিদ্যমান। চিৎ-

স্বরূপ কি? যিনি গুপ্ত ও প্রকাশ্য সকল তত্ত্ব জানেন। কোন বিষয়ে যাঁহার এক বিন্দুও অল্পজ্ঞতা নাই। আনন্দ কি? যাহাতে দুঃখ, শোক, ভয়, বিষাদ প্রভৃতি নাই। অদ্বিতীয় কি? না—যাঁহার আর দ্বিতীয় নাই অর্থাৎ যাঁহার অনুরূপ কোথাও নাই। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য শ্রুতিকারগণ ইহাঁকে সর্ব্বশক্তিমান্ সর্ব্বাশ্রয়, সর্ব্বনিয়ন্তা, মঙ্গলময়, শুদ্ধ, অপ্রতিম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন*। যিনি দেশ ও কালে পরিচ্ছিন্ন, স্থূল, সূক্ষ্ম, গুপ্ত ও প্রকট, বেদ্য ও অবেদ্য সকল জানিতেছেন, যাঁহাতে দুঃখ, শোক, ভয়, বিষাদপ্রভৃতি স্থান পাইতে পারে না, তিনি অবশ্যই সর্ব্বশক্তিমান্। যিনি সর্ব্বশক্তিমান্ তাঁহার এক বিন্দুও ত্রুটি থাকিতে পারে না। ত্রুটি থাকিলে সর্ব্বজ্ঞতা সর্ব্বশক্তিমত্তা থাকে না। যাঁহার ত্রুটি মাত্রও নাই, যাঁহার অজ্ঞাত বিষয় মাত্রও নাই, যাঁহাতে দুঃখ শোকাদি আসিতে পারে না, তাঁহার মত যে আর নাই, ইহা বুঝিবার আর সংশয় রহিল না। পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিগণ ব্রহ্মের অদ্বিতীয়ত্ব রক্ষা করিতে গিয়া তাঁহাকে সকল প্রকার কার্য্য হইতে অবসর প্রদান করিয়াছেন। কার্য্য না করিলেও চলে না দেখিয়া কার্য্যকর্ত্রী এক মায়া কল্পনা করিয়া আবার সেই অদ্বৈতত্ব নষ্ট করিয়াছেন। কিন্তু এরূপ করিয়া যে কি লাভ হইল, তাহা একবারও ভাবিয়া দেখেন নাই। বস্তুতঃ অদ্বিতীয় কি? আমরা

* “সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বা বং সর্ব্বশক্তিমদ ধ্রুবং পূর্ণ মপ্রতিমমাতি।”

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তাঁহার অনুরূপ আর নাই সুতরাং তিনি অদ্বিতীয়। এক গুচ্ছ তৃণের সঙ্গে ব্রহ্মের দ্বৈতত্ব কল্পিত হইতে পারে না। এই বিশ্ব তাঁহার নিকটে এক গুচ্ছ তৃণ সদৃশ, তাহার সঙ্গে ব্রহ্মের আনুরূপ্য কি প্রকারে হইবে?

যাউক, যখন ব্রহ্ম জগৎ সৃষ্টি করেন, তখন বস্তুতঃ এক গুচ্ছ তৃণও ছিল না। যখন তৃণটী মাত্রও ছিল না, তখন তিনি আপন ঐশী শক্তিপ্রভাবে এই সমুদায় সৃষ্টি করিয়াছেন*। কুম্ভকার যে ঘট প্রস্তুত করে, স্বর্ণকার যে কুণ্ডল প্রস্তুত করে, তাহার নাম নির্ম্মাণ, সৃষ্টি নহে। কেননা মৃত্তিকা ছিল, অন্যান্য উপকরণ ছিল, সেই সকল বস্তুর সাহায্য লইয়া মনুষ্য নিজের বুদ্ধিপ্রভাবে ঘটকুণ্ডলাদি প্রস্তুত করিতে পারে, সুতরাং এরূপ কার্য্যের সঙ্গে ঐশী শক্তির তুলনা হইতে পারে না। সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের যে সৃষ্টি, তাহাতে করণ উপকরণ কিছুই চাই না। করণ বা উপকরণ চাহিলেই ত্রুটি আসিবে, সুতরাং সর্ব্বশক্তিমত্তা আর থাকিবে না। একাত্মবাদিগণ নিজের ত্রুটি চিন্তা করিয়া দেখিয়াছেন, কোন উপকরণ না পাইলে কিছুই করিতে পারেন না। সুতরাং ঐ স্থান হইতে ফিরিয়া নিশ্চয় করিয়াছেন যে উপাদান ব্যতীত যখন কোন বস্তু হইতে পারে না, তখন ঈশ্বরের জগৎকার্য্যেও উপাদান চাই।

* ।“একমেবেদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীৎ, তদেব সর্ব্বমসৃজৎ।”

এইরূপে নিজের অসামর্থ্য ঈশ্বরের স্কন্ধে আরোপ করিয়া মায়া ব্যতীত কেবল বিশুদ্ধ ব্রহ্ম কোন কার্য্য করিতে পারেন না, ইহাই স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। আমরা এরূপ বলি না। আমরা বলি, ঈশ্বরের জগৎকর্ত্তৃত্বে উপাদান চাই না, উপকরণ করণ কিছুই চাই না, কেবল তাঁর শক্তি চাই। কেননা এ সকল চাহিলেই ত্রুটি আইসে, তাঁহার সর্ব্বশক্তিমত্তা, অদ্বৈতত্ত্ব, চিৎস্বরূপ, আনন্দ স্বরূপে কলঙ্ক আইসে। অতএব ঈশ্বর আপন ঐশী শক্তিপ্রভাবে সমুদায় বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন, আপন শক্তিপ্রভাবে জানেন, ও রক্ষা করিতেছেন। মনুষ্য পশু প্রভৃতি সচল ও অচল সমুদায় তাঁহার আশ্রিত, তিনি সকলের আশ্রয়। তাঁহার মহত্ত্ব, সৌন্দর্য্য, এবং অপ্রতিমভাব দেখিয়া মনুষ্য তাঁহার উপাসনা করিবে, ইহাই যথার্থ, ইহাই সত্য, ইহাই বিশ্বাস্য।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

ঈশ্বর।

জগতে যত পদার্থ আছে, তাহার একটীরও পূর্ব্বে নাম ছিল না। তাহাদের স্বভাব ও শক্তি অনুসারে পরে মনুষ্য কর্ত্তৃক প্রত্যেক বস্তুর নাম প্রদত্ত হইয়াছে। যখন মনুষ্যগণ বস্তু সকল ব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত হয়, তখন তাহাদের স্বভাব ও শক্তির আলোচনা না করিয়া থাকিতে পারে না। সেই সকল বস্তু যখন কার্য্যে প্রয়োগ করিবার আবশ্যক হইল, তখন তাহাদিগের নামও হইল।

ঈশ্বর সম্বন্ধেও সেই রূপ। যখন জগৎ ছিল না, যখন জগতে জ্ঞানবান্ মনুষ্য ছিল না, তখন ঈশ্বরকে কে অনুভব করিবে? সুতরাং তৎকালে তাঁহার নামও ছিল না। বস্তুতঃ ঈশ্বর নিরুপাধি। দেশভেদে, ভাষাভেদে, মনুষ্যহৃদয়ের ভাব ও উন্নতিভেদে লোকেরা তাঁহাকে পৃথক্ পৃথক্ নাম দিয়া ডাকে। তাঁহার স্বভাবের আলোচনা করিয়া যখন মনুষ্য বুঝিতে পারে তাঁহারি শাস্তৃত্ব আছে, কেহ তাঁহার শাসন অতিক্রম করিতে পারে না, তখন তাঁহাকে শাস্তা বলিয়া সম্বোধন করে। যখন তাঁহাতে পালকের স্বভাব দেখিয়া বিমুগ্ধ হয়, তখন তাঁহাকে পিতা বলিয়া ডাকে। যখন তাঁহাতে বিচারকের ভাব দেখিতে পায়, তখন তাঁহাকে

রাজা বলিয়া সম্বোধন করে। যখন মনুষ্য তাঁহার ঐশী শক্তির পরিমাণ করিতে না পারিয়া ফিরিয়া আইসে, তখন তাঁহাকে সর্ব্বশক্তিমান্, ও যখন দেখিতে পায় তাঁহাতে দুঃখ শোক ভয় বিষাদ কিছু মাত্র নাই, তখন তাঁহাকে আনন্দস্বরূপ বলিয়া আনন্দে গলিয়া যায়। যখন দেখিতে পায় তাঁহার সত্তা সকল কালে ও সকল দেশে বিদ্যমান, তখন তাঁহাকে সত্যস্বরূপ না বলিয়া থাকিতে পারে না। যখন তাঁহার স্নেহ ও মমতা, ক্ষমা ও সহিষ্ণুতার পরিচয় পায়, তখন ব্যগ্রতা সহকারে তাঁহাকে জননী বলিয়া পরিতৃপ্ত হয়। যখন তাঁহার জ্ঞান শক্তির আলোচনা করিয়া তাঁহার নৈপুণ্য ও অসীম জ্ঞাতৃত্ব অনুভব করিতে পারে, তখন তাঁহাকে স্রষ্টা নিয়ন্তা ও সর্ব্বদর্শী বলিয়া সম্বোধন করে। যখন মনুষ্য ভাবিয়া দেখিল ঈশ্বর ভিন্ন এক মুহূর্ত্ত বাঁচিবার যো নাই, একটী নিশ্বাস প্রশ্বাসও তাঁহার করুণা ভিন্ন প্রবাহিত হইতে পারে না, তখন তাঁহার নাম জীবনের জীবন আত্মার আত্মা রাখিল। এইরূপ চিন্তা ও উপলব্ধি দ্বারা মনুষ্য ঈশ্বর হইতে যখন যে ভাব দোহন করিতে পারে, তখন সেই ভাবের অনুরূপ একটী নাম দিয়া তাঁহাকে ডাকে। বস্তুতঃ তাঁহার কোন নাম নাই, যদি পূর্ব্ব হইতে তাঁহার কোন নাম থাকিত, তবে সকল দেশীয় নর নারী তাঁহাকে একটী মাত্র নাম ধরিয়া ডাকিত। যখন মনুষ্য বুঝিল যে ঈশ্বরকে ছাড়িয়া

থাকিলে জীবন শূন্যভাব ধারণ করে, তখনই তাঁহার নামের প্রয়োজন হইয়াছিল, এবং তখন হইতে ক্রমে তাঁহার অনন্ত শক্তির পরিচায়ক অনন্ত নাম জগতে ব্যাপ্ত হইল।

ঈশ্বরের কোন ভৌতিক আকার নাই, ঈশ্বর নিরাকার। ঈশ্বরকে নিরাকার বলিলে ইহা বুঝায় না যে তাঁহার কিছুই নাই। তাঁহার যাহা আছে, তাহাই সমস্ত জগতের মূল কারণ, কিন্তু উহা ইন্দ্রিয়গণের অবিষয়ীভূত। ভৌতিক বস্তু বা সৃষ্ট বস্তুর প্রতিই ইন্দ্রিয়গণের অধিকার। সৃষ্টির অতীত বস্তুর প্রতি ইন্দ্রিয়ের কর্ত্তৃত্ব চলে না *। ঈশ্বর সকলের স্রষ্টা, তিনি সৃষ্ট নহেন; সুতরাং তিনি সৃষ্টির অতীত। সৃষ্টির অতীত ঈশ্বর ভিন্ন আর কিছুই নাই; এই জন্য তাঁহার নিকটে ইন্দ্রিয়দিগেরও কোন ক্ষমতা নাই। ইন্দ্রিয় আমাদিগের জ্ঞান লাভের প্রধান উপায়। যে স্থানে ইন্দ্রিয়ের কোন অধিকার নাই, সে স্থানে আমাদিগের জ্ঞানও অচল। তবে কি আমরা ঈশ্বরকে অনুভব করিতে অনধিকারী? চিন্তা করিলে প্রতীত হইবে যে আমরা তাঁহাকে না অনুভব করিয়াই থাকিতে পারি না। জ্ঞান বাহ্য জগতে কার্য্য করিতে গিয়া যেমন ইন্দ্রিয়দিগের মুখাপেক্ষা করে, অন্তর্জগতেও তাহাকে তাহাই করিতে হয়

* "[illegible] নেতীতি নেতীতি শেষিতং যৎ পরং পদং।
নিরাকর্ত্তুমশক্যত্বাৎ তদস্মীতি সুখী ভব॥"

ঈশ্বরের নিকটে যাইতে ইন্দ্রিয়গণের সাহায্য পরম্পরা-সম্বন্ধে সাক্ষাৎসম্বন্ধে নহে। প্রথম ইন্দ্রিয়গণের সাহায্যে বাহ্য বস্তু, বাহ্য বস্তুর সাহায্যে আত্মা, আত্মার সাহায্যে পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকি। ইহাতে ঈশ্বর স্বতঃসিদ্ধ-রূপে জ্ঞানের আয়ত্ত, এ কথার কোন বাধা উপস্থিত হইল না। কারণ বাহ্যবস্তুজ্ঞান এবং আত্মজ্ঞান যেমন যুগপৎ প্রস্ফুটিত হইতে থাকে, আত্মজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে তেমনি ঈশ্বর জ্ঞানও প্রস্ফুটিত হইতে থাকে। একেবারে স্বতঃসিদ্ধ না বলিয়া পরম্পরা প্রদর্শন করা কেবল জ্ঞান অভ্যুদয়ের ক্রম দেখাইবার জন্য এবং ইহাতে বিষয়টী বুঝিবার পক্ষে সহজ হয় এই জন্য।

আমরা যখন জননীর ক্রোড়ে শয়িত থাকিয়া স্তন্য পান করিতাম, তখনই ঈশ্বরের পরিচায়ক অসংখ্য বস্তু বিদ্যা-মান ছিল। তখন যদি উপযুক্ত জ্ঞান প্রস্ফুটিত হইত, তাহাদিগের নিকটে ঈশ্বরের সংবাদ অতি সহজে লাভ করিতে পারিতাম। চিন্তাপথে আপনাকে পূর্ব্বাবস্থায় স্থাপিত করিয়া যখন দেখি জননী এক অনির্ব্বার্য্য প্রকৃতি দ্বারা পরিচালিত হইয়া আমাকে লালন পালন করিতেছেন; যখন দেখি সে প্রকৃতিকে অবরুদ্ধ ক-রিয়া রাখিবার তাঁহার শক্তি নাই, অনেক সময় বিরক্ত হইয়া, অথবা ক্লেশবহনে অসমর্থ হইয়া ভালবাসিতে চাহেন না; অথচ ভাল না বাসিয়াও থাকিতে পা-

রেন না; যখন দেখি প্রবল শীতের সময় দুঃখিনী জননী স্বয়ং অনাবৃত শরীরে থাকিয়া অসীম দুঃখরাশি বহন করিতেছেন, অথচ যাহা কিছু আচ্ছাদন সম্বল ছিল, সমুদায়ে আমার শরীর আবৃত করিতেছেন, দুর্গন্ধময় আর্দ্র শয্যায় নিজে শয়ন করিয়া আমাকে শুষ্ক ও পরিষ্কৃত শয্যায় রাখিতেছেন; যখন দেখি অসঙ্কুচিত চিত্তে আমার মল মূত্রাদি ধৌত করিতেছেন তাহাতে বিন্দুমাত্রও অনিচ্ছা বা বিরক্তির ভাব নাই; এই সকলের মূল কারণ কি যদি একবারও সে সময়ে চিন্তা করিয়া দেখি, তখনই হৃদয়ে ঈশ্বরের মূর্ত্তি স্পষ্ট বিস্ফুরিত দেখিতে পাই।

আবার দেখি সেই স্নেহের প্রতিমার সহিত আমার অতি সুন্দর সামঞ্জস্য রহিয়াছে। বাল্যকালে আমি সর্ব্ব বিষয়ে অক্ষম। শয়ন, ভোজন, গমন, বাক্যদ্বারা মনের ভাব ব্যক্ত করণ, ইহার কিছুই করিতে পারি না। রোগ কি, সুস্থতা কি, হিত কি, অহিত কি, পথ্য কি, অপথ্য কি কিছুই বুঝিতে পারি না। আমি আপনি আপনার কোন বিষয় নিশ্চয় করিতে কি তদনুসারে কার্য্য করিতে অসমর্থ। এমন কি আমি ভুজঙ্গের মুখে হাত দিতেও সঙ্কোচ করি না। এ অবস্থায় সেই স্নেহের প্রতিমা জননী ভিন্ন আমি এক মুহূর্ত্তও জীবন বাঁচাইতে পারি না। কোথা হইতে জননী আসিলেন? জননীর অনিচ্ছাসম্ভূত সেই স্নেহরস কোথা

হইতে আসিয়া তাঁহার হৃদয় অধিকার করিল; এবং সে স্নেহ আমার এত উপযোগী কে করিয়া দিল, এ সকল কথা চিন্তা করিলে কি আর ঈশ্বরকে বুঝিবার বাঁকি থাকে? আবার দেখি জননী আমার শরীর পোষণ জন্য স্তন্য দান করেন। সে স্তন্যের প্রতিও তাঁহার কোন কর্ত্তৃত্ব নাই। যখন তাঁহার শরীর রুগ্ন হয়, অথবা শারীরিক অবস্থার কোন ব্যতিক্রম ঘটে, তখন ইচ্ছা ও যত্ন করিয়া জননী স্তনে দুগ্ধ আনয়ন করিতে পারেন না; আবার যখন সুস্থ ও সবল শরীরে থাকেন, তখন আপনা হইতে এত দুগ্ধ প্রবাহিত হইয়া পড়ে যে সেই প্রবল দুগ্ধপ্রবাহ নিবারণ করিতে না পারিয়া অনেক সময় তাঁহাকে পীড়ার হস্তে পড়িয়া কঠোর যন্ত্রণা সহ্য করিতে হয়; যখন দেখি স্তন্য দুগ্ধের প্রতি জননীর নিজের কোন ক্ষমতা চলে না, এবং কেবল আমার জীবন রক্ষার উপায় ভিন্ন অন্য কোন প্রয়োজনেও আইসে না, তখন সেই স্তন্যের স্রষ্টা স্নেহময় পিতাকে না বুঝিয়া আর থাকিতে পারি না।

শিশুকাল অতিক্রম করিয়া বুদ্ধির কিঞ্চিৎ পরিপাক হইল, বয়ঃক্রমও কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি পাইল, এখন জননীর নিকট হইতে ক্রমেং সংসারের দিকে চলিলাম, সম্মুখে বিস্তৃত পরিবার। তন্মধ্যে প্রথম পিতাকে পরম পিতার প্রতিনিধিরূপে প্রাপ্ত হইলাম। আমার সুখের জন্য পিতা কত ক্লেশ বহন করেন, কত যত্ন করিয়া আমার জন্য আহার ও পরিচ্ছদ যোগাইয়া

দেন। আমাকে পবিত্র, বিনীত, সুশীল ও ধর্ম্মানুরক্ত দেখিলে, আমাকে সুস্থ ও সবল শরীর দেখিলে পিতার হৃদয়ে আনন্দ আর ধরে না। আমি যখনই চিন্তা করি তখনই দেখিতে পাই, তাঁহার সমস্ত দিন কেবল আমার মঙ্গল চিন্তাতেই অতিবাহিত হয়। আমাকে আহার করিতে দেন মঙ্গলের জন্য, আহার করিতে নিষেধও করেন মঙ্গলের জন্য, দণ্ড দেন মঙ্গলের জন্য, পুরস্কার দেন মঙ্গলের জন্য। আমার প্রতি যাহা কিছু করিতে দেখি সকলেরই উদ্দেশ্য কেবল আমার মঙ্গল। আমার আহারের নিয়ম, আমার শয্যার নিয়ম, আমার বস্ত্রের নিয়ম, যখন পিতাকে এই সকল নিয়ম কর্ত্তারূপে সম্মুখে দেখিতে পাই, তখন সমস্ত মঙ্গলের আধার সেই পরম পিতাকে আর না বুঝিয়া থাকিতে পারি না।

আবার পিতাকে ছাড়িয়া খুল্লতাত, জ্যেষ্ঠ তাত প্রভৃতির নিকটে গেলে আরও নূতনরূপে তাঁহার প্রেমের সংবাদ পাই। মাতৃস্বসা, পিতৃস্বসা, ভ্রাতা ভগিনী যাঁহার নিকটে যাই, তাঁহারই মুখজ্যোতিতে সেই সত্য সুন্দর মঙ্গল পুরুষকে দেখিতে পাই। তাঁহাদিগের স্নেহমাখা সম্বোধন, স্নেহমাখা দৃষ্টি, স্নেহমাখা আলিঙ্গন ও মুখচুম্বন প্রভৃতি যেমন অকৃত্রিম মনোহর, তেমনই সেই পরম পিতার পরিচায়ক। এই সকল সুখের পরিবার কোথা হইতে আসিল? কে এমন সুখের পরিবার মধ্যে আমাকে সংস্থা-

পিত করিল? এ চিন্তা কি বিরাম পায় যতক্ষণ সেই বিশ্বপিতার সুন্দর পরিচয় না পাইতে পারি?

ইহা অপেক্ষা যখন বুদ্ধি পরিস্ফুট ও পরিষ্কৃত হইতে আরম্ভ হইল, তখন নিজের শরীর ও জগতের সাধারণ কার্য্য প্রণালীর উপর দৃষ্টি পড়িতে লাগিল। নিজের শরীরে দেখি হস্ত, পদ, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা প্রভৃতি অপূর্ব্বসাধন ও অলঙ্কার বিদ্যমান। ইহার প্রত্যেক সাধনের প্রয়োজন ও সৌন্দর্য্য যদি চিন্তা করি, তবে একেবারে অবাক্ ও নিস্তব্ধ হইয়া যাই।

প্রথম হস্ত। হস্ত এক অদ্ভুত প্রয়োজনীয় সাধন। হস্ত যদি এক দিন বিকল থাকে, তবে সকল সংসারকে অসার বলিয়া বোধ হয়। হস্তের গঠন ও পরিমাণ এবং উপযোগিতার বিষয় চিন্তা করিলে হৃদয় পুলকে পূর্ণ হয়। ইহার দৈর্ঘ্য, ইহার আয়তন, ইহার সন্ধি সকল অতি নির্দ্দোষ ও প্রয়োজনীয়। ইহার অঙ্গুলি সকল কোনটী হ্রস্ব কোনটী দীর্ঘ, কিন্তু এই রূপ হ্রস্ব দীর্ঘ না থাকিলে কার্য্য চলে না এবং দেখিতেও সুন্দর হয় না। আমরা যত ভাবি, ততই ইহার মধ্যে অদ্ভুত বিচার শক্তির পরিচয় পাই।

তার পর পদ। পদের বিষয় চিন্তা করিলে আপনাকে কত সুখ সৌভাগ্যশীল বলিয়া বিবেচনা করি তাহা ব্যক্ত করা দুষ্কর। ইহার প্রয়োজনীয়তা ইহার নির্দ্দোষ গঠন-প্রণালী অতি অপূর্ব্ব। ইহার সমুদায় বিষয় বিস্তার করিয়া

লেখা নিষ্প্রয়োজন। কেননা প্রতিপদনিক্ষেপে প্রত্যেক মনুষ্যই তাহা সুন্দররূপে অনুভব করিতেছেন।

অতঃপর চক্ষু। চক্ষু না থাকিলে আমার সম্বন্ধে বাহ্য জগৎ থাকা না থাকা তুল্য হইত। আমি সেই পরমোপকারী চক্ষুর সাহায্য ব্যতীত এক পদও চলিতে পারি না, এবং আমার প্রয়োজনীয় একটীও মূর্ত্ত বস্তু বাছিয়া লইতে কিম্বা কার্য্যে প্রয়োগ করিতে পারি না। এমন কি চক্ষুর অভাব হইলে নিজের খাদ্য বস্তু পর্য্যন্ত দেখিতে পারি না। চক্ষু ব্যতীত আমি একেবারে অচল। আবার দেখি এই চক্ষু শরীরের অনুপম সৌন্দর্য্য সম্পাদন করে। চক্ষুর অভাবে অতি রূপবান্ পুরুষও শ্রীহীন বলিয়া প্রতীত হয়। সেই চক্ষু এমন সুনিয়মে উপযুক্ত স্থানে স্থাপিত হইয়াছে যে তাহার অল্পমাত্রও ব্যতিক্রম করিলে আর সৌন্দর্য্য থাকে না। পদ্ম যেমন কোমল সুতরাং নির্জ্জল স্থানে থাকিলে শুকাইয়া যায়, চক্ষুও সেইরূপ কোমল পদার্থে নির্ম্মিত বলিয়া তাহা সর্ব্বদা সজল ভাবে অবস্থান করে। আবার বাহ্য জগতের নানা প্রকার ঘটনাতে সেই সুন্দর চক্ষু অতি সহজে বিনষ্ট হইতে পারে, এ জন্য অতি সুন্দর কৌশলময় দুইটী কবাটে তাহা আবৃত হইয়াছে। সেই কবাট এমন সুন্দর কৌশলে ব্যবস্থাপিত যে, বিপদ উপস্থিত হইলে সে আপনা হইতে চক্ষুকে রক্ষা করে, কর্ত্তার কিছু মাত্র চেষ্টার প্রয়োজন

করে না। আবার সেই পার্শ্বস্থ কবাট সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কৃষ্ণবর্ণ লোমরাজিতে সজ্জিত রহিয়াছে, তাহা দ্বারা বাহিরের আলোক ও উত্তাপ, কীট ও বালুকাকণাদি হইতে চক্ষু রক্ষিত হইতেছে। চক্ষুর ন্যায় প্রয়োজনীয় বস্তু একটী হইলে বিলক্ষণ ত্রুটি হইত, কারণ দৈবাৎ একটী বিনষ্ট হইলেই সমুদায় জগৎ অন্ধকারে নিমগ্ন হইত। একটী নষ্ট হইলেও অন্যটীর দ্বারা কার্য্য চলিতে পারে, এজন্য চক্ষু দুইটী হইয়াছে। এই চক্ষুর দর্শনশক্তির বিষয় চিন্তা করিলে আরও বিস্মিত হইতে হয়। যত সূক্ষ্ম ও দূরস্থ বিষয় অবলোকন করিতে না পারিলে অনিষ্ট সম্ভব, চক্ষু তাহা সকলই দর্শন করিতে সক্ষম। আবার উহার যে অংশ দৃষ্টির কার্য্য সম্পন্ন করে, তাহা একটী ক্ষুদ্র তৃণের ন্যায় সূক্ষ্ম, কিন্তু তাহার শক্তি এত ব্যাপক যে সে এক পলকে অর্দ্ধ জগৎ নিরীক্ষণ করিতে পারে। এই দর্শন শক্তি এত শীঘ্রগামী না হইলে আমাদিগের কার্য্য অচল হইত।

তার পর কর্ণ। কর্ণ যে বিষয়ে উপযোগী বাহিরে তাহার সমুদায় সামগ্রী বিদ্যমান। শব্দশ্রবণ কর্ণের বিষয়, কিন্তু উহা কেমন আশ্চর্য্য ভাবে আমাদিগের প্রয়োজন সম্পন্ন করে তাহা চিন্তা করিলেও অতুল আনন্দ প্রাপ্ত হওয়া যায়। কর্ণের স্থান ও রচনাপ্রণালী কেমন অতিনিগূঢ়-কৌশলসম্পন্ন এবং তাহা দ্বারা মানুষ কেমন সুন্দর বলিয়া প্রতীত হইতেছে। কাহার সাধ্য এইরূপ কৌশলপূর্ণ

যন্ত্রের অনুরূপ প্রস্তুত করে? এই পৃথিবীতে সুমধুর সঙ্গীত ও বাদ্যনিনাদ, জননীর স্নেহ বাক্য, পিতার আশীর্ব্বাদ, গুরুর উপদেশ, ভ্রাতা ভগিনী ও স্ত্রী পুত্রাদির সুমধুর সম্ভাষণ, শত্রুর কর্কশ বাক্য ও কঠোর বজ্র নিনাদ, এ সকলই কর্ণের উপযোগী। কর্ণ না থাকিলে এ সকল সুখ কি রূপে অনুভব করিতাম, এবং ইহাঁর মধ্যে ভিন্নতানির্দ্দেশই বা কি রূপে করিতাম? ভাবিয়া দেখিলে প্রতীত হইবে, যদি আমাদিগের কর্ণ না থাকিত জগতের অধিকাংশ সুখ হইতে আমাদিগকে বঞ্চিত থাকিতে হইত।

নাসিকাও আমাদিগের পরমোপকারী যন্ত্র। এ যন্ত্রের শক্তি ও উপযোগিতা অদ্ভুত। আপাততঃ দেখিতে নাসিকাতে কেবল দুইটী বিবর মাত্র দৃষ্ট হয়। কিন্তু ইহার নিগূঢ় কৌশলনিচয়ের প্রতি মনোনিবেশ করিলে বিস্ময়ের আর ইয়ত্তা থাকে না। জগতে যত পদার্থ আছে, সকলই গন্ধের আবাস। কখন কোন গন্ধ বিষপূর্ণ হইয়া প্রবাহিত হইতেছে এবং তাহা দ্বারা জগতের নানা অনিষ্ট ঘটিতেছে, কখন বা গন্ধ জগতের প্রাণ বিতরণ করিতেছে। সুগন্ধ পুষ্প, সুগন্ধ খাদ্য, ও সুগন্ধ প্রাণবায়ী ঔষধ এ সকলই নাসিকার বিষয়। কোন্ গন্ধে শরীরনাশক বিষশক্তি অবস্থান করে, কোন্ গন্ধে জীবনীশক্তি অবস্থান করে, কোন্ গন্ধ- সুখের ও কোন গন্ধ দুঃখের, তাহা নির্ব্বাচন করা নাসিকার কার্য্য। নাসিকা ভিন্ন এ সকল কার্য্য অবধারিত

হইতে পারে না। আমরা যে পৃথিবীতে বাস করি, ইহা নানাবিধ সুগন্ধ দুর্গন্ধের আধার। এখানে নাসিকা না হইলে এক মুহূর্ত্তও চলে না। নাসিকা বিবরযুক্ত না হইলে ঐরূপ গন্ধ প্রবাহ পরিচালিত হওয়া অসম্ভব হইত। আবার ঐ নাসিকা বিবর যদি রোমযুক্ত না হইত, বায়ুকে বিশোধিত করিয়া কে অভ্যন্তরে লইয়া যাইত? প্রত্যেক বায়ুপ্রবাহে ধূলিপ্রভৃতি অনিষ্টকর পদার্থ অভ্যন্তরে নীত হইয়া প্রাণবিনাশ হইত। নাসিকা যে স্থানে আছে, ঐরূপ স্থান ভিন্ন মনুষ্য এক বিকটাকার জন্তু হইত। বিনা কর্ত্তা ও বিনা চিন্তাতে কি এমন সুন্দর ও উপযোগী সাধন প্রস্তুত হইতে পারে?

ইহার পর রসনা। রসনাও এক অপূর্ব্ব কৌশল। ইহাতে বস্তু নিক্ষিপ্ত হইবা মাত্র তাহার কটুত্ব, তিক্তত্ব, অম্লত্ব, মধুরত্ব প্রভৃতি গুণ বাহির হইয়া পড়ে; সুস্বাদ কি বিস্বাদ কি অবধারিত হয়। আপাততঃ দেখিলে জিহ্বাকে এক খণ্ড পেশীময় মাংসফলক বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু উহার আশ্চর্য্য শক্তির প্রতি মনোনিবেশ করিলে নিয়ন্তার বিচারশক্তি, নিয়ন্তার মঙ্গল ইচ্ছা, নিয়ন্তার উচ্চ অভিপ্রায় বুঝিবার কিছু মাত্র অবশিষ্ট থাকে না। সমস্ত শরীরই চর্ম্ম, মাংস, পেশী ও ঝিল্লী প্রভৃতি উপাদানে নির্ম্মিত, কিন্তু জিহ্বাতে তেমন গুণনির্ব্বাচক শক্তি কোথা হইতে আসিল? শরীরের অন্য স্থানেই বা তাদৃশ শক্তি দৃষ্ট হয় না কেন?

এ সকল বিষয় চিন্তা করিলে হৃদয় স্তম্ভিত হয়। জিহ্বাতে ঐরূপ শক্তি থাকা প্রযুক্ত তাহা আমাদিগের খাদ্য বস্তু নির্ব্বাচনে নিতান্ত উপযুক্ত হইয়াছে। জিহ্বা না থাকিলে আমাদিগের কত যে অমঙ্গলের সম্ভব ছিল, তাহা প্রত্যেক ব্যক্তিই অনুভব করিতে সমর্থ।

তার পর দন্ত। আমরা যখন নিতান্ত শিশু ছিলাম, যখন দুগ্ধ ভিন্ন আমাদিগের আহার ছিল না, তখন আমাদিগের দন্তও ছিল না। দন্ত নিষ্পেষণ ছেদন বিদ্ধ করণ প্রভৃতি কার্য্যের সাধন। যখন দুগ্ধ মাত্র আহার ছিল, তখন এ সকল কার্য্যের কিছু মাত্র প্রয়োজন ছিল না। যখন কঠিন বস্তু আহার করা প্রয়োজন হইল, তখন অকস্মাৎ কোথা হইতে মাংসরাশি ভেদ করিয়া দন্ত সকল শ্রেণী বদ্ধ হইয়া বাহির হইল। এতদ্ব্যতীত ওষ্ঠ, তালু, চর্ম্ম, লোম, নখ ও কেশ প্রভৃতি বাহ্য জগতের উপযোগী অতি প্রয়োজনীয় সজ্জানিচয়ে আমাদিগের শরীর সুসজ্জিত হইয়াছে। এ সকল সজ্জার অভ্যন্তর ভাগে আবার যাদৃশ সুনিপুণ কৌশল বিদ্যমান রহিয়াছে তাহা ভাবিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। ইহার প্রত্যেক সজ্জা সৃষ্টিকর্ত্তার অসীম মঙ্গল ভাব ও বিচার শক্তির পরিচয় দিতেছে। এই অপূর্ব্ব কৌশলই, প্রসিদ্ধ প্রাচীন শবচ্ছেদক চিকিৎসাতত্ত্বজ্ঞের কঠোর নাস্তিকতা চূর্ণ করিয়াছিল। এ সকল আমাদিগের পরম সম্পদ্।

আমরা যখন জননীগর্ভে বাস করিতেছিলাম, তাহার

প্রথমাবস্থায় আমাদিগের এ সকল সম্পদ কিছুই ছিল না। এই পৃথিবীতে আসিবার পূর্ব্বে এক জন জ্ঞানবান্ পুরুষ হইতে আমরা এই সকল প্রাপ্ত হইয়াছি, এবং এই সকল সম্পদ্ লইয়া এই অজ্ঞাত পৃথিবীতে আসিয়াছি। পৃথিবীতে আসিলে আমাদিগের এ সকল সামগ্রীর প্রয়োজন হইবে, ইহা বিবেচনা করিবার কেহ না থাকিলে কি প্রকারে আমরা এ সকল লাভ করিলাম? বিবেচনা ব্যতীত উপযুক্ত বস্তু প্রাপ্ত হওয়া যায় না কিন্তু বিবেচনা কাহার? বিবেচনা কখন শূন্য হইতে আসিতে পারে না, তাহার পাত্র থাকা আবশ্যক।

আবার যখন গর্ভাশয়ের কার্য্যপ্রণালী অনুসন্ধান করি, তখন ঈশ্বরের জীবন্ত সত্তা সুস্পষ্ট দেখিতে পাই। যে রূপে গর্ভ সংস্থিত হয়,যে রূপে তাহা পুষ্ট হয়, যে রূপে শারীরিক উপাদানসকল সংগৃহীত হয়, যে রূপে রক্ষিত ও সজীব হয়, তাহা ভাবিলে শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠে, হৃদয় ভক্তিরসে প্লাবিত হইয়া যায়। ভ্রুণের আহার, ভ্রুণের অবস্থানোপযোগী আবাস, তাহার শরীর পোষণোপযোগী বায়ু, যাহা প্রয়োজন কিছুরই অভাব দেখা যায় না। কোথা হইতে সেই অভাব সকল পূর্ণ হয়, কে তাহার উপযোগিতা নিশ্চয় করে, কি অভাবনীয় কৌশলে অতি সুশৃঙ্খলরূপে কার্য্য সকল সম্পন্ন হয়, তাহা চিন্তার অতীত। সেই অনন্তজ্ঞান ও অনন্তশক্তির আধার ঈশ্বর ভিন্ন কি এ

সকল কার্য্য হইতে পারে? কেহ কেহ বলেন, আমরা প্রকৃতি হইতে এ সকল পাইয়াছি। সৃষ্টিকর্ত্তা কেহ নাই, জ্ঞান, প্রেম, ইচ্ছা প্রভৃতি সেই প্রকৃতির গুণ, কিন্তু প্রকৃতি অন্ধ। প্রকৃতির বিচারশক্তি নাই, সুতরাং যাঁহারা তাদৃশ কুতর্ক দ্বারা নাস্তিকতা আনয়ন করেন, তাঁহারা চক্ষুষ্মান্ অন্ধ।

আমাদিগের দেশীয় তান্ত্রিক ও পৌরাণিকগণ ঐ প্রকৃতিকে ঈশ্বরেরই প্রকৃতি বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। শাক্তগণ ইহাকে জড় শক্তি বলেন। কেহ বা প্রকৃতি বলিয়া একটী স্বতন্ত্র পদার্থ স্বীকার করেন। যাঁহারা প্রকৃতিকে ঐশী শক্তি বলেন, তাঁহারা বড় মন্দ বলেন না। কিন্তু যাঁহারা প্রকৃতি স্বতন্ত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, তাঁহাদিগের নির্দ্দেশের মূল নাই। যাঁহারা প্রকৃতিকে জড়শক্তি বলেন, তাঁহাদের প্রকৃতি তেমন গুণ সম্পন্ন হইতে পারে না যাহাতে সৃষ্টি হইতে পারে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে জড় প্রকৃতি অন্ধ। ঐরূপ জড় প্রকৃতি দ্বারা কদাচ জগতের নিয়ম, শৃঙ্খলা ও ব্যবস্থা ব্যবস্থাপিত হইতে পারে না। যদি প্রকৃতির তেমন শক্তি থাকিতে পারে, প্রকৃতি কর্ত্তৃক যদি তেমন সুন্দর ব্যবস্থা ব্যবস্থাপিত হইতে পারে, তবে আমরা তাহাকেই ঈশ্বর বলিব, অর্থাৎ ঐরূপ শক্তিসম্পন্ন যে সেই ঈশ্বর। আশ্চর্য্য!! ইঁহারা একটী অন্ধ শক্তির উপরে জগতের সমুদায় ভার অর্পণ করিয়া সুখী হইতে

চান, তথাপি ঈশ্বরকে স্বীকার করিতে চান না। ঈশ্বরের প্রতি কেন যে ইঁহাদের এত আক্রোশ, তাহা বুঝিতে পারা দুষ্কর। দূষিত নীতি নাস্তিকতার মূল অনেকে বলিয়া থাকেন। ভাবিয়া দেখিলে তাহাই সত্য বলিয়া প্রতীত হয়। কারণ অন্ধ প্রকৃতি জগতের স্রষ্টা হইলে স্বেচ্ছাচারিত্বে বিলক্ষণ সুযোগ হয়। যাউক, এখানে এ বিষয় লইয়া বিচার করা নিষ্প্রয়োজন। কেননা ইহার পূর্ব্বে ঈশ্বরের নিয়ন্তৃত্ব বুঝিবার যে সকল উপায় প্রদর্শিত হইয়াছে, যাহার আত্মা আছে জ্ঞান আছে হৃদয় আছে, তাহাই তাহার বিশ্বাসের জন্য দৃঢ়তর ভিত্তিস্বরূপ।

যদিও জননী, নিজের শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, পিতা, পিতৃব্য ও অন্যান্য পরিবার, সকলই ঈশ্বরের অকাট্য পরিচয় স্থল, তথাপি আমাদিগের বয়ঃক্রম যত বাড়িতে থাকে, জ্ঞান যত প্রশস্ত হইতে থাকে, সম্মুখে জ্ঞাতব্য বিষয় যত অসীমরূপে বিস্তৃত দেখিতে পাওয়া যায়, ততই আর শুদ্ধ উহাতে জ্ঞান তৃপ্ত থাকিতে পারে না। ক্রমে ক্রমে প্রশস্ত সংসার কার্য্য ক্ষেত্র হয়। আমরা পরিবার ও আপনাকে ছাড়িয়া দূরেও ঈশ্বরের সংবাদ লইতে যাই।

যখন পরিবার ও আপনাকে ছাড়িয়া সমাজে যাই, তখনও ঈশ্বরের বিচিত্র মূর্ত্তি দেখিয়া স্তম্ভিত হই। তথাকার ঐক্য ভাব, তথাকার কার্য্য প্রণালী, তথাকার কৃতজ্ঞতা ও প্রেম অতি চমৎকার। সেই স্থানে গিয়া দেখি, কেহ

ক্ষেত্র কর্ষণ করে, কেহ বস্ত্র প্রস্তুত করে, কেহ দূর দেশে গিয়া নানাবিধ প্রয়োজনীয় বস্তু আনয়ন করে, কেহ অস্ত্র শস্ত্রাদি প্রস্তুত করে। এই রূপে নানা লোক নানা কার্য্যে ব্যাপৃত রহিয়াছে। তন্মধ্যে এমন সুন্দর বিনিময় প্রথা প্রবর্ত্তিত আছে যাহাতে সকলেরই সকল অভাব দূর হইতেছে। এ স্থানে উত্তমর্ণ ও অধমর্ণের ভাব, রাজা ও প্রজার ভাব, প্রভু ও ভৃত্যের ভাবও চমৎকার! দেখিলেই হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হইয়া যায়। মনুষ্য সাহায্যসাপেক্ষ জীব, জনসমাজ ভিন্ন তাহার এক মুহূর্ত্তও বাঁচিবার উপায় নাই। সংসারে যাহা কিছু প্রয়োজনীয় সমুদায়ই অনেক লোকের একমত ব্যতীত হয় না। সুতরাং সমাজ আমাদিগের নিতান্ত উপযোগী। এরূপ সমাজবন্ধন ব্যতীত মনুষ্যের চলে না। রাজা না হইলে প্রজার চলে না, প্রজা না হইলেও রাজার চলে না। কৃষক না হইলে শস্যোৎপন্ন হয় না, শস্যোৎপাদন ব্যতীত মনুষ্যজীবন বাঁচে না। এইরূপ অন্যোন্যসাপেক্ষতা হইতে সমাজবন্ধন ও পরস্পরের সদ্ব্যবহার দেখিয়া আমরা ঈশ্বরের বিচিত্রতার পরিচয় অতিসুন্দর রূপে প্রাপ্ত হইতে পারি।

আবার লোক সমাজ ছাড়িয়া যদি পশুরাজ্যে যাই, সেখানেও ঈশ্বরের অনন্ত সত্তা দেখিতে পাই। তাহাদিগের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, তাহাদিগের বিচিত্র গঠনপ্রণালী, তাহা-

দিগের শরীরের লোমরাজি, তাহাদের প্রয়োজনীয় বস্তুর মিলন ও পরিমাণ অতি আশ্চর্য্য ভাব প্রকাশ করিতেছে। তাহাদিগের সকলগুলি বিষয়ই অতি সুশৃঙ্খল এবং উপযোগী। কাহার শৃঙ্গ আছে, কাহার শৃঙ্গ নাই। কাহার খুর, কাহার নখর, কাহার খুর অখণ্ডিত, কাহার খণ্ডিত। সকলেই আপন প্রয়োজনোপযোগী সামগ্রী প্রাপ্ত হইয়াছে। কোথাও এক বিন্দু বিশৃঙ্খলা বা অনুপযোগিতা নাই। যাহার যেমন খাদ্য ও বাসস্থান হওয়া উচিত সে তাহাই পাইয়াছে, খাদ্য বেশীই আছে কম নাই।

এইরূপ পক্ষীদিগের মধ্যে অন্বেষণ করিলেও ঈশ্বর অপরিচিত থাকিতে পারেন না। ইহাদিগের পক্ষ, ইহাদিগের শরীরাবরক পত্র, ইহাদিগের চঞ্চু ও পদ এবং পদের অঙ্গুলী ও নখ সকলই চমৎকার ও প্রয়োজনোপযোগী। ইহাদিগের স্নেহ মমতা, ইহাদিগের প্রীতি ও কৃতজ্ঞতা, ইহাদিগের সন্তানপালনের নিয়ম যেরূপ হওয়া উচিত, যাহার যেরূপ হইলে সুন্দর চলিবে কোন ক্লেশ কল্পনা হইবে না, তাহাকে তাহাই প্রদত্ত হইয়াছে। কাহারও উড়িবার শক্তি কম, কাহারও অধিক। যাহার কম তাহার শরীরের আয়তন ও গুরুত্ব অধিক। যাহার উড়িবার প্রয়োজন অধিক, তাহার শরীর ক্ষুদ্র ও লঘু। কাহার কাহার কণ্ঠস্বর ও বাক্‌শক্তি অতি মনোহর, এবং অবস্থা

ভেদে বুদ্ধিশক্তিরও অভাব নাই। কুলায়নির্ম্মাণ, খাদ্যাহরণ, বিপদ্ হইতে আত্মমোচন, তজ্জন্য স্থান নিরূপণ প্রভৃতি তাহার পরিচায়ক। ঈশ্বর ব্যতীত এমন সুন্দর শিক্ষা, সুন্দর অঙ্গাবরণ, ও অঙ্গোপাদান, সুন্দর কণ্ঠস্বর ও বাক্‌শক্তি তাহারা কোথায় পাইল?

এইরূপ মৎস্য প্রভৃতি জল জন্তু ও কীট পতঙ্গ প্রভৃতি প্রাণিগণের বিষয় যত আলোচনা করি, ততই ঈশ্বরের সুস্পষ্ট পরিচয় পাইয়া বিমুগ্ধ হই। যাহার নিকটে জিজ্ঞাসা করি, সেই তাঁহার পরিচয় প্রদান করে, কেহ কোন সন্দেহ রাখে না। আবার প্রাণীদিগকে ছাড়িয়া যদি উদ্ভিদ্‌রাজ্যে যাই, সে স্থানে তাঁহার সাক্ষাৎ পাইয়া সুখী হই। তাল, তমাল, শাল, পিয়াল, নারিকেল, খর্জ্জুর, বট, অশ্বত্থ, শমী, খদির প্রভৃতি মহাবৃক্ষ, বংশ প্রভৃতি গুল্ম, মাধবী প্রভৃতি লতা, পুষ্পবৃক্ষ, ফলবৃক্ষ, শাক সূপ, ওষধি প্রভৃতি যাহাকে সম্মুখে লইয়া চিন্তা করি, জিজ্ঞাসা করি তাহারই নিকট তাঁহার পরিচয় পাই। ইহাদিগের নির্ম্মাণ কৌশল ইহাদিগের অবস্থার ব্যবস্থা নিতান্ত উপযুক্ত, সেই সেইরূপ না করিয়া দিলে তাহাদিগের ও আমাদিগের চলিত না। সুতরাং শিরা, বন্ধনী, রসাকর্ষণশক্তি ও আকৃতি প্রভৃতি নিতান্ত উপযোগী করিয়া সজ্জিত হইয়াছে। গুণ, রস, ফল, পুষ্প সকলই উপযুক্ত। এইরূপ প্রয়োজনানুসারে মূল, স্কন্ধ, শাখা, উপশাখা,

পত্র, বল্কল, ফল ও পুষ্পাদির ব্যবস্থা ব্যাবস্থাপক না হইলে হয় না। মহাবৃক্ষ সকলের কার্য্যোপযোগিতা, ব্যঞ্জন দ্রব্যের সারবত্তা ও রসালতা, ওষধি সকলের শরীর পোষকতা, ঔষধি সকলের রোগ নিবারকতা আলোচনা করিলে হৃদয় ভক্তি ও কৃতজ্ঞতাতে অবনত হইয়া পড়ে। সে ভক্তি ও সে কৃতজ্ঞতার পাত্র কে, এই বলিয়া যদি প্রশস্ত ও নির্ম্মল হৃদয়ে ডাকি, অমনি সেই অনন্ত প্রেমের আধারকে সম্মুখে দেখিতে পাই।

জগৎ পুস্তক, ঈশ্বর অভিধেয়। জগৎ লক্ষণ ঈশ্বর লক্ষ্য। জগৎ বাচক ঈশ্বর বাচ্য। জগৎ আবির্ভাব, ঈশ্বর ভাব। জগৎ কার্য্য ঈশ্বর কারণ। এই পুস্তকের প্রতি যত মনোযোগ দিয়া পাঠ করিব, ততই ইহার অভি-ধেয়কে সুন্দররূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিব। এই লক্ষণ সকল যত আলোচনা করিব, ততই ইহার লক্ষ্য বস্তু সুন্দর-রূপে চিনিতে পারিব। ইহাকে যত আগ্রহ সহকারে জিজ্ঞাসা করিব, ততই তাঁহার দর্শনের উপায় শুনিয়া কৃতার্থ হইব। বাহিরে দেখিয়া যত ভিতরের দিকে তাকা-ইব, ততই উজ্জ্বল ভাবে তিনি দর্শন দিবেন। উৎপন্ন দেখিয়া উৎপাদক বলিয়া যত ভাবিব, ততই তাঁহাকে নিকটে পাইব।

ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য ধন, ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য অন্ন, ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বস্ত্র বিতরণ করিতে দেখিলে যেমন অতীন্দ্রিয় দয়া,

ইন্দ্রিয়ব্যাপার ঔষধ বিতরণ দেখিয়া যেমন অতীন্দ্রিয় পরোপকারিতা, ইন্দ্রিয়াগ্রাহ্য অশ্রুজল দেখিয়া যেমন অতীন্দ্রিয় হর্ষ শোক, ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য ভীতকে দেখিয়া যেমন অতীন্দ্রিয় ভয়কে না বুঝিয়া থাকিতে পারা যায় না; সেইরূপ ইন্দ্রিয়াগ্রাহ্য জগৎ দেখিয়া, জগতের শৃঙ্খলা ও নিয়ম দেখিয়া, অতীন্দ্রিয় পরমেশ্বরকে না বুঝিয়া থাকিতে পারি না। বিষয় বুঝিতে যেমন ইন্দ্রিয় সহায়, আত্মা বুঝিতে যেমন বুদ্ধি সহায়, ঈশ্বরকে বুঝিতে তেমনি প্রজ্ঞা সহায়। ঈশ্বর যুক্তি ও তর্কের ফল নহেন, কিন্তু স্বতঃসিদ্ধ বিশ্বাসের ফল। যেমন কার্য্যকারণের ভাব স্বতঃসিদ্ধ, যেমন বস্তুগুণের ভাব স্বতঃসিদ্ধ, যেমন ঐক্যানৈকের ভাব স্বতঃসিদ্ধ, সেইরূপ ঈশ্বরের ভাব স্বতঃসিদ্ধ, ইহা আত্মা ব্যগ্রতার সহিত গ্রহণ করে। প্রথম হইতেই মনুষ্য আপনা আপনি ইহা বিশ্বাস করিয়াছে কেহ তাহাকে শিক্ষা দান করে নাই। মনুষ্য আপন হৃদয়ে যে অবিনশ্বর প্রজ্ঞা ধন লাভ করিয়াছে, সেই ধনের বলে সে যেমন সকল সম্পদ্ পায়, সেইরূপ সে আপন হৃদয়স্থ অক্ষয় ধনের বলে ঈশ্বরকেও পাইতে পারে। আমার নিজের অস্তিত্ব বাহ্য জগতের অস্তিত্ব যেমন স্বতঃসিদ্ধ বিশ্বাসের ফল, ঈশ্বরের সত্তা ভাবও সেই রূপ স্বতঃসিদ্ধ বিশ্বাসের ফল। আমি আছি কি না, জগৎ আছে কি না, ইহা লইয়া যেমন কেহ তর্ক করে না কিন্তু বিশ্বাস করে, ঈশ্বর আছেন

কি না, ইহা লইয়াও তেমনি কেহ তর্ক করে না কিন্তু বিশ্বাস করে।

সকলেই যদি তাঁহাকে বিশ্বাস করে, তবে নাস্তিকতা কোথা হইতে আসিল? আমি বলি নাস্তিকও স্বতঃসিদ্ধ-রূপে ঈশ্বরকে অন্তরে২ বিশ্বাস করে কিন্তু অহঙ্কার বশতঃ মুখে স্বীকার করে না। মনুষ্যের স্বভাব যখন সংসারের নানা কৃত্রিমতাতে পড়িয়া বিকৃত হয়, তখনই উহা বলপূর্ব্বক হৃদয়ের বিশ্বাসকে অবরুদ্ধ করিয়া থাকে। যখন ঈশ্বরদত্ত সম্পদ্ পাইয়া মনুষ্য অসহায় হয়, যখন সে চতুর্দ্দিক্ হইতে সাহায্য পাইয়া গর্ব্বিত হয়, যখন সে আপনাকে ধনী, মানী, জ্ঞানী বলিয়া বিশ্বাস করে, যখন ঐশ্বর্য্য মদে মত্ত হইয়া সে আপনাকে পর্য্যন্ত ভুলিয়া যায়, তখনই সে ঈশ্বরকে অস্বীকার করিয়া বাঁচিতে চায়। কিন্তু সে অবস্থায় চিরকাল থাকিতে পারে না। কত অহ-ঙ্কারী ও গর্ব্বিতদিগকে দেখা গিয়াছে, তাহারা বহুকাল ঈশ্বরকে অস্বীকার করিয়াও যখন সকল সম্পদ্ হইতে বঞ্চিত হইয়াছে, তখন পুনর্ব্বার ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইয়াছে। যখন অহঙ্কারের আবরণ উন্মোচিত হইয়া যায়, যখন সে আপনার শক্তি বুঝিতে পারে, যখন সে দেখিতে পায় যে তাহার নিজের কোন ক্ষমতা নাই, সে এক বিষয় বুঝে আর এক বিষয় বুঝে না, একটী কার্য্য করিতে পারে, হয় তো অন্যটী করিতে পারে না, এক বস্তু দেখিতে পায় অন্য

বস্তু দেখিতে পায় না, আপন অন্তর নিহিত ক্ষুধা তৃষ্ণাকেও সে অতিক্রম করিতে পারে না, অথচ সে ক্ষুধা তৃষ্ণাকে তাহার দেহের নিতান্ত উপযোগী বলিয়া বুঝিতে পারে; তখন সে আপনাকে নিঃসম্বল ও অসহায় জানিয়া ঈশ্বরের শরণাপন্ন হয়। এ সকল বিষয়ে প্রমাণের অভাব নাই। জগতে মনুষ্যচরিত্র পাঠ করিলে ইহার অসংখ্য প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। আমাদিগের অন্তরে যে নির্ভরের ভাব আছে, যদি তাহার প্রতি মনোযোগ করি, তাহা হইলেও বুঝিতে পারি মনুষ্য এক মুহূর্ত্তও ঈশ্বর ভিন্ন বাঁচে না। অতি বাল্যে জননীর প্রতি, তৎপর জনকের প্রতি, তার পর গুরুর প্রতি মনুষ্য নির্ভর করিয়া বাঁচে; কিন্তু যখন ইহাদিগের ক্ষমতা, ইহাদিগের বল, ইহাদিগের বুদ্ধি ও বিচারশক্তির পরিমাণ জানিতে পাইয়া স্পষ্ট বুঝিতে পারে যে ইহারা সকল প্রকার বিপদে আমাদিগের সহায়তা ইচ্ছা থাকিলেও করিতে পারে না, তখনই সকল আশ্রয় ছাড়িয়া মনুষ্য দৌড়িয়া ঈশ্বরের চরণতলে উপস্থিত হয়। মনুষ্য কখন নিরাশ্রয়ে অবস্থান করিতে পারে না।

অতীন্দ্রিয় ঈশ্বরকে কিরূপে অনুভব করা যায়, কি উপায়ে তাঁহাতে অটল বিশ্বাস স্থাপন করা যায় তাহা প্রদর্শিত হইল। ঈশ্বর কিরূপ? তাঁহার লক্ষণ কি? এ সকল বিষয়ে কিছু বলা হয় নাই। এ সকল বিষয় বিশেষ করিয়া লিখিবার এ স্থান নহে। উপাসনাতত্ত্ব

লিখিবার সময়ে সে সকল বিশেষ করিয়া লিখিবার ইচ্ছা রহিল।

সপ্তম অধ্যায়।

গুরু বা আচার্য্য।

ঈশ্বর এবং জগৎ এই দুয়ের মধ্যে যে সম্বন্ধ, তাহার নাম ধর্ম্ম। অথবা ঊর্দ্ধে অনন্ত ঈশ্বর নিম্নে জগৎ, এই দুই দিকে মনুষ্যের যে দুইটী কর্ত্তব্যের স্রোতঃ প্রবাহিত আছে, তাহারই নাম ধর্ম্ম। অতি অল্প কথায় ধর্ম্মের লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট হইল, কিন্তু ইহার আভ্যন্তরিক গুরুত্ব ও বিভাগ অল্প নহে। এই সম্বন্ধ অনুভব করিবার এবং এই সম্বন্ধোচিত কার্য্য করিবার শক্তি মনুষ্য ব্যতীত আর কাহারও নাই। সুতরাং এই সম্বন্ধের ভাব জগতের সর্ব্বত্র বিকীর্ণ থাকিলেও মনুষ্যই উহার একমাত্র বিশ্রাম স্থান। কিন্তু মনুষ্য জাতির অবস্থা সর্ব্বত্র সমান নহে। কাহারও মনে স্বতঃ ধর্ম্মভাব উদিত হইয়া তাহাকে ও সমাজকে অলঙ্কৃত করে। কেহ বা সহস্র প্রকার উপদিষ্ট হইলেও নানা কলঙ্ক আনিয়া আপনাকে ও সমাজকে কলঙ্কিত করে। যেমন নির্ঝর নিঃসৃত জল বস্তুতঃ নির্ম্মল, কিন্তু মৃত্তিকা ও মৃত্তিকাজাত বস্তুর শক্তি অনুসারে তাহার

অবস্থা পরিবর্ত্তিত হয়, যেমন বায়ুর প্রকৃতি একরূপ হইলেও স্থানবিশেষে তাহা পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে, সেই রূপ মনুষ্য মনের গতি ও ধারণা শক্তিও সময়ে সময়ে পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। সুতরাং পিতা মাতা পূর্ব্বপুরুষ ও দেশকাল প্রভৃতির অবস্থানুসারে মনুষ্য জাতির মধ্যেও কেহ সুবুদ্ধি, কেহ কুবুদ্ধি, কেহ তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, কেহ জড়, কেহ বাক্‌শক্তি হীন, কেহ শ্রুতিশক্তি হীন ইত্যাদি রূপে রূপান্তরিত ও ভাবান্তরিত হইয়া এই পৃথিবীতে জন্মে। এই সকল কারণে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় গূঢ় মর্ম্মগুলি শিক্ষা ব্যতীত সকলের মনে নির্দ্দোষরূপে স্বতঃ বিস্ফুরিত হওয়া অসম্ভব। যাহাও কিছু সম্ভব, তাহাও স্থান, শৈশবাদি অবস্থা ও সংসর্গ দোষে কার্য্যকর হইতে পারে না; এবং চিন্তাশালতা ব্যতীত তর্ক্য বিষয় মীমাংসিত হইতে পারে না। উপযুক্ত লোকের নিকট উপবিষ্ট হইলে ঐ সকল জটিল দুরূহ বিষয় অল্প পরিশ্রমে, অল্প আয়াসে ও অল্প চেষ্টায় আয়ত্ত হইতে পারে। অতএব ধর্ম্ম বিষয়ে শিক্ষা পদ্ধতি থাকা আবশ্যক। শিক্ষা পদ্ধতি থাকিলে উপযুক্ত শিক্ষক থাকাও চাই। যাঁহারা এই শিক্ষা কার্য্যের ভার গ্রহণ করেন সাধারণ ভাবে তাঁহাদিগকেই গুরু বা আচার্য্য বলা যায়। আপাততঃ আমরা এই শব্দটী সাধুচরিত্র সদনুষ্ঠায়ী উপদেষ্টা মানবদিগের প্রতি ব্যবহার করিয়া থাকি। বস্তুতঃ উহা মনুষ্যের প্রতি তেমন খাটে না।

যদি বল গুরু শব্দে সদুপদেষ্টাকে বুঝাইবে, তাহা হইলেও উহা মনুষ্যের প্রতি অপ্রযোজ্য। যিনি সর্ব্বদর্শী ও সর্ব্বান্তর্যামী, সেই ঈশ্বর মনুষ্য হৃদয়ে উপদেশ না দিলে, ঈশ্বরের কৃপা মনুষ্য হৃদয়ে না পড়িলে, মনুষ্যকৃত উপদেশ কখনও কার্য্যকর হয় না*। গুরুর নিকটে যে শিষ্য উপদিষ্ট হইতে যায়, তাহার কারণ—ঈশ্বরের কৃপাপরিচালিত শিষ্যের ইচ্ছা। যদি ঈশ্বরকরুণা হৃদয়ে বিস্ফুরিত হইয়া শিষ্যের ইচ্ছাকে উত্তেজিত না করে, যদি সেই কারণে সে আপনার জীবনের অপবিত্রতা অনুভব করিতে সক্ষম না হয়, যদি আপনার মহান্ অভাবের জন্য তাহার হৃদয় ব্যথিত না হয়, তবে উপদেশ দিলেও সে শুনে না, শুনিলেও মনোযোগ দেয় না। সুতরাং মনুষ্যকৃত উপদেশ কার্য্য করিতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ আচার্য্য যে উপদেশ প্রদান করেন, তাহাতে মনুষ্যের অতীত নূতন কিছুই হইতে পারে না। যাহা পুরাতন, যাহা সহজ, যাহা ঈশ্বর

---

* শাস্তা বিষ্ণুরশেষস্য জগতাং যো হৃদি স্থিতঃ।
তমৃতে পরমাত্মানং তাত কঃ কেন শাস্যতে॥
বিষ্ণুপুরাণে প্রহ্লাদবচনং।

ন স্তিকুলেন মত্তস্বতেরিতং,
শ্রীমদ্ ভাগবতং।

আত্মনো গুরুরাত্মৈব পুরুষস্য বিশেষতঃ।
শ্রীমদ্ ভাগবতং।

ভগবদ্ভক্তিযুক্তস্য তৎপ্রসাদাত্মবোধতঃ।
সুখং বন্ধবিমুক্তিঃ স্যাদেষ গীতার্থসংগ্রহঃ॥
শ্রীধরস্বামী।

কৃপা প্রভৃতি, সেই জ্ঞান, সেই ভক্তি, সেই বিশ্বাস, উদ্বোধিত হয় মাত্র। অতএব ঈশ্বরই যথার্থ গুরু, ঈশ্বরই আদি গুরু, ঈশ্বরই চিত্তপ্রভব গুরু। কেননা সহজ জ্ঞান ব্যতীত ঈশ্বরের বিশেষ করুণা ব্যতীত কোন উপদেশই কার্য্যকর হইতে পারে না। যদি তাহা পারিত, তবে গুরুকৃত উপদেশ শুনিয়া পশু পক্ষীও জ্ঞানলাভ করিত।

এত বলিয়াও স্বীকার করিতে হইবে গুরু শিষ্য সম্বন্ধ প্রকৃতিমূলক। কেন না ইহা মনুষ্যের প্রকৃতিগত দুর্ব্বলতা হইতে আপনি উদিত হয়। মনুষ্য যখন অভিজ্ঞতা বিষয়ে নিজের দুর্ব্বলতা বুঝিতে পারে এবং সেই দুর্ব্বলতা দূর করা প্রয়োজনীয় বলিয়া বিশ্বাস করে, তখন সে আপনা আপনি গুরুর জন্য উত্তেজিত হইয়া উঠে; এবং আপনা অপেক্ষা অধিক জ্ঞানী কোন মনুষ্যের নিকট হইতে আপনার অভাব সকল দূর করিয়া লইতে যত্ন পায়। কিন্তু এই জন্য যে প্রত্যেক মনুষ্যকেই গুরু স্বীকার না করিলে চলিবে না এরূপ নহে।

আমারা পূর্ব্বে বলিয়াছি, ঈশ্বরের বিশেষ করুণা ভিন্ন মনুষ্য আপন অনভিজ্ঞতা বুঝিতে পারে না। ঈশ্বরের কৃপায় যখন সে আপন অভাব অনুভব করিতে পারে, তখন সে হয় ঈশ্বরের প্রত্যাদেশবলে, না হয় গুরূপদেশের বলে ধর্ম্মজ্ঞান লাভ করে। অনেক মনুষ্য এমত ভাগ্যবান্

আছেন, অনেকের প্রতি ঈশ্বরের দয়া এমন বিশেষরূপে প্রকাশিত হয় যে তাঁহারা বিনা উপদেশে আপনা হইতে অনেক সত্য অতি সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। অন্যে বহু চেষ্টা করিয়া যাহা আয়ত্ত করিতে না পারে, তিনি ঈশ্বরকৃপায় বিনা অধ্যয়নে সে সকল দেখিতে পান। ধর্ম্ম জগতে যত সত্য আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার অধিকাংশ ঐরূপ প্রত্যাদিষ্ট সাধুদিগের জীবনের ফল। যাহা হউক, এরূপ মনুষ্য সর্ব্বদা সংসারে জন্মে না। সংসারে সাধারণতঃ যে সকল মনুষ্য পূর্ব্বে ছিল এবং বর্ত্তমানে আছে, তাহারা অল্পজ্ঞ, অল্পবুদ্ধি, অল্পচিন্তাশীল, অল্পমীমাংসাপ্রিয় ও অল্পসহিষ্ণু। এ জন্য গুরু বা আচার্য্য স্বীকার করা একরূপ প্রকৃতিসিদ্ধ।

আরও এক কথা আছে। যখন সুবিধা আছে, যখন এক জন কৃতবিদ্য সাধুর নিকট গমন করিলে অনায়াসে অনেক কষ্ট নিবারিত হইতে পারে, তখন নিরর্থক কষ্ট পাই-বার প্রয়োজন কি? যৎকালে মনুষ্যগণ নিতান্ত বন্যবেশে কাল যাপন করিত, যখন সকলেই প্রায় তুল্যাবস্থায় ছিল, সে সময়ে কেহ যে কাহাকেও সাহায্য করিতে পারিবে এরূপ আশা ছিল না, তথাপি মনুষ্যের প্রাকৃতিক অভাব ও দুর্ব্বলতাই তাহাদিগকে পরস্পর সাহায্যের জন্য উত্তেজিত করিয়াছে, এবং সেই কারণেই মনুষ্য জাতি সমাজবদ্ধ হইয়াছে; পারিবারিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক উন্ন-

তির পথে অগ্রসর হইয়াছে ; এবং ধর্ম্মসম্বন্ধে নীতিসম্বন্ধে শিক্ষকপরম্পরায় আশ্রয় করা আবশ্যক বোধ করিয়াছে। বিশেষতঃ বাল্য যৌবন ও বার্দ্ধক্য এই তিনটী মনুষ্যের প্রাকৃতিক অবস্থা। ইহার প্রত্যেক অবস্থার ফল তাহার পরবর্ত্তী অবস্থার ভোগ্য। যেমন পূর্ব্বে হস্ত পদাদির সৃষ্টি হইয়াছিল বলিয়া পরে হামাগুড়ির সুবিধা হইয়াছে ; যেমন পূর্ব্বে জিহ্বা ও ওষ্ঠ ছিল বলিয়া দুগ্ধ চুষিবার পক্ষে সুবিধা হইয়াছে ; যেমন এই পৃথিবীতে আসিবার পূর্ব্বে ইন্দ্রিয়গণ ছিল বলিয়া বিষয়জ্ঞানলাভ সহজ হইয়াছে; সেই রূপ বাল্যের উপার্জ্জিত শিক্ষাই যৌবনের ভোগ্য হইবে এবং যৌবনের নৈপুণ্য ও কর্ম্মিষ্ঠতাই বৃদ্ধ বয়সে শান্তি ও আনন্দপ্রদ হইবে। অতএব বাল্য কালে মানবহৃদয়ে সহজে যে অঙ্কুর উদ্ভূত হয়, তাহার পুষ্টির জন্য বিশেষ চেষ্টা চাই। সেই সহজ জ্ঞানের অঙ্কুরকে পোষণ করিবার জন্যই উপযুক্ত আচার্য্যের শরণাপন্ন হওয়া প্রয়োজনীয়। নতুবা শিশুর হৃদয়স্থ জ্ঞানাঙ্কুর অতি সহজে ভগ্ন শুষ্ক নির্জীব ও নিষ্প্রভ হইতে পারে ; অথবা কুটিলভাবে বর্দ্ধিত হইয়া মন্দ ফল প্রসব করিতে পারে। অতএব প্রত্যেক মনুষ্যেরই বাল্য হইতে আচার্য্যস্বীকার কর্ত্তব্য। যিনি বিশেষরূপে ঈশ্বরপ্রসাদ প্রাপ্ত হন তাঁহার পক্ষেও উহা অকর্ত্তব্য নহে ; বরং কর্ত্তব্য বলিয়াই প্রায় পৃথিবীর সমস্ত জাতির মধ্যে এই প্রথা

চলিয়া আসিতেছে। আমাদের জন্মস্থান ভারতভূমিতেও ইহা বহু কাল হইতে প্রচলিত আছে। কিন্তু ভারতবাসী-দিগের প্রায় সমুদায় কার্য্যেই আতিশয্যদোষ প্রবিষ্ট হই-য়াছে, ইহাতেও তাহাই হইয়াছে। ভারতবর্ষীয় আচার্য্যগণ ঈশ্বরের আসনে উপবিষ্ট হইতে সঙ্কোচ করেন না। তাঁহারা ঈশ্বরার্পিত পূজা, ও ঈশ্বরার্পিত স্তব স্তুতি * স্বয়ং গ্রহণ করিতে লজ্জা বোধ করেন না। ঈশ্বরার্পিত দ্রব্যাদি লইয়াই তাঁহারা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন, এবং ছল, বল, কল, কৌশলে উপদিষ্ট ব্যক্তির যথাসর্ব্বস্ব আত্মসাৎ করিতে পারিলেই আপনাদিগকে ধন্য মনে করেন‡। আবার ভবিষ্যৎ কল্পিত নরকাদির ভয় প্রদর্শন করিয়া শিষ্যের উপার্জ্জিত ধন ঐশ্বর্য্যাদি হরণ করিতেও কুণ্ঠিত বা ভীত নহেন। তাঁহারা বৈধ ও ব্যবস্থেয় বলিয়া অযৌক্তিক ও অসঙ্গত প্রতিজ্ঞাবাক্য † পাঠ করাইতেও পাপ মনে করেন না। যদি এই রূপ হইল, তবে গুরুর গৌরব রহিল কৈ? গুরুর গুরুত্ব পদ কি জন্য? ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হইতে গেলে কি কি বাধা বিঘ্ন আছে তাহা

---

* গুরোরগ্রে পৃথক্ পূজা সাপূজা নিষ্ফলা ভবেৎ।

† আত্মদারাদিকঞ্চৈব সর্ব্বং কৃত্বা নিবেদয়েৎ।

‡ গুরবো বহবঃ সন্তি শিষ্যবিত্তাপহারকাঃ ৷
দুর্ল্লভো গুরুরেকোহি শিষ্যসন্তাপহারকঃ ॥

দেখাইয়া দিতে পারেন এই জন্য *। গুরু যদি স্বয়ং ঈশ্বর হইলেন, তবে আর সে প্রয়োজন রহিল কৈ? যে ভৃত্য স্বয়ং প্রভুরূপ ধারণ করিয়া প্রভুর জন্য উপহৃত দ্রব্যাদি ও পূজাবন্দনাদি স্বয়ং অপহরণ করেন, তিনি যে প্রভুর দ্রব্যাপহারী চৌর তাহাতে আর সন্দেহ কি? এরূপ আচার্য্যকে চৌর্য্যাপবাদ হইতে রক্ষা করিবার কি পথ আছে? কখনই না।

কেবল এই রূপ করিয়াও ইহাঁরা সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। যাহা তাঁহাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য, যাহার জন্য তাঁহারা বিশেষ রূপে দায়ী, যাহার অভাবে তাঁহাদিগের সমস্ত গৌরব বিলুপ্ত হইয়া যায়, সেই উপদেশ কার্য্যেও তাঁহারা সম্পূর্ণ উদাসীন। কিরূপে উপদেশ দিতে হইবে? উপদেশের বিষয় কি? জটিল ও অপ্রাঞ্জল শাস্ত্রসকলের মীমাংসা কি? কিরূপ উপায় অবলম্বন করিলে উপদিষ্ট ব্যক্তি পাপ, তাপ, দুঃখ যন্ত্রণা অতিক্রম করিতে পারিবে, এ সকল কথা তাঁহারা স্বপ্নেও মনে করেন না। মনেই বা করিবেন কি রূপে? যাঁহারা নিজে সহস্র সহস্র পাপের কূপে ডুবিয়া রহিয়াছেন, তাঁহারা পরের উদ্ধারের উপায় করিবেন কিরূপে? যাঁহারা বায়ু বিক্ষিপ্ত

---

* তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।
তস্মাদ্গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমং।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ং॥
শ্রীমদ্ভাগবতং

তুষের ন্যায় উদ্দেশ্যবিহীন হইয়া সংসারে বিচরণ করেন তাঁহারা জীবনের লক্ষ্য স্থির করিবেন কিরূপে ? যাঁহারা ভ্রমেও কখন ঈশ্বরের দিকে দৃষ্টিপাত করেন না, তাঁহারা সে পথের বিঘ্ন বিপত্তি জানিবেন কিরূপে ? নিজে না জানিয়াই বা অন্যকে উপদেশ দিবেন কি প্রকারে ? যেমন বণিকগণ পণ্য দ্রব্যের ব্যবসায় করেন এবং তদ্দ্বারা জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করেন, সেই রূপ গুরুতর গুরুর কার্য্যও অজ্ঞ লোকের জীবনোপায়ের ব্যবসায় হইয়াছে।

যে সকল দোষের কথা উল্লিখিত হইল, উহা অতি গুরুতর এবং অনেক সময়ে অপরিহার্য্য হইলেও যে মূল হইতে ইহা উৎপন্ন হইয়াছে তাহা মন্দ নহে। মনুষ্য যখন যে কার্য্য করে তাহা কর্ত্তব্য ও বৈধ জানিয়াই করে, কিন্তু কালে সেই হিত হইতেই সংসারাসক্ত লোকের হাতে পড়িয়া অহিত উৎপন্ন হয়। যখন ভারতীয় বীররূপী সাধু আচার্য্যগণ স্বর্গীয় ভাবের আধার ছিলেন, যখন সেই বীররূপী সাধু-গণ পদাঘাতে পাপের মস্তক চূর্ণ করিতে সমর্থ ছিলেন, যখন তাঁহাদিগের লেশমাত্রও স্বার্থপরতা ছিল না, যখন তাঁহারা ইন্দ্রিয়সংযমে, সত্যনির্ব্বাচনে ও সত্য পালনে সকলের অগ্রগণ্য ছিলেন, যখন মনুষ্যগণ বুঝিয়া-ছিল তাঁহারা দয়া ও প্রেমের অবতার, যখন তাঁহাদিগের স্বর্গীয় বীরত্বদর্শনে লোকসমাজ চমৎকৃত ও বিস্মিত হইয়াছিল; যখন জনসমাজ দেখিল, ভারতীয় সাধুগণ

যাহা করেন তাহা দেবতা ভিন্ন মনুষ্যের দুঃসাধ্য, তখনই তাহারা আপনাপনি সেই আচার্য্যকূলকে ভক্তি করা আবশ্যক বলিয়া বুঝিয়াছিল। বস্তুতঃ তাদৃশ মহত্ত্বপ্রধান লোক ভক্তিভাজন সন্দেহ নাই। এমন কি ইঁহাদিগকে ভক্তি শ্রদ্ধা না করাই পাপ। কেননা যাঁহারা আমাদিগের ধর্ম্মভাববর্দ্ধনের জন্য, আমাদিগের পাপ প্রবৃত্তি কমাইবার জন্য, আমাদিগের ঈশ্বরে ভক্তি পবিত্রতা বর্দ্ধনের জন্য প্রাণ দিয়া যত্ন করিয়াছেন, আমাদিগকে পাপী, অত্যাচারী, কদর্য্যচর্য্য, ভ্রান্তিলিপ্ত দেখিয়া যাঁহারা দয়াতে গলিয়া গিয়াছেন, আমাদিগের উপকারের জন্য যাঁহারা নিজের শারীরিক মানসিক কোন সুখের প্রতি জ্রক্ষেপ করেন নাই, আমাদিগের জন্য যাঁহারা সমস্ত পার্থিব সুখে জলাঞ্জলি দিয়া কত কঠিন নিয়মে কালযাপন করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে কি ভক্তি না করিয়া থাকা যায়? কখনই নহে। এই সময়ে মনুষ্যগণের হৃদয় নিহিত ভক্তি শ্রদ্ধা অত্যন্ত বেগে প্রবাহিত হইয়া আপন সীমা অতিক্রম করে। যখন মানব হৃদয়ের বৃত্তিবিশেষ কোন দিকে বেগে ধাবিত হয়, জ্ঞানিগণ জ্ঞানযোগে তাহা নিয়মিত করিয়া থাকেন। জ্ঞান মনুষ্যের পাপরূপ দুঃখ সমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হইবার উড়ুপ। এই জ্ঞানোড়ুপ যাঁহারা পরিত্যাগ করেন, তাঁহারা নিশ্চয় পাপসমুদ্রে ডুবিয়া মরেন। এই জ্ঞানে ও ভক্তি উভয়ের সঙ্গে উভয়ের

সামঞ্জস্য আছে। মনুষ্য যখন জ্ঞান হারাইয়া কেবল অন্ধ ভক্তির আশ্রয় গ্রহণ করে, তখন সে ভক্তিস্রোতের প্রবল বেগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া পৌত্তলিক হইয়া দাঁড়ায়। আবার ভক্তির মর্য্যাদা অতিক্রম করিয়া জ্ঞানের শরণাপন্ন হইলেও সে শুষ্ক ও বিকৃত ভাবাপন্ন হইয়া নাস্তিকতা অথবা একাত্মবাদের শরণাপন্ন হইয়া পড়ে।

বস্তুতঃ পিতা, মাতা, আচার্য্য প্রভৃতি উচ্চ শ্রেণীর লোকদিগকে ভক্তি বিশ্বাস করা, স্ত্রী পুত্রদিগকে প্রীতি বাৎসল্য করা, দাস দাসী ও দীন দরিদ্র প্রভৃতিকে দয়া করা, স্বাভাবিক কর্ত্তব্য। এ সকল না করিলে পাপ হয়। কিন্তু এ সকল কার্য্যেরও সীমা আছে। সেই সীমার মধ্যে থাকিতে পারিলে আর পাপের ভয় নাই, লঙ্ঘিত হইলেই পাপ। মনুষ্য হৃদয় নিহিত জ্ঞান এই সীমার নিয়ামক। প্রবল ভক্তিস্রোতের মুখে নিপতিত হইয়া জ্ঞানের উপদেশ অবজ্ঞাত হইলে নিশ্চয়ই বিনাশ। এই জন্য দেখা যায় মনুষ্য এক সময়ে যাহা বিশুদ্ধ উপকারের প্রত্যাশায় করে, আপন সীমাতে না থাকিতে পারিয়া তাহা হইতেই আবার অত্যন্ত অপকৃত হয়। ন্যায়ের সীমা উল্লঙ্ঘন করিয়া দীন দরিদ্রের প্রতি অবশ্য কর্ত্তব্য দয়ার অনুষ্ঠান করিতে গিয়া যেমন পাপ জন্মে, ধর্ম্মের বিরোধে স্ত্রী পুত্রগণের প্রতি অবশ্য কর্ত্তব্য প্রীতি স্নেহ অধিক হইলে যেমন পাপ হইয়া থাকে, বিবেকের আদেশ অবহেলা করিয়া

পিতা মাতার প্রতি নিতান্ত কর্ত্তব্য ভক্তি শ্রদ্ধা করিলে যেমন পাপ হয়, উপদেষ্টাকে ঈশ্বরের স্থলাভিষিক্ত করিয়া তৎপ্রতি ভক্তি বিশ্বাস স্থাপন করাও ঠিক সেইরূপ। যাঁহার যাহা ন্যায্য প্রাপ্য তাহা তাঁহাকে না দিলে যেমন বিশ্বাসঘাতক ও কৃতঘ্ন বলিয়া গণ্য হইতে হয়, একজনের প্রাপ্যাংশ অপরকে দিলেও ন্যায়বিচারে সেইরূপ বিশ্বাসঘাতক ও কৃতঘ্ন বলিয়া গণ্য হইতে হইবে। সুতরাং ঈশ্বরের প্রাপ্য ঈশ্বরকে ও গুরুর প্রাপ্য গুরুকে দিতে হইবেক, একের প্রাপ্য অপরকে দিতে পারা যায় না, দিলেই বিশ্বাসঘাতক বা চোর বলিয়া গণ্য হইতে হইবে।

মনে কর স্ত্রী ও কন্যা উভয়কেই প্রীতি করা কর্ত্তব্য ; কিন্তু স্ত্রীর প্রীতির অংশ কন্যাকে এবং কন্যার প্রীতির অংশ স্ত্রীকে দিবে বলিয়া কি কল্পনাও করিতে পার ? যদি না পার, তবে ঈশ্বরের প্রাপ্য পূজা ভক্তি বা স্তুতি বন্দনাদি কদাচ গুরুকে দিতে পার না। এইরূপে জানা যাইতেছে যে এক জনের প্রাপ্য অপরকে দিবার অধিকার বস্তুত কাহারও নাই। অধিকার না থাকিলেও জ্ঞানশূন্য ভক্তি হইতে যে এক প্রকার মোহ জন্মে সেই মোহ আমাদিগের কর্ত্তব্যজ্ঞান ভুলাইয়া দেয়, এবং আমাদিগকে উন্মত্ত করিয়া তুলে। সেই মত্ততায় পড়িয়াই আমরা একের প্রাপ্য অন্যকে দিতে ভয় করি না। এই কারণে ভারতে " ব্যাসো নারায়ণঃ স্বয়ং "—পঠিত হইয়াছে। এই কারণেই শঙ্করাচার্য্য

"শঙ্করঃ সাক্ষাৎ" বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন। এই কারণেই চৈতন্য, অদ্বৈত, নিত্যানন্দ প্রভৃতি বৈষ্ণবগণ ঈশ্বরাবতার বলিয়া পরিগৃহীত হইয়াছেন। এই কারণেই দাশরথি, ভার্গব, বাসুদেব প্রভৃতি রাজন্যবর্গ ঈশ্বর বলিয়া পূজিত হইয়াছেন। এই কারণেই ভারতে "গুরুর্ব্বিশ্বেশ্বরঃ সাক্ষাৎ গুরুর্দ্দেবো মহেশ্বরঃ" পঠিত হইয়া থাকে। এই কারণেই শিষ্যগণ ঈশ্বরের প্রাপ্য যথাসর্ব্বস্ব গুরুর চরণে দিয়া কৃতার্থ হইতে চায়। আবার এই অনুচিত অধিকার হস্তগত করিয়াই ভারতীয় আচার্য্যবংশ অধঃপাতে গিয়াছেন। ইহাঁরা যখন দেখিলেন শিষ্যগণের অন্ধ হইবার আর বাঁকি নাই, যখন দেখিলেন শিষ্যগণ অটল বিশ্বাস সহকারে সমস্ত ঐশী মর্য্যাদা তাঁহাদিগকে অর্পণ করিতেছে, এবং যাহা কখন কল্পনা করেন নাই তাহা নির্ব্বিঘ্নে পাইতেছেন, তখন তাঁহারা আনন্দে আপনাদিগের ভাবি পতন ভুলিয়া গেলেন। সুতরাং ইহাঁদিগের স্বার্থ সাধনের উৎকৃষ্ট সুযোগ হইল। এই সুযোগে তাঁহারা পুরাতন হিন্দু শাস্ত্রের স্থান বিশেষের অর্থ পরিবর্ত্তন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং তন্ত্র নামক অভিনব ধর্ম্ম শাস্ত্রে সেই পরিবর্ত্তিত আদর্শ স্পষ্ট করিয়া আপনাদিগের মনোরথ সিদ্ধির উপায় প্রস্তুত করিলেন। আমরা একটী প্রমাণ উদ্ধৃত করিতেছি, তাহা দেখিলেই বুঝা যাইবে, উত্তর বংশীয় উপদেষ্টৃত্ব কেমন ধূর্ত্ততাপূর্ণ।

শ্রীমদ্ভাগবতে লিখিত আছে “আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ নাবমন্যেত কর্হিচিৎ। ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যা সূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ॥” ইহার অর্থ কি? ভগবান্ বলিয়াছেন, আমাকেই আচার্য্য বলিয়া জানিবে, মনুষ্য জ্ঞান করিয়া তাঁহাকে অবজ্ঞা করিবে না এবং অসূয়াও করিবে না। কেমনা গুরু সর্ব্বদেব ময়। ইহার প্রকৃত ভাব কি? সরল ভাবে ইহা হইতে কি ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়? গুরু যে সকল কার্য্য করেন ও যে সকল বাক্য বলেন তাহা তাঁহার নিজের নহে, তাহা ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ। তিনি ঈশ্বর হইতে যাহা প্রাপ্ত হন তাহা অবিকৃত রাখিয়া জগতে প্রকাশ করেন। তাহাতে তাঁহার নিজের বিন্দুমাত্রও কর্ত্তৃত্ব নাই, স্বার্থ নাই। সুতরাং গুরুর কার্য্য, গুরুর বাক্য সকলই ঈশ্বরের, সকলই দিব্য ভাবে পূর্ণ। অতএব ইহা বলা যায় যে গুরু যদিও মানুষ তথাপি তাঁহাকে অবজ্ঞা কর্ত্তব্য নহে; তাঁহার গুণে দোষ দৃষ্টি কর্ত্তব্য নহে। কেমনা গুরুর কথা ও কার্য্য সকলই ঈশ্বরের, সর্ব্বপ্রকারে তাহা দিব্য ভাবের আধার। কিন্তু অধস্তন আচার্য্যবংশীয়গণ এই সুযোগে তন্ত্র শাস্ত্রে লিখিলেন, গুরু আর ঈশ্বর এক, পূজা ও ভক্তি যাহা কিছু সকলই গুরুকে কর। গুরু গৃহে উপস্থিত থাকিতে ঈশ্বরকে পৃথক্ করিয়া পূজা করা অপরাধ, অতএব তাহা কর্ত্তব্য নহে। পূজা ভক্তি সকলই গুরুচরণে অর্পণ কর। গুরু সন্তুষ্ট থাকিলেই

হইল। দেবতার সন্তুষ্টি অসন্তুষ্টির দিকে শিষ্যের না তাকাইলেও ক্ষতি নাই, গুরুর সন্তুষ্টি নিতান্তই চাই, উহা না হইলেই চলিবে না। এই সকল ঘৃণ্য মত বহুলপরিমাণে প্রচারিত হইলে আচার্য্যগণের উত্তর বংশীয়েরা অলস, বিলাসপ্রিয়, শ্রমবিমুখ, নির্দ্দয় ও স্বার্থপর হইতে লাগিল। এই জন্য ক্রমে তাহারা অর্থলোভী, ঈশ্বরদ্রোহী, ভদ্রতাবর্জ্জিত হইয়া উঠিল। এখন দুই এক জন ব্যতীত আর কেহ বিদ্যা শিক্ষা আবশ্যক মনে করেন না। যাঁহারা কিছু শিক্ষা করেন, তাঁহাদিগের মূল উদ্দেশ্য অর্থোপার্জ্জন। ছল বল ও কৌশল ক্রমে অতি সুবিধায় অর্থ পাইবেন এই জন্য তাঁহাদিগের বিদ্যা শিক্ষা। শাস্ত্রমতে এ সকল গুরু একান্ত পরিত্যাজ্য *। এমন কি, একবার মন্ত্র গৃহীত হইয়া থাকিলেও উপযুক্ত লক্ষণ সম্পন্ন গুরু প্রাপ্ত হইলেই ইহাঁদিগকে পরিত্যাগ করিবার বিধি আছে †। ঈদৃশলোক গুরু হইলে কেবল অনিষ্ট হয়, সুতরাং আজীবন যদি বিনা গুরুতে কাটাইতে হয় তাহাও ভাল, তথাপি অভদ্রতার অভিনেতাকে গুরু বা আচার্য্য বলিয়া স্বীকার কর্ত্তব্য নহে।

---

* পরিচর্য্যাযশোবিত্তলিপ্সুঃ শিষ্যাদ্ গুরুর্নহি।

† তদেতৎ পরমার্থগুর্ব্বাশ্রয়ো ব্যবহারিকগুর্ব্বাদিপরিত্যাগেনাপি কর্ত্তব্য ইত্যাশয়েনাহ, "গুরুর্ন স স্যাৎ স্বজনো ন স স্যাৎ" ইত্যাদি। ভক্তিসন্দর্ভে।

যিনি উদার, যিনি তপস্যা নিরত, যিনি সত্যপরায়ণ ও দয়াশীল, যিনি কায়মনোবাক্যে ঈশ্বরের প্রভুত্ব জগতে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য প্রতিজ্ঞারূঢ়, যিনি আপনাকে সর্ব্বতোভাবে গুপ্ত রাখিয়া ঈশ্বরকে প্রকাশ করেন, যিনি লোকের পাপ দর্শন করিয়া কৃপাপরবশ* হইয়া প্রাণ দিয়া তাহার পাপ দূর করিতে যত্ন করেন, তিনিই ভক্তিভাজন আচার্য্য, তিনিই উপদেষ্টা। তাঁহাকে সেই পরিমাণে ভক্তি কর, তাঁহাকে সেই পরিমাণে শ্রদ্ধা কর, যে পরিমাণে তিনি তোমার ঈশ্বর দর্শনের সহায়। যিনি ঈশ্বরলাভের পথের বিঘ্নপ্রদর্শন দূরে থাকুক প্রত্যুত আপনিই বিঘ্নস্বরূপ হইয়া মধ্যস্থলে উদিত হন, তিনি চোর মনুষ্যত্ববিহীন পশু।

---

* কৃপালুশ্চ সুসম্পন্নঃ সর্ব্বসত্ত্বোপকারকঃ।

অষ্টম অধ্যায়।

ধর্ম্ম।

মানবধর্ম্ম কি? এ প্রশ্ন অদ্যকার নহে। যখন মানব জাতির সৃষ্টি হইয়াছে, যখন বুদ্ধিজীবী মনুষ্যগণ ধর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়াছে, তখন হইতে এই প্রশ্ন চলিয়া আসিয়াছে, অদ্যাপি চলিতেছে। অনেক জ্ঞানিগণ ইহা লইয়া চিন্তা করিয়াছেন আজও করিতেছেন। অনেকে কেবল এই প্রশ্নের সিদ্ধান্ত কবিার জন্য সমস্ত আয়ু নিঃশেষ করিয়াছেন। অনেকে অনেক রূপ সিদ্ধান্তেও উপনীত হইয়াছেন, তথাপি এ প্রশ্ন চলিতেছে কেন? মনুষ্যের রুচি ও বুদ্ধির বৈষম্য প্রযুক্ত ঐ সকল সিদ্ধান্তে নানা বৈষম্যদোষ প্রবেশ করিয়াছে; কালে ধর্ম্মের প্রকৃত ভাব প্রচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। এখন কেবল কতকগুলি ভ্রান্তিসঙ্কুল আচার ও কুসংস্কার ধর্ম্মের নামে পূজিত হইতেছে। সুতরাং মানব ধর্ম্ম কি? ঐ প্রশ্নের বিরাম নাই।

এখন "ধর্ম্ম" এই শব্দটী উচ্চারণ করিলে আমাদিগের মনের গতি কতগুলি গ্রন্থ ও আচারের উপর সংক্রমিত হয়। সুতরাং প্রকৃত ধর্ম্ম যাহা, তাহা মনুষ্যসমাজ পরিত্যাগ করিয়া অনেক দূরে অবস্থান করিতেছে। যদি মনো-

যোগ দিয়া চিন্তা করা যায়, যদি সেই আদিম কাল হইতে ইহার পরিবর্ত্তনের বিষয় এক একটী করিয়া পাঠ করা যায়, তাহা হইলে বুঝা যাইবে, মানবধর্ম্মে বৈষম্য-দোষ এক মুহূর্ত্তও তিষ্ঠিতে পারে না। অথচ মনুষ্যের রুচির অনুরোধে তাহাতে পুনঃ পুনঃ বৈষম্যদোষ প্রবেশ করে, সুতরাং পুর্ব্বোক্ত প্রশ্নও বিরাম পাইতে পারে না। যদি ভাবি, মনুষ্য ধর্ম্ম সাধন করে কেন? মানব জাতি তৃষ্ণাতুর পথিকের ন্যায় ধর্ম্মের জন্য লালায়িত হয় কেন? তবে দেখিতে পাইব ধর্ম্ম মনুষ্যের প্রকৃতি, প্রকৃতি ছাড়িয়া কেহ থাকিতে পারে না এইজন্য মনুষ্য ধর্ম্ম সাধন করে। দয়া একটী প্রাকৃতিক বিষয়। এজন্য যে ব্যক্তি চিরকাল পর শোণিত শোষণ করিতে নিযুক্ত, যে ব্যক্তি চিরকাল পরের সর্ব্বস্বশোষণে তৎপর, সেও দয়ালু ব্যক্তির প্রশংসা করে এবং দয়ার কার্য্য দেখিলে সন্তোষ প্রকাশ করে। জিতেন্দ্রিয়তা প্রাকৃতিক, ব্যভিচার অপ্রাকৃতিক। যে পরদারনিরত পাপিষ্ঠ চিরকাল আপনার ও অন্যের কুল কলঙ্কিত করিয়া আসিতেছে, সেও জিতেন্দ্রিয় সাধুর প্রতি শ্রদ্ধা দান না করিয়া থাকিতে পারে না। সত্য-প্রাকৃতিক, অসত্য অপ্রাকৃতিক। যে আজীবন অসত্য কথন ও অসত্য ব্যবহার দ্বারা সমাজের কণ্টকস্বরূপ হইয়া আছে, সেও সত্যপরায়ণ উদার ব্যক্তির প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করে, এবং নিজে কদর্য্যচর্য্য হইয়াও অপরকে

তাদৃশ বীভৎসাচারী দেখিলে বিরক্ত হয়, উক্ততা প্রকাশ করে, নিন্দা তিরস্কারাদি করিতেও পরাঙ্মুখ হয় না। ধর্ম্ম যে প্রাকৃতিক নাস্তিকদিগের বিষয় আলোচনা করিলে তাহার আরও সুদৃঢ় প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। কি স্বদেশ কি বিদেশ সর্ব্বত্রই অত্যল্প সংখ্যক নাস্তিক দৃষ্ট হয়। কিন্তু সকল দেশায় নাস্তিকগণ ধর্ম্ম মত খণ্ডনের জন্য বহু সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছেন। তাঁহারা ইচ্ছাপূর্ব্বক ধর্ম্মমত অস্বীকার করিয়াছেন, আবার অনিচ্ছাপূর্ব্বক অলক্ষিত ভাবে উহা স্বীকার করিয়াছেন, এবং অজ্ঞাতসারে ধর্ম্মমতপোষক কথাও অনেক স্থলে বলিয়াছেন। বস্তুতঃ মনুষ্যহৃদয়ের প্রধান উপাদান ধর্ম্ম। এজন্য হৃদয় কখন ধর্ম্মশূন্য থাকিতে পারে না? সহস্র অনৈসর্গিক আবরণে আবৃত করিলেও তাহা আবৃত থাকে না। মনুষ্য অস্বীকার করিলেও ধর্ম্ম মনুষ্যকে অস্বীকার করে না। মনুষ্য ছাড়িতে চাহিলেও ধর্ম্ম মনুষ্যকে ছাড়ে না কেন? ধর্ম্ম প্রাকৃতিক। প্রকৃতি পরিত্যাগ করিলে লোক বাঁচিতে পারে না, প্রকৃতির বিপরীত ব্যবহারে সংসারে অশেষবিধ অনিষ্টের সৃষ্টি হয়। সেই অনিষ্ট নিবারিত রাখিয়া অব্যাহত সুখ ও শান্তি উপভোগ করিবার জন্যই লোকে ধর্ম্ম সাধন করে। এই অক্ষুণ্ণ সুখশান্তিভোগের বাসনা এক জন কি দুই জনের নহে, সমস্ত মনুষ্য জাতিই এই এক মাত্র সুখ ও শান্তির জন্য লালায়িত। যদি

ইহা নিশ্চয় হইল যে সমস্ত মনুষ্যজাতিই অব্যাহত সুখ ও সুবিমল শান্তির জন্য ধর্ম্মসাধন করে, তবে ইহাও নিশ্চয় যে ধর্ম্মমতে এক বিন্দুও বৈষম্য দোষ থাকিতে পারে না। বস্তুতঃ যখন উদ্দেশ্য এক, তখন কার্য্য পৃথক্ হওয়া নিতান্ত অসম্ভব। প্রকৃতি কখন মূলবিষয়ে পৃথক্ হইতে পারে না, কিন্তু বিকৃতি পৃথক্ হইতে পারে। স্বভাব বিকৃত হইলে নানা রূপ প্রাপ্ত হয়, প্রকৃতি চিরকাল একই রূপ থাকে। স্বর্ণ রৌপ্যাদি ধাতু এবং অগ্নি বায়ু জল দুগ্ধ প্রভৃতি ভৌতিক পদার্থ যখন প্রকৃতিতে অবস্থান করে তখন একই রূপ, আবার বিকৃতাবস্থায় ইহার রূপের অন্ত নাই, মনুষ্যের প্রকৃতিও সেই রূপ একই রূপ কিন্তু বিকৃতিতে নানা রূপ। ঈশ্বর যেমন এক, বহু নন; ধর্ম্মও তেমনি বহু নয়। মনুষ্যের বিকৃত ভাব হইতেই নানাবিধ উপধর্ম্মের উৎপত্তি হইয়াছে। পূর্ব্ব কথিত পুস্তক ও আচার ব্যবহার এই বিকৃতি লতার ফল *। সমস্ত পুস্তক এবং আচারই বিকৃতির ফল নহে, তাহাতে অনেক প্রকৃতির ফলও আছে। কিন্তু এই

* অপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদোহথর্ব্ববেদঃ
শিক্ষা কল্পো নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষ মিতি শ্রুতিঃ।
তর্কো২প্রতিষ্ঠঃ শ্রুতয়োঃ বিভিন্না
নাসৌ মুনি র্যস্য মতং প্রমাণং।
ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং
মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা॥ মহাভারতম্।

সকল প্রকৃতিজাত ফল এত মিশ্র ভাবাপন্ন যে তাহা পৃথক্ করিয়া বাহির করা প্রজ্ঞালোক ভিন্ন দুঃসাধ্য। সেই সকল ধর্ম্মগ্রন্থ মধ্যে এ দেশে বেদ, উপনিষদ্, তন্ত্র ও পুরাণ, অন্যান্য দেশে বাইবেল ও কোরাণ প্রভৃতিই প্রধান। কি স্বদেশীয় কি বিদেশীয়, এই সকল গ্রন্থ প্রণেতা-দিগের মধ্যে সুরুচি ও কুরুচি অথবা প্রকৃতি বিকৃতির অসদ্ভাব নাই। তবে কোথাও অধিক কোথাও অল্প এই মাত্র প্রভেদ। এস্থলে আমাদিগের দেশীয় ঋষিগণের একটী সরল ও সুন্দর পরিষ্কৃত সিদ্ধান্ত পাঠকগণের নিকট উপস্থিত করা যাইতেছে, বোধ হয় ইহা পাঠ করিলে সকলেই বিমুগ্ধ হইবেন।

ধর্ম্মো মহান্ নির্ব্বিকল্পো বিমুক্তশ্চ বিমানবৎ।
ধর্ম্মঃ সনাতনো নিত্যো ধর্ম্মঃ সত্যং নিরাময়ঃ॥

যাহা শ্রেষ্ঠ, নির্ব্বিকল্প আকাশের ন্যায় বিমুক্ত অর্থাৎ সকল নরনারীতে সমান ভাবে প্রতিষ্ঠিত, নিত্য সত্য, এবং নির্দ্দোষ তাহাই ধর্ম্ম। এই কথাটী অতি সরল, অতি মধুর, এবং অতি সারগর্ভ। চিন্তা করিলে, মানবধর্ম্মের সমস্ত ভাবই ইহার মধ্যে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

প্রথমতঃ ধর্ম্ম বিমুক্ত ও সর্ব্বলোকচর।—আকাশ যেমন ব্যাপক অথচ বিমুক্ত, কিছুতেই বদ্ধ হইয়া থাকে না, সেই রূপ ধর্ম্মও কোন একটী মনুষ্যে বদ্ধ থাকিতে পারে না, উহা সকল মনুষ্যেতেই প্রতিষ্ঠিত। আকাশ অতিক্রম করি-

বার যেমন কাহারও সাধ্য নাই, সেই রূপ ধর্ম্মকেও কেহ অতিক্রম করিতে সমর্থ নহে। পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে, নাস্তিকগণ বহু আয়াস স্বীকার করিয়াও ধর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারেন নাই; পাপিগণ যতই কেন পাপী হউক না বাহ্য আবরণ উম্মোচিত হইলে আর পাপ করিতে সাহস পায় নাই, ইহা সর্ব্বদেশে ও সর্ব্ব কালে বিশ্রুত।

দ্বিতীয়তঃ ধর্ম্ম নির্ব্বিকল্প।—যাহাতে বিকল্পনা নাই তাহা নির্ব্বিকল্প। বিকল্পনা কি?—ব্যভিচার। যাহা এ দেশে এক রূপ, দেশান্তরে অন্য রূপ। যাহা পৃথক্ পৃথক্ মনুষ্যে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে অবস্থান করে, যাহা পূর্ব্ব কালে এক রূপ ছিল, বর্ত্তমান কালে অন্য রূপ হইয়াছে, ভবিষ্যতে আর একরূপ হইবে, তাহাই বিকল্পিত, তাহাই ব্যভিচারসম্ভূত, তাহা ধর্ম্ম নহে। যাহা মনুষ্যের বিকৃত বুদ্ধিতে পড়িয়াও অবিকৃত থাকে, যাহা নাস্তিক পশুদিগের তীক্ষ্ণ দন্তে পুনঃ পুনঃ চর্ব্বিত হইয়াও অক্ষত রহিয়াছে এবং থাকিবে, কবিদিগের প্রবল কল্পনাশক্তিও যাহার নিকটে পরাজয় স্বীকার করে, যাহা কোন কারণে রূপান্তর ও ভাবান্তর প্রাপ্ত হয় না, তাহাই নির্ব্বিকল্প. ধর্ম্ম। যাহা মনুষ্যের কল্পনা শক্তিদ্বারা পরিচালিত হইয়া সমাজে নানা অমঙ্গল আনয়ন করে তাহা ধর্ম্ম নামের অযোগ্য।

তৃতীয়তঃ ধর্ম্ম নিত্য।—নিত্য কি? কোন্ বস্তু নিত্য শব্দের বাচ্য হইতে পারে? যাহার উৎপত্তি ও বিনাশ নাই, তাহাই নিত্য। যাহা পূর্ব্বেও ছিল এখনও আছে, পরেও থাকিবে, তাহাই নিত্য তাহাই ধর্ম্ম। এ স্থলে আপত্তি আসিতে পারে, যখন মনুষ্য ছিল না তখন ধর্ম্মের প্রয়োজন ছিল না। যখন প্রয়োজন ও আধার কিছুই ছিল না, তখন ধর্ম্ম ছিল কি রূপে? চিন্তা কর আলোচনা কর, দেখিবে তখনও ধর্ম্ম থাকিবার স্থান ছিল। গুরু ভক্তি পিতৃ ভক্তি কোথায় থাকে? আপাততঃ দেখিতে বোধ হয় শিষ্য এবং পুত্র কন্যাতেই ঐ বৃত্তি অবস্থান করে, কিন্তু যখন শিষ্য ছিল না পুত্র কন্যাদি ছিল না, তখনও গুরুর সেই মহত্ত্ব পিতার সেই স্নেহ মমতা ও পালনী শক্তি বিদ্যমান ছিল, যাহা হইতে শিষ্য ও পুত্র কন্যাগণ পরে ভক্তিমান্ হইয়াছে। শিষ্য ও পুত্র কন্যাগণ জন্মিলে সেই ভাব প্রস্ফুটিত হইল, সেই বৃত্তি কার্য্য করিবার স্থান পাইল অথবা কার্য্য করিল এই মাত্র। এই রূপ যখন মনুষ্যরূপ ধর্ম্মাধার ছিল না, তখনও যে সমুদায়ের প্রতি দৃষ্টি করিয়া মনুষ্য ধর্ম্ম সাধন করে, যাহা অবলম্বন করিয়া ধর্ম্ম ভাব উদ্ভূত হয়, যাহার সঙ্গে ভক্তি প্রেমাদির অবশ্যম্ভাবী সম্বন্ধ, সেই অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত দয়া, অনন্ত প্রেম ও অপ্রমেয় মহত্ত্ব ঈশ্বরেতে ছিল। মনুষ্য জন্মিলে অনুরূপ বৃত্তি বিস্ফুরিত হইয়া তদবলম্বনে মনুষ্যকে ধর্ম্মের জন্য উত্তেজিত করিল মাত্র। আবারও

যদি ঈশ্বরের ইচ্ছায় কখন মনুষ্য না থাকে, তখনও ধর্ম্ম সেই ঈশ্বরেতেই অবস্থিত থাকিবে।

নিত্য বলিতে আরও বুঝায়। যাহা অগ্নিতে দগ্ধ হয় না—জলে পচিয়া জীর্ণ হয় না—বায়ুতে বিশুষ্ক হইয়া উড়িয়া যায় না—যাহা অস্ত্রাদি দ্বারা ছিন্ন হয় না—যাহাতে কীটের ভয় নাই তাহাই নিত্য। অগ্নি রাশি রাশি পার্থিব বস্তু ভস্মসাৎ করে, জলে সকল বস্তুই জীর্ণ হইয়া যায়, কীট কত পুঞ্জ পুঞ্জ উৎকৃষ্ট বস্তু কাটিয়া বিনাশ করিয়া ফেলে। ধর্ম্ম আধ্যাত্মিক বিষয়, জড়ের বিপরিণাম উহাতে সর্ব্বথা অসম্ভব। মহর্ষিগণ ধর্ম্মের এই লক্ষণ করিয়া বেদ পুরাণাদি দেশীয় ধর্ম্মশাস্ত্রের ও বাইবল কোরাণাদি বিদেশীয় ধর্ম্মশাস্ত্রের অযথাশাসন হইতে, ধর্ম্মকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। যে সকল ক্ষুদ্র বুদ্ধি তাহা বুঝিতে পারে না তাহারা নানা কাল্পনিকতা আনিয়া উপস্থিত করে। ধর্ম্মের এই লক্ষণটীর প্রতি প্রায় সকল দেশীয় ধর্ম্মশাস্ত্র ব্যবসায়িগণেরই দৃষ্টি পড়িয়াছিল। কেননা তাঁহারা প্রাণপণে আপনি আপন দেশীয় ধর্ম্মশাস্ত্রের শাসন অব্যাহত রাখিবার জন্য তাহার অপৌরুষেয়তা প্রতিপন্ন করিবার যত্ন পাইয়াছেন; কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। যাহা বস্তুতঃ অপৌরুষেয় নহে, যত্ন করিয়া কদাচ তাহার অপৌরুষেয়তা প্রতিপাদন করা যায় না। ঐ সকল ধর্ম্মশাস্ত্র যে অপৌরুষেয় নহে পর-

স্পর বিরুদ্ধভাষী ধর্ম্মব্যবসায়িগণের বক্তৃই তাহার অকাট্য প্রমাণ।

আবার দেখ যাহা ধাতুপ্রত্যয় কিম্বা লিঙ্গ প্রত্যয় সাধিত হইয়া অর্থ প্রকাশ করে, তাহাকে ভাষা বলে। ব্যবহার ভাষার প্রযোজক, ব্যবহার পরিবর্ত্তনে ভাষার পরিবর্ত্তিত হইয়া অর্থ বোধের ব্যতিক্রম ঘটে। এক সময়ের ভাষা অন্য সময়ের লোকের নিকটে অবুদ্ধ দেব ভাষা হইয়া যায়। সুতরাং ঐ সকল ভাষাতে যে সকল গ্রন্থ লেখা হইয়াছে তাহা নিত্য হইবে কিরূপে? বেদ পুরাণ ও বাইবেল কোরাণাদি জলে পচিতে পারে, অগ্নিতে দগ্ধ হইতে পারে, অস্ত্রাদি দ্বারা ছিন্ন হইতে পারে, কীটে কাটিয়া বিনাশ করিতে পারে, মনুষ্য অন্তরের বিস্মৃতির ভয় আছে, বুদ্ধির তারতম্যে অর্থ বোধের তারতম্য আছে, এবং আরও নানাবিধ প্রাকৃতিক ঘটনাতে বিনষ্ট হইতে পারে কিন্তু নিত্য ধর্ম্মের প্রতি এ সকল কিছুরই দৌরাত্ম্য কার্য্যকর হইতে পারে না।

চতুর্থতঃ ধর্ম্ম সত্য।—সত্য কি? যাহা যথার্থ বা বিদ্যমান, তাহাকেই সত্য বলা যায়। যথার্থ কি? যাহাতে এক বিন্দুও মিথ্যার যোগ নাই। যাহার সত্যতা পরীক্ষা করিয়া বুঝিতে হয়, যাহা সত্য কি না বুঝিবার জন্য প্রমাণ সংগ্রহ করিতে হয়, তাহা সত্য নহে, তাহা ধর্ম্ম নহে। যাহা স্বতঃসিদ্ধ ভাবে মনুষ্যহৃদয় বিশ্বাস

করে, তাহাই সত্য। প্রমাণ থাকুক আর না থাকুক, পরীক্ষায় স্থির রাখিতে পারি আর না পারি, যাহা সত্য তাহা চিরকাল থাকিবেক। সহস্র বার তর্কে পরাজিত হইলেও হৃদয় যাহা অবিশ্বাস করিতে চায় না তাহাই সত্য। সত্যের অন্য অর্থ বিদ্যমান। বিদ্যমান বলিলে শুদ্ধ অদ্যকার জন্য বুঝায় না, গত দিন ও যে দিন আসিতেছে তাহারও জন্য বুঝিতে হইবে। এ দেশে বিদ্যমান, অন্য দেশে নহে, ইহাও বুঝিবার উপায় নাই। কারণ উহাতে বিশুদ্ধ বিদ্যমানমাত্র বুঝাইতেছে, উহাতে দেশকালমূলক কোন অধিকরণ নাই। সুতরাং কোন সঙ্কীর্ণ বস্তু, যাহা এ দেশে আছে অন্য দেশে নাই, তাহা সত্য নহে। যাহা অদ্য আছে কল্য থাকিবেক না অথবা পূর্ব্বে ছিল এখন নাই, এমন বস্তুও সত্য নহে। যাহা পূর্ব্বে ছিল এখনও আছে পরেও থাকিবে, যাহা এ দেশে আছে অন্য দেশেও আছে, তাহাই সত্য, তাহাই ধর্ম্ম। এই সকল প্রমাণ দ্বারাও ধর্ম্ম পুস্তকে বদ্ধ নহে প্রমাণ হইতেছে। কারণ এমন পুঞ্জ পুঞ্জ পুস্তক পূর্ব্বে ছিল যাহা এখন নাই, আবার এমন রাশি রাশি পুস্তক এখন আছে যাহা পূর্ব্বে ছিল না, আবার হয়ত এমনও হইতে পারে, এখন যে সকল পুস্তক আছে কালে তাহা থাকিবেক না। কিন্তু ধর্ম্ম পূর্ব্বেও ছিল এখনও আছে পরেও থাকিবেক। কাল সম্বন্ধে যাহা বলা গেল, দেশ সম্বন্ধেও ঠিক সেইরূপ

বলা যায়। এ দেশে যে সকল পুস্তকের শাসন সমাদৃত অন্য দেশে তাহা সমাদৃত নহে, অন্য দেশের শাসনও এ দেশে মান্য হয় না। অতএব কোনরূপেই পুস্তকাদির বিমুক্ততা, নির্ব্বিকল্পতা নিত্যতা ও সত্যতা রক্ষা করা যায় না। আবার চিন্তা করিলে ইহাও বুঝা যাইবে যে বেদ পুরাণ বা বাইবল কোরাণাদিতে লিখিত আছে বলিয়া ধর্ম্ম মান্য নহে। এই সকল পুস্তক থাকিলেও ধর্ম্ম আছে, না থাকিলেও ধর্ম্ম আছে ও থাকিবে। যখন বেদ পুরাণ বা বাইবল কোরাণাদি ছিল না, তখনও ধর্ম্ম ছিল, আবারকালে যদি না থাকে তবু ধর্ম্ম থাকিবে। বেদ পুরাণাদি হইতে ধর্ম্ম উদ্ভূত হয় নাই, বেদ পুরাণাদি ধর্ম্মের উৎপত্তি স্থান নহে। ধর্ম্ম আছে বলিয়া ধর্ম্ম নিত্য ও সত্য-বলিয়া বেদ পুরাণাদি হইয়াছে। ধর্ম্ম মনুষ্য হৃদয়ের যদি স্বাভাবিক বিশ্বাসের বিষয় না হইত, পুস্তকের প্রতিপাদ্য বিষয় সত্য কে বলিয়া দিত? অতএব ধর্ম্মই বেদ পুরাণ প্রভৃতির প্রমাণ, বেদ পুরাণ প্রভৃতি ধর্ম্মের প্রমাণ নহে। পুস্তক পড়িয়া ধর্ম্ম শিক্ষা করা ঈশ্বরের অভিপ্রেত নহে। যদি পুস্তক পড়িয়া ধর্ম্ম শিক্ষা করা নিতান্ত প্রয়োজনীয় হইত, তবে মনুষ্য জন্মের সঙ্গে সঙ্গে এক একখানি পুস্তক প্রাপ্ত হইত, এবং বিনা অধ্যয়নে তাহা বুঝিতে পারিত, অধ্যাপকের প্রয়োজন থাকিত না। আবার ভাষাভেদে, প্রণালীভেদে, দেশভেদে উহা বিভিন্ন

রূপ প্রাপ্ত হইত না। যখন দেখিতে পাই মনুষ্যগণ আপন আপন রুচি ও ভাষার অনুরোধে ধর্ম্মে নানা বিভিন্নতা আনয়ন করিয়াছে, তখন সেই সকল ধর্ম্মশাস্ত্র মানবজাতির কপোলকল্পিত না হইয়া পারে না। সুতরাং সহস্র চেষ্টা করিলেও উহাকে অনিত্যতা হইতে রক্ষা করা যায় না। ঈশ্বরের এমন কোন ভাষা নাই, যাহা নানা স্থানে নানা রূপ ধারণ করিতে পারে, কিন্তু ঈশ্বর এমন কৌশলময় ভাষা ব্যবহার করেন, যাহাতে শব্দ নাই, অক্ষর নাই, অথচ সকল দেশীয় নরনারী বিনা ক্লেশে তাঁহা বুঝিতে পারে। যখন দেখিতেছি এক দেশীয় ভাষা অন্য দেশীয় নরনারী বুঝিতে পারে না, যখন দেখিতেছি হিব্রু বা গ্রীক না শিখিলে বাইবুল বুঝা যায় না, আরবীয় না শিখিলে কোরাণ বুঝা যায় না, সংস্কৃত না শিখিলে বেদ পুরাণাদি বুঝা যায় না, তখন এই সকল পুস্তক নিহিত বিষয়কে প্রাকৃতিক ধর্ম্ম বা নিত্য ধর্ম্ম বলিয়া কোন রূপেই স্বীকার করা যায় না। শুদ্ধ পড়িলেও যে কিছু হয় না ইহার প্রমাণেরও অভাব নাই। সর্ব্বদাই দেখিতে পাওয়া যায়, যাঁহারা এই সকল পুস্তকের শাসন মান্য করেন, যাঁহারা এই সকল গ্রন্থ লিখিত মন্ত্র পাঠ করিয়া ধর্ম্মযাজন করেন, তাঁহারা সেই সকল মন্ত্রাদির অর্থ কি জানেন না, জানিলেও প্রবৃত্তি ও বুদ্ধি অনুসারে এক এক জন এক এক প্রকার অর্থ পরিগ্রহণ করেন। আমাদিগের দেশীয় বেদ-

বর্জ্জিত ব্রাহ্মণগণ প্রতিদিন ত্রিসন্ধ্যা যে গায়িত্রী মাত্র পাঠ করেন, দুই এক জন পণ্ডিত ব্যতীত কেহই তাহার অর্থ জানেন না। কোরাণের যে অংশ মুসলমানগণের দৈনিক পাঁচ বারের পাঠ্য, অধিকাংশ মুসলমান তাহার ভিতরের ভাব বুঝেন না, কেবল শুকপক্ষীর মত শিক্ষিত কথা কটী পাঠ করিয়া থাকেন। এই সকল গ্রন্থ যদি অপৌরুষেয় হইত, তবে তাহা শব্দ ও অক্ষর বর্জ্জিত ঐশী ভাষায় হইত, কোন দেশীয়ের পক্ষে দুর্ব্বোধ্য হইত না। শব্দ ও অক্ষর বর্জ্জিত লিপি অসম্ভব, অপৌরুষেয় গ্রন্থও সুতরাং অসম্ভব। অতএব ইহা বলিতে পারা যায় যে ঐ সকল ধর্ম্মগ্রন্থের যখন পরস্পরে মতের মিল নাই, যখন নানা কারণে তাহার নশ্বরতা প্রতিপন্ন হইতেছে, উহা শিক্ষা করা নিজের ও অপরের বহু আয়াসের প্রতি নির্ভর করে, তখন ঐ সকল গ্রন্থকে কোন ক্রমেই অপৌরুষেয় বা নিত্য বলা যায় না। তবে সাধকেরা যাহা হৃদয়ে প্রত্যাদেশ রূপে লাভ করিয়াছেন তাহা ঐ সকল গ্রন্থে আছে এবং মনুষ্য ভ্রমসঙ্কুল এ জন্য তাঁহাদিগের ভ্রমও তৎসহ মিশ্রিত হইয়া আছে, এই মাত্র বলিতে পারা যায়।

পাঠক! মনে মনে বিরক্ত হইতেছ? তুমি ভাবিতেছ, আমি পূর্ব্বতন আচার্য্যগণের নিকট অকৃতজ্ঞ বলিয়া পরিচিত হইতেছি, তাহা নহে। তুমি ভাবিয়া দেখ, আমি তাঁহাদিগের সম্মান অপনয়ন করিতে চেষ্টা করি নাই।

আমি কেবল এই মাত্র বলিতেছি, ভাই সকল! ভগিনী সকল! অন্ধ অনুরাগ পরিত্যাগ কর। সরল ভাবে জ্ঞান আলোচনা কর। সত্য যাহা গ্রহণ কর। কিছুরই প্রতি অন্ধ অনুরাগ স্থাপন করিও না। মনুষ্য অন্ধ নহে, মনুষ্য চক্ষুষ্মান্ জীব। তাহার ভাল মন্দ বিবেচনা করিবার অধি-কার আছে সুতরাং অন্ধ ভাবে পরানুবর্ত্তন করা সঙ্গত নহে। পূর্ব্বতন আচার্য্যগণ যে আমাদিগের উপকার করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা যে আমাদিগের জন্য নিজের শরীরের শোণিত চিন্তা করিয়া শোষণ করিয়াছেন, আমি অবনত মস্তকে তাহা স্বীকার করিতেছি। তাঁহারা যদি তাদৃশ চেষ্টা না করিতেন, তবে আজ আমরা এত আশাতীত উচ্চ স্থানে আসিতে সমর্থ হইতাম না। অতএব পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মগ্রন্থ সকল আদর করিয়া, পূর্ব্বপুরুষ গণের উপার্জ্জিত ধন বলিয়া, পাঠ কর। সত্য পাও প্রণত মস্তকে ভোগ কর। সত্য পাইলে অবহেলা করিও না। কিন্তু আমার এই মিনতি জ্ঞান থাকিতে কেহ অন্ধানুরাগ প্রকাশ করিও না।

পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা দ্বারা সুন্দর প্রমাণ হইয়াছে যে ধর্ম্মে মতবৈষম্য থাকিতে পারে না, এবং ধর্ম্ম, যাহা তাহাতে সকল নর নারীর তুল্যাধিকার, ইহার এক বিন্দুও অন্যথা হইতে পারে না। কি হিন্দু, কি বৌদ্ধ, কি খৃষ্টান, কি মুসলমান সত্য ধর্ম্মে সকলেই তুল্য রূপে

অধিকারী। যাহা অসত্য, তাহাতে সকলের অধিকার না থাকিতে পারে কিন্তু সত্য ধর্ম্ম হইতে কেহই বঞ্চিত থাকিতে পারে না। অতএব হিন্দু মুসলমান ও বৌদ্ধ খৃষ্টান ভাই সকল! একত্র হও, অন্ধানুরাগ পরিত্যাগ কর। তোমরা সংসারে নানা ভাগে বিভক্ত হইয়া কার্য্য করিতে পার কিন্তু ধর্ম্মসম্বন্ধে আর অনৈক্য রাখিও না। সকল অনৈক্য চূর্ণ করিয়া এস, আমরা এক পিতার পরিবার ভুক্ত হই। দেখ সংসারে যাঁহারা অনেক ভাই এক পিতার শাসন মান্য করিয়া চলেন এবং এক পরিবার ভুক্ত থাকিয়া রোগে, শোকে, স্বস্থতা অস্বস্থতায় সর্ব্বদা পরস্পর পরস্পরের সাহায্য করেন, তাঁহারা কেমন প্রশংসিত, কেমন সুখী বলিয়া কীর্ত্তিত ও বিশ্রুত হইতেছেন? সেই রূপ যদি আমরা পরম পিতার পরিবার ভুক্ত হইয়া সমস্ত ভ্রাতা ভগিনীর সহিত মিলিত হই, এবং সেই এক মাত্র আশ্রয় দাতার আজ্ঞায় তাঁহার সমস্ত পুত্রকন্যাদিগকে প্রাণের মত ভাল বাসি ও পাপ তাপ ও পুণ্য পবিত্রতায় পরস্পর পরস্পরের অনুকূল হইতে পারি, তবে আমাদিগের নিকটে দেবত্ব কোন্ ছার? আমাদিগের সুখের সীমা কোথায়?

পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে, তাহাতে কেবল ধর্ম্মের সাধারণ ভাব মাত্র বিবৃত হইয়াছে, কিন্তু স্বরূপ বিভাগের কথা কিছুই বলা যায় নাই। এখন ক্রমে সেই বিষয় বলিতে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে।

নবম অধ্যায়।

সত্যের সহিত মনুষ্যের সম্বন্ধ।

সত্যের সহিত মনুষ্যের কি সম্বন্ধ, সত্যের সঙ্গে তাহার কিরূপ উপযোগিতা আছে, তাহা নির্ব্বাচন করাই এ অধ্যায়ের উদ্দেশ্য। এটী নিশ্চয় করিতে হইলে অগ্রে কোন্ দিকে মনোনিবেশ করা উচিত? অগ্রে দেখা উচিত সত্যের সঙ্গে মনুষ্য ভিন্ন কোন জীবের সম্বন্ধ আছে কি না? যদি থাকে, তবে তাহার সহিত মনুষ্যজাতির সম্বন্ধের যে প্রভেদ, তাহা অগ্রে নির্দ্দেশ করিলেই মনোরথ সিদ্ধ হইতে পারে।

কিঞ্চিৎ প্রণিধান করিলেই জানা যাইবে, সত্যের সহিত ইতর জন্তুগণের সম্বন্ধ অতি অকিঞ্চিৎকর। উহা মানবজাতির সম্বন্ধের অনুরূপ কখন হইতে পারে না। ইতর জন্তুগণ সত্য কি নির্দ্দেশ করিতে অসমর্থ, সত্যের ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে অসমর্থ এবং সেই ভাব রক্ষা করিয়া কার্য্য করিতেও সম্পূর্ণ অসমর্থ। ইতর জন্তুগণ সত্য নির্ব্বাচন করিতে, সত্যভাব গ্রহণ করিতে, সত্যের অনুরূপ আচরণ করিতে পারে না। যদি সমস্ত পৃথিবীর জ্ঞানী মহাত্মাগণ একত্র হন, যদি নানাবিধ বৈজ্ঞানিক নীতি অবলম্বন করিয়া ইতর জন্তুগণকে শিক্ষা দিতে প্রবৃত্ত

ছন, তথাপি তাহাদিগকে “পরস্বাপহরণে” পাপ বুঝা-ইতে পারিবেন না, এবং অনিয়মিতরূপে স্ত্রীসম্ভোগাদি হইতে উপরত করিতেও সমর্থ হইবেন না। সুতরাং নিশ্চয় বোধ হইতেছে, তাহারা প্রকৃতির অধীন। প্রকৃতি যেরূপ বলিয়া দেয়, তাহারা ঠিক সেই রূপ চলে তাহার এক বিন্দুও অন্যথা করে না। এ জন্য সত্যের প্রতি তাহাদি-গের অধিকার বিস্তার হইতে পারে না। তবে সত্যের সহিত তাহাদিগের এই মাত্র সম্বন্ধ যে তাহারা সত্যকে আশ্রয় করিয়া আছে, মুল সত্য হইতেই তাহারাও উৎপন্ন হইয়াছে। সত্য ব্যতীত কোন বস্তুর অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। সত্য ছাড়া হইলে এই জগতের পরমাণু পুঞ্জ তৎক্ষণাৎ বিলুপ্ত হইয়া যায়। ইতর জন্তুগণের সত্যের সঙ্গে এই মাত্র সম্বন্ধ। কিন্তু মনুষ্যের সম্বন্ধে ইহা অন্যরূপ। এক পূর্ণ পুরুষ ভিন্ন আর সকলই অপূর্ণ। সুতরাং জগতের অভ্যন্তরে অসত্যও ওতপ্রোত ভাবে অবস্থান করি-তেছে। সত্য বুঝিতে হইলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে অসত্যকেও বুঝিতে হইবে। নতুবা অসত্য হইতে সত্য বাছিয়া বাহির করা যাইবে না। মনুষ্যগণ আপন ইচ্ছা ও শক্তি বলে এই জগৎ হইতে সত্য সকল বাহির করিতে পারেন। সৃষ্টিকাল হইতে এ পর্য্যন্ত যত প্রকার সত্য সাধারণের গোচরে সমানীত হইয়াছে, তাহা সমস্তই মনুষ্য জাতির যত্নের ফল। মনুষ্যগণ অসত্য হইতে সত্য পৃথক্ করিয়া

লইতে পারেন, অন্য কর্ত্তৃক সত্য ব্যাখ্যাত হইলে তাহা গ্রহণ করিতে পারেন, এবং আপনার জীবন সত্যের অনুরূপ করিয়া গঠন করিতেও পারেন। ইতর প্রাণিগণ এ বিষয়ে অক্ষম, ইহার প্রমাণের জন্য বৃথা আড়ম্বর করা নিষ্প্রয়োজন। কেননা এ কথা কেহ কোন দিন বলে নাই বা বলিবার সম্ভাবনা নাই যে ইতর প্রাণিগণ সত্যান্বেষণ করে বা কোন দিন সত্যান্বেষণ করিতে পারিবে। উহাদিগের একাবস্থায় অবস্থিতির ইহাই একমাত্র কারণ?

মনুষ্যগণ যেমন সত্য আবিষ্কৃত করিতে ও সত্য গ্রহণ করিতে পারে, আবার সেই রূপ সত্যকে অগ্রাহ্য করিতে সত্যের বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে সুতরাং সত্যকে অনাদর করিতেও পারে। ইহা মনুষ্যজাতির এক অমূল্য অধিকার। এই অমূল্য স্বাধীনতা কেবল মনুষ্যজাতিরই আছে অন্য কাহার নাই। জগৎপাতা মনুষ্যজাতিকে এই অধিকার প্রদান করিয়া অতি উচ্চ স্থানে স্থাপন করিয়াছেন। মনুস্যজাতি এই স্বাধীনতারূপ মহারত্ন প্রাপ্ত হইয়া সমস্ত জগতের উপর আধিপত্য স্থাপন করিতেছে। মনুষ্য জাতি ইচ্ছাপূর্ব্বক পাপের মস্তকে পদার্পণ করিয়া ঊর্দ্ধ মুখে উত্থিত হইবে, পাপের বীভৎসমূর্ত্তি স্পষ্টরূপে দেখিয়া তাহা হইতে দূরে অবস্থান করিবে এবং আপন ভাই বন্ধুদিগকেও সাবধান করিবে, ইহাই সৃষ্টি কর্ত্তার অভিপ্রায়। এই অভিপ্রায় অমান্য করিয়া স্বাধীনতার অপব্যবহার

করিলে দণ্ডভোগ করিতে হইবে। এই জন্য পাপ এবং পুণ্যের জন্য দণ্ড পুরস্কার বিহিত হইয়াছে।

এ স্থলে এই এক নূতন আপত্তি আসিতে পারে যে ঈশ্বর জানিতেন মনুষ্যগণ এই স্বাধীনতার অপব্যবহার করিয়া পাপে লিপ্ত হইবে, তথাপি তিনি মনুষ্যকে সর্ব্বতোভাবে প্রমুক্ততা দিয়া ভাল করেন নাই। কেননা ইহা দ্বারা ঈশ্বরের ন্যায় বিচারের ত্রুটি প্রকাশ পায়। তিনি পশু পক্ষী প্রভৃতি ইতর জন্তুদিগকে যেমন সম্পূর্ণরূপে প্রকৃতির বশীভূত করিয়া রাখিয়াছেন, মনুষ্যদিগকে সেই-রূপ একদিকে বদ্ধ রাখিয়া অপরদিকে প্রমুক্ত করিতে পারিতেন, তাঁহাতে তাঁহার অসীম ন্যায়পরতা প্রকাশ পাইত। কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে জানা যাইবে মনুষ্যগণকে সম্পূর্ণ প্রমুক্ততার ভাব প্রদান করিয়া ঈশ্বর অসীম উদারতা প্রদর্শন করিয়াছেন। আমরা ইচ্ছাপূর্ব্বক আপনার গলায় আপনি ছুরী দিব, আবার যাহা কিছু দোষ ঈশ্বরের উপর চাপাইব, ইহা কি উচিত? কখনই নহে। বিশেষতঃ জগৎ নিয়মের অধীন, ঈশ্বর নিয়মকর্ত্তা। নিয়মানুসারে এক বস্তুর এক প্রান্ত বদ্ধ রাখিয়া অপর প্রান্ত মুক্ত করিয়া দিলে সে কখন ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করিতে পারে না। যাহা বদ্ধ তাহার এক দিক্ বদ্ধ হইলে অপর দিক্‌ও কাজে কাজেই বদ্ধ থাকিবে। আর এক কথা এই, ঈশ্বর মনুষ্যকে স্বাধীনতা প্রদান করিলেন, মনুষ্য সেই

স্বাধীনতা পাইয়া গর্ব্বিত ও অহঙ্কৃত হইল সত্য, কিন্তু যখন সে মোহ মুক্ত হইয়া প্রদাতাকে এই মহত্তর দানের জন্য সকৃতজ্ঞ হৃদয়ে ধন্যবাদ প্রদান পূর্ব্বক আরও তাঁহার অনুগত হইবে, তখন তাহার কত সুখ শান্তি বর্দ্ধিত হইবে। অন্ধের ন্যায় পরিচালিত হইলে তাহার কি ঈদৃশ সুখ শান্তি এবং মহত্ত্ব লাভের সম্ভাবনা ছিল? মনুষ্য যখন এই অমূল্য দান পাইয়া অকৃতজ্ঞ হইল, অবিনীত হইল, অধীর ও গর্ব্বিত হইয়া তাঁহার শাসন অমান্য করিল, তখন তিনি তাহার প্রতিকার করেন। তিনি এমন ঔষধ প্রদান করেন যে এক মুহূর্ত্তে পিশাচও মানব হয়, মানব দেবতা হইয়া যায়। সুতরাং ঈশ্বরের ন্যায়পরতা চিরকাল অব্যাহত রহিয়াছে।

উপরে যাহা প্রদর্শিত হইল তাহা দ্বারা নিশ্চয় প্রতীত হইবে, সত্যের সঙ্গে মনুষ্যের অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। সত্য ভিন্ন মনুষ্য আর মনুষ্য থাকে না। এক জন আর্য্য কবি লিখিয়াছেন, "আহারনিদ্রাভয়মৈথুনঞ্চ সামান্যমেতৎ পশুভির্নরাণাং। ধর্ম্মোহি তেষামধিকোবিশেষো ধর্ম্মেণ হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ॥" পশুদিগের আহার আছে, নিদ্রা আছে, ভয় আছে, কাম প্রবৃত্তি আছে, মনুষ্যেরও এ সকল আছে। পশু আর মনুষ্যে আর বিশেষ কি? পশুদিগের ধর্ম্ম নাই, অর্থাৎ সত্য গ্রহণে সামর্থ্য নাই। ধর্ম্মই সত্য এবং সত্যই ধর্ম্ম। ধর্ম্ম আর সত্য অভিন্ন পদার্থ, ইহা পূর্ব্ব

অধ্যায়ে প্রদর্শিত হইয়াছে। মনুষ্য যদি আপনা আপনি এই সত্য হইতে বঞ্চিত হয়, তবে মনুষ্যের সঙ্গে পশুর কোন প্রভেদ থাকে না। এখন বুঝিতে পারা গেল সত্যই মনুষ্যের পরম সম্পদ, ধর্ম্মই মনুষ্যের জীবন, সত্যই মনুষ্যের মূল্য এত বৃদ্ধি করিয়াছে যে সে সেই জন্য সমস্ত জগতের উপর রাজা বলিয়া পরিচিত, সত্যশূন্য মনুষ্য এক মুহূর্ত্তও শোভা পায় না। আর্য্য কবি বলিয়াছেন, সত্য-বিহীন মনুষ্য পশুর সমান, আমি বলি সত্যবিহীন মনুষ্য পশু অপেক্ষা অধম। কেননা পশু সত্যের বিরোধী হইতে পারে না, মনুষ্য বিরোধী হইতে পারে।

এখন বুঝিবার আর বাকি রহিল না যে সত্য কেবল মনুষ্যের জন্য, অন্য কাহারও জন্য নহে। সত্যের উপযোগিতা মনুষ্য ভিন্ন আর কোথাও নাই। অতএব যেমন মনুষ্যের জন্য সত্য তেমনই সত্যের জন্য মনুষ্য। যদি সত্যের উপযোগিতা আর কোথাও থাকিত, তবে সেই সেই স্থানেও সত্যের ভাব দেখিতে পাওয়া যাইত। আপন উপযোগিতার জন্যই মনুষ্য সত্যের বিষয়েঁ সম্পূর্ণ দায়ী। মনুষ্যের চাক্ষুষে মনুষ্যের জ্ঞাতসারে যদি এক বিন্দু সত্যও স্খলিত বা পতিত হয়, তবে তাহার ফল ভোগ মনুষ্যকেই করিতে হইবে ইহার আর কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। সত্যস্বরূপ ঈশ্বর হইতে সত্যরূপ অগ্নি-শিখা সকল জগতে সঞ্চরিত হইতেছে, মনুষ্য ভিন্ন আর

কোথাও তাহা অনুপ্রবিষ্ট হইবার স্থান নাই। যেমন স্বচ্ছ পদার্থ ভিন্ন কোন বস্তু প্রতিবিম্বিত হইতে পারে না, সেইরূপ মনুষ্যরূপ পরিষ্কৃত দর্পণ ভিন্ন সত্যের প্রভা আর কিছুতেই প্রতিফলিত হইতে পারে না।

আর এক কথা এই মনুষ্যজাতি অপূর্ণ। সুতরাং এক দিনে কি একবারে সমস্ত সত্য তাহারা আয়ত্ত করিতে অক্ষম। একটীর পর একটী, তার পর একটী, এইরূপে সত্য গ্রহণ করা মনুষ্যের স্বভাব। মনুষ্য সহস্র যত্ন করিলেও সমুদায় সত্য একবারে গ্রহণ করিতে পারে না। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে মনুষ্য সত্যের জন্য দায়ী। এক দিকে অপূর্ণতানিবন্ধন সত্যের ভাব গ্রহণে অসমর্থ, অন্য দিকে সত্যের বিচ্যুতির জন্য দায়ী, ইহা মনুষ্যের ঘোর বিপদ্। নিয়ন্তার নিয়ম সদোষ বলিয়া প্রমাণ হইবার এটী একটী গুরুতর কারণ বলিয়া বোধ হইতে পারে, কিন্তু তাহা হয় না। মনুষ্য এই আপেক্ষিকতার জন্য মার্জ্জনা পাইবে। যে সত্য মনুষ্য আয়ত্ত করিতে পারিয়াছে, যে সত্য মনুষ্যের বিমল বুদ্ধিমুকুরে প্রতিফলিত হইয়াছে, তাহারই জন্য মনুষ্য দায়ী। অতএব মনুষ্য যখন যাহা সত্য বলিয়া অবধারিত করিবে, যখন যাহা সত্য বলিয়া বুঝিবে, সেই দিন সেই মুহূর্ত্তে তাহা সে জীবনে পরিণত করিতে চেষ্টা করিবে। তাহা না করিয়া যদি জানিয়া শুনিয়া সত্যের বিরুদ্ধে কার্য্য করে, তবে তাহার জন্য

চিরকাল প্রবল যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে। কারণ মনুষ্য সত্যের আশ্রয়, সত্য মনুষ্যের আশ্রয়। সত্য মনুষ্য ভিন্ন অনুপযোগী, মনুষ্যও সত্য ভিন্ন হতভাগ্যদরিদ্র। যাহারা এই পারস্পরিক আশ্রয় আশ্রয়িত্ব বুঝিয়াও ইহার অপ-ব্যবহার করিবে, তাহারা চিরকাল মনুষ্য নামের কলঙ্ক স্বরূপ হইয়া আপনাদের কষ্ট আপনারা আনয়ন করিবে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, মনুষ্য আপেক্ষিকতার জন্য মার্জ্জনা পাইবে, কিন্তু আলস্যের জন্য কখন মার্জ্জনা পাইবে না। যত দিন কণ্ঠাতে প্রাণবায়ু প্রবাহিত থাকিবে, যত দিন জ্ঞান বুদ্ধি প্রকৃতিস্থ থাকিবে, তত দিন সত্যের অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতে হইবে, নিজের দুর্ব্বলতার পরিমাণ বুঝিয়া সর্ব্বতোভাবে ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইবে। আলস্যে কাল কর্ত্তন করা মহা পাপ। কেবল পাপ নহে, আলস্য কালসর্প। এ সর্প যাহাকে দংশন করে, সে আর কোন কার্য্য করিতে সমর্থ হয় না, সে যন্ত্রী হইয়া যন্ত্রের ন্যায় অন্য কর্ত্তৃক পরিচালিত হয়। জ্ঞানশালী মনুষ্যের ইহা অপেক্ষা আর বিড়ম্বনা কি হইতে পারে? ভাই সকল! বন্ধু সকল! আর আলস্যে নিদ্রা যাইও না। আর আ-পনি আপনার দুর্গতি ডাকিয়া আনিও না। ঈশ্বর তোমা-দিগকে সকলই প্রদান করিয়াছেন, কিছুই অভাব রাখেন নাই, তথাপি কেন যন্ত্রবৎ নিশ্চেষ্টভাবে পড়িয়া থাক? একবার উত্থান কর, সাহসে নির্ভর কর, পুরুষোচিত

কার্য্য কর। বীরপুরুষেরা কি করে? রণ জয় করে, সেনাপতিরা প্রভুর জন্য প্রাণ দিয়া শত্রুর সহিত যুদ্ধ করে। তোমরা এত বীরত্ব পাইয়াও কি নিদ্রা যাইবে? এমন কলঙ্কের কাজ কদাচ করিও না। সত্য পালন কর, সুখী হইবে।

শ্রীগোপালচন্দ্র দাস দ্বারা মুদ্রিত।

ধর্ম্মবিজ্ঞানবীজ।

দ্বিতীয় খণ্ড।

শ্রীকালীশঙ্কর দাস

প্রণীত।

" ধর্ম্মঃ প্রোজ্‌ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো

নির্ম্মৎসরাণাং সতাং——————।"

কলিকাতা।

ইণ্ডিয়ান মিরার যন্ত্রে মুদ্রিত।

১৭৯৯ শক।

ধর্ম্মবিজ্ঞানবীজ।

দ্বিতীয় খণ্ড।

প্রথম অধ্যায়।

পূর্ব্ব খণ্ডে ধর্ম্মের সহিত মনুষ্য জাতির যে সম্বন্ধ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাতে প্রদর্শিত হইয়াছে ধর্ম্ম মনুষ্যের দুস্ত্যাজ্য। যে ব্যক্তি বলপূর্ব্বক ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সুখী হইতে যায়, সে ইচ্ছাপূর্ব্বক দুর্গতিসাগরে নিমগ্ন হয়।

লোকে জানে ধর্ম্মপালনকরা দুঃসাধ্য কিন্তু পরিত্যাগ-করা সহজ। কেবল জানে এরূপ নহে; এ সম্বন্ধে তাহারা অনেক প্রমাণও প্রদর্শন করিয়া থাকে। আমাদিগের মত ইহার বিপরীত। আমরা বলি ধর্ম্মপালন সহজ কিন্তু বিনাশকরা দুষ্কর। সহজ কি? যাহা অনায়াসে প্রতিপালন করা যায়। দুষ্কর কি? যাহাতে কৃতকার্য্য হইতে হইলে অনেক শ্রম ও যত্নের অপেক্ষা করে। আপাতত দেখিলে বোধ হইবে, লোকে সাধারণতঃ ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া অধর্ম্মাচরণ করিতেছে, অনেকে আবার ধর্ম্মসাধনে যত্ন করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছে না। ইহার অভ্যন্তরে

প্রবিষ্ট হইলে এবং ইহার প্রকৃতিগত বিষয়গুলি সুন্দররূপে পর্য্যালোচনা করিলে, ইহার বিপরীত ভাব অর্থাৎ সহজ-পালনত্ব অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম হইতে পারিবে। ধর্ম্ম প্রকৃতি-সম্ভূত। যে ব্যক্তি প্রকৃতি পরিত্যাগ করিবে, সে অবশ্যই বল প্রয়োগ করিবে, নতুবা পারিবে না। ধর্ম্মপালন যে সহজ তাহা পরে ক্রমে ক্রমে প্রমাণ করিবার চেষ্টা করা যাইবে। এখন প্রকৃত প্রস্তাবের অনুসরণ করা যাউক।

ধর্ম্ম মনুষ্যের জীবনসর্ব্বস্ব, ধর্ম্মই মনুষ্যের মনুষ্যত্ব, ধর্ম্মই মনুষ্যের দেবত্ব, ধর্ম্মই মনুষ্যের পরম সম্পদ্, ইহা পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। ধর্ম্ম মনুষ্যজাতির একটি উন্নতি-শীল গরিমা। মনুষ্য যত যত্ন করিবে, এই গরিমার উন্নতি হইবে। সকল বস্তুরই উন্নতির সীমা আছে; কিন্তু মনুষ্যের ধর্ম্মোন্নতির সীমা নাই। কেন না মনুষ্যজাতিকে যিনি উন্নতি প্রদান করেন, যাঁহাকে লইয়া ধর্ম্মের উন্নতি, তিনি অনন্ত।

এখন জানা আবশ্যক, মনুষ্যের এই অপরিহার্য্য গৌরবের স্বরূপ কি? কি কি লক্ষণ জানিলে ধর্ম্মকে স্বরূপতঃ অবগত হওয়া যায়? প্রকৃতিসম্ভূত কার্য্যের নাম ধর্ম্ম, ইটি স্থূল কথা। ইহা দ্বারা ধর্ম্মের স্বরূপ জানা যায় না, কেবল ভাব-মাত্র গ্রহণ করা যাইতে পারে। প্রকৃতিমূলক কার্য্য একটি বা দুইটি নহে, কিন্তু অনেক। একটি মাত্র ভাব দ্বারা অনেক-গুলি বিষয় পরিগ্রহ করা যায় না। ধর্ম্মের পৃথক্ পৃথক্

স্বরূপ অবগত হইতে না পারিলে, তাহার নিগূঢ় তথ্যসকল জ্ঞানযোগে আয়ত্ত করিতে না পারিলে, ফল কথা—তাহাকে বিশেষরূপে না জানিলে—কার্য্যে পরিণত করা যায় না। যাহা কার্য্যে অপ্রযোজ্য, তাহা দ্বারা ফললাভ হওয়াও অসম্ভব। এ জন্য আমরা অগ্রে ধর্ম্মের সাধারণ লক্ষণ প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব, পরে তাহার স্বরূপতঃ বিভাগ সকলও দেখাইবার জন্য যত্ন করিব।

১ম। যাহা মানবজাতির প্রকৃতিমূলক কর্ত্তব্য, তাহাই তাহার ধর্ম্ম। কর্ত্তব্য কি? যাহা না করিলে স্রষ্টার বিরুদ্ধে এবং আপন প্রকৃতির বিরুদ্ধে অপরাধ জন্মে, করিলে ঈশ্বরের আদেশ ও প্রকৃতির অনুযায়ী কার্য্য করা হয়;—অথবা যাহা না করিলে মনুষ্য ঈশ্বরের নিকট অবিশ্বাসী ও কৃতঘ্ন বলিয়া পরিচিত হয়, এবং বল দ্বারা প্রকৃতির অবরোধ করে বলিয়া নানা অমঙ্গল ও অশান্তিতে নিপতিত হয়; করিলে কর্ত্তব্যপরায়ণ, কৃতজ্ঞ এবং ভক্তশ্রেণী মধ্যে পরিগণিত হয়,—তাহাই কর্ত্তব্য, তাহাই মনুষ্য জাতির ধর্ম্ম।

যে কার্য্য করিতেই হইবে, তাহা প্রকৃতিমূলক হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। কেন না অপ্রাকৃতিক কার্য্য কেহ সম্পন্ন করিতে পারে না। যদিও কেহ বলপূর্ব্বক করে, তাহা হইতে পবিত্র সুখ ও শান্তি পাইবার আশা নাই। যাহাতে সুখ নাই শান্তি নাই, প্রত্যুত দিন দিন কেবল অসুখ ও অশান্তি আনিয়া উপস্থিত করে, তাহা অধর্ম্ম, অন্যথা ধর্ম্ম।

মনে কর, আমার ধন আছে দয়াও আছে; এবং পৃথিবীতে অভাবগ্রস্ত জীবও আছে। প্রথমতঃ যখন অভাবান্বিত ব্যক্তি আমার সম্মুখে উপনীত হইয়া আপন দুঃখের কথা ব্যক্ত করিতে থাকে, তখন সেই দুঃখীর দুরবস্থা-ঘটিত বৃত্তান্ত আমার অন্তরস্থ দয়াকে উত্তেজিত করিয়া দেয়। এ স্থলে আমি যদি দয়ার অনুমোদিত আচরণ করি, তাহা হইলে আমার প্রকৃতিমূলক কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিলাম, স্রষ্টার প্রিয় কার্য্য সাধন করিলাম। আর যদি দয়ার উত্তেজনা অগ্রাহ্য করি, তবে বলপূর্ব্বক প্রকৃতির অবরোধ করিলাম, স্রষ্টার অপ্রিয় সুতরাং অকর্ত্তব্য কার্য্য করিলাম। কাজে কাজেই তাহা অপরাধ বা পাপ হইল, ধর্ম্ম হইল না।

২ য়। একটি দায়িত্বের নাম ধর্ম্ম*। দায়িত্ব কি? কিসের জন্য মনুষ্য দায়ী হইতে পারে? আলোচনা করিলে জানা যাইবে, মনুষ্য কেবল স্বীকৃত বা অঙ্গীকৃত বিষয়ের জন্য দায়ী, অন্য কিছুরই জন্য সে সেরূপ দায়ী নহে। যিনি ভূলোক ও দ্যুলোক প্রভৃতি সমস্ত বিশ্বরাজ্যের এক মাত্র রাজা, তিনি মনুষ্যজাতিকে সৃজন করিলেন এবং আপন অসীম রত্নভাণ্ডার হইতে দীন হীন ও সহায়সম্পৎশূন্য সেই মনুষ্যকে কিঞ্চিৎ দান করিলেন। হতদরিদ্র ও অক্ষম

* "Religion is the covenant between God and man."—*Buckle.*

মনুষ্য প্রভুর সেই দান পাইয়া সমস্ত জগতের মধ্যে অতি-প্রতাপশালী হইল। মনুষ্য তুলনা করিয়া বুঝিল যে প্রভুর কৃপাতে সে সমুদায় সৃষ্টির প্রধান হইয়াছে। তখন সে তাঁহার অসীম মহিমা ও প্রভাব দর্শন করিয়া কৃতজ্ঞতাতে অবনত হইল এবং তাঁহার নিকট প্রণত মস্তকে স্বীকার করিল "হে প্রভো! আমি চিরকাল তোমার আদেশ পালন করিব। আমার প্রতি অনুজ্ঞা কি তাহা প্রকাশ কর।" তখন প্রভু প্রসন্নতাপ্রদর্শনপূর্ব্বক বলিলেন, "বৎস! তোমাকে যাহা প্রদান করা হইয়াছে, তাহার সদ্ব্যবহার করিও। আর মনে রাখিও তোমার কিছুই ছিল না ও নাই। যাহা কিছু সম্পদ্ সমুদায় আমার। এ সকল আমার সম্পদ্ জানিয়া যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিবে। সাবধান! তুমি যাহা পাইয়াছ তাহার সীমা আছে, সেই সীমা অতিক্রম করিলে কষ্ট পাইবে। আর সীমার মধ্যে থাকিয়া প্রার্থনা করিলে আমি তোমাকে আরও অনন্ত কাল দান করিব।" মনুষ্য বিনীত ভাবে "এই আজ্ঞা পালন করিব" বলিয়া স্বীকার বা অঙ্গীকার করিয়াছে। এখন সেই মনুষ্য যদি সেই আজ্ঞা পালন না করে, তবে সে জন্য সে প্রভুর নিকট অবশ্যই দায়ী।

মনে কর, প্রভুর কৃপায় তোমার অন্তরে একটী প্রেমের ভাণ্ডার স্থাপিত হইয়াছে, তাহাতে স্থিত বস্তুর পরিমাণ অতি অল্প। এমত অবস্থায় তুমি যদি অপরিণামদর্শী

হও, তবে হয়ত একজনকে দান করিয়াই সমস্ত ধন ফুরাইয়া ফেলিতে পার। আর তুমি যদি সদ্ব্যবহার জান, তুমি যদি প্রভুর আজ্ঞা বিস্মৃতির ভয়ে বজ্রাঙ্কে আপন হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া রাখিয়া থাক, তবে যখন বুঝিতে পারিবে, তোমার হৃদয়স্থ প্রেমভাণ্ডার শূন্য হইতেছে, তৎক্ষণাৎ সরল ভাবে কাতর চিত্তে প্রভুর নিকট প্রার্থনা করিবে, প্রভুও আপন অঙ্গীকার জানিয়া তোমার চিত্ত পুনর্ব্বার প্রেমপূর্ণ করিয়া দিবেন। আর যদি মোহ বশতঃ আপন অঙ্গীকার ভুলিয়া যাও এবং ভুলিয়া প্রেমের সীমা অতিক্রম কর, অথবা সেই দেবদুর্ল্লভ প্রেমধন অযত্নে নষ্ট কর, তবে সে জন্য তোমাকে প্রভুর নিকট দায়ী হইতে হইবে। কেন না প্রভুদত্ত ধন রক্ষা করিবে ও সদ্ব্যবহার করিবে বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছ, সুতরাং না করিলেই তুমি তৎসম্বন্ধে দায়ী।

৩য়। একটী অনুবৃত্তির নাম ধর্ম্ম। অনুবৃত্তি কি? এক স্থান হইতে স্থানান্তরে সংক্রমণ। যাহা ঈশ্বর হইতে অবরূঢ় হইয়া মনুষ্য বা জগতে বিস্ফুরিত হইয়া থাকে উহা অনুবৃত্তি। এই অনুবৃত্তি ধর্ম্ম। ঈশ্বরের সমদর্শিতা, ঈশ্বরের উদার নিরপেক্ষ প্রীতি, ঈশ্বরের বিমুক্ত ভাব, ঈশ্বরের, অসীম করুণা প্রভৃতিকে আদর্শ করিয়া মনুষ্য যাহা করে, তাহাতে সেই সকল গুণ তাহাতে সংক্রামিত হয়। এই সংক্রমণই তাহার ধর্ম্ম।

মনে কর, তোমার হৃদয়ে যে প্রেমভাণ্ডার স্থাপিত আছে, তাহার সীমাতে প্রবল বিদ্বেষানল জ্বলিতেছে। তাহার উত্তাপে অতি অল্প ক্ষণের মধ্যে তোমার অন্তরস্থ প্রেমনদ শুষ্ক হইতে পারে। যদি এই সময়ে তোমার উপর ঈশ্বরের করুণা বৃষ্টি নিপতিত হয়, অথবা যদি সেই সময়ে ঈশ্বরের প্রেমভাণ্ডারস্থ প্রেম তোমার হৃদয়ে অনুবর্ত্তিত হয়, তবেই তোমার ভয় মিটিল এবং বিদ্বেষোচিত কার্য্য অধর্ম্ম নিবারিত হইয়া, প্রকৃতিমূলক ও প্রেমোচিত কার্য্য ধর্ম্ম অবাধে সম্পন্ন হইতে পারিল।

৪র্থ। একটী দাস্যবৃত্তির নাম ধর্ম্ম। দাস্যবৃত্তি কি? দাস্যবৃত্তি বলিতে কি বুঝা যাইবে? যাহাতে নিজের ইচ্ছা বা কর্ত্তৃত্ব কিছুই থাকে না, যাহাতে নিজের অহঙ্কৃতির মর্য্যাদা বিস্ফুরিত হইতে পারে না, যাহা অদ্বিতীয় পূর্ণ পর ব্রহ্মের কার্য্য জানিয়া মনুষ্য ভৃত্যবৎ সম্পন্ন করে, তাহাই অথবা সেই সকল প্রকৃতিমূলক কার্য্যের নাম ধর্ম্ম।

মনে কর, এই সংসারে পিতা পুত্র গুরু শিষ্য রাজা প্রজা ধনী দরিদ্র প্রভৃতি বহুতর সম্পর্ক বিদ্যমান আছে, এবং সেই সম্পর্কোচিত কার্য্যসাধনোপযোগী ভাব আমাদিগের হৃদয়ে আছে। সুতরাং ঐ সকল সম্পর্কোচিত কার্য্য প্রকৃতিমূলক হইবে সন্দেহ নাই। যদি ইহা প্রকৃতিমূলক বলিয়া স্বীকার করা যায়, তবে ধর্ম্ম বলিয়াও স্বীকার করিতে হইবে। কেন না প্রকৃতিমূলক কার্য্যের

নামই ধর্ম্ম। কিন্তু যদি মনে করি, আমার কর্ত্তৃত্ব বলেই পিতা মাতার জীবন রক্ষা পাইতেছে, আমা ব্যতীত সন্তান-সন্ততির জীবন বাঁচিবার উপায় নাই, আমিই প্রজাদি-গকে নানাপ্রকার বিঘ্নবিপত্তি হইতে আপন ক্ষমতাবলে রক্ষা করিতেছি, আমি আপন ক্ষমতায় দীনদরিদ্রদিগকে অন্নদান করিয়া বাঁচাইতেছি, সুতরাং এসকল আমারই গৌরব, তাহা হইলে ইহাতে নিজের কর্ত্তৃত্বাভিমান বিস্ফুরিত হইল। কার্য্য গুলি প্রকৃতিমূলক হইলেও অপ্রাকৃতিক অভিমানের সহিত সংযুক্ত হইল বলিয়া উহা আর ধর্ম্ম নামের উপযুক্ত রহিল না।

আবার যদি মনে করি, সংসারে যত কার্য্য আছে তাহার একটিও আমার নহে কিন্তু আমার প্রভুর। আমি যখন যাহা করি, প্রভুর কার্য্য করি নিজের নহে, এবং সেই কার্য্যগুলি কেবল প্রভুর মহিমাবলে সম্পন্ন হয়, নিজের বলে নহে। যে ভৃত্য, সে প্রভুর কার্য্য করিবে, ইহা তাহার স্বভাব। প্রভুর কার্য্য না করিলে প্রকৃত ভৃত্য হওয়া যায় না এবং প্রভুর বিরুদ্ধে অপরাধ জন্মে। তবে সেই ভৃত্যভাবে যে কার্য্যগুলি নিষ্পন্ন হয়, তাহা প্রকৃতিমূলক বিনয়ের সহিত মিলিত হইল বলিয়া প্রাকৃতিক ধর্ম্ম হইল।

৫ম। একটি অকৃত্রিম প্রেমবৃত্তির নাম ধর্ম্ম। প্রেম-বৃত্তি কি? অকৃত্রিম ভালবাসা। এই প্রেমবৃত্তির দুইটী শাখা। একটি অনন্ত ঈশ্বরাভিমুখে প্রসারিত, দ্বিতীয়টী

জগতের দিকে প্রসারিত। প্রেমশাখীর এই উভয় শাখো-চিত কার্য্যের নাম ধর্ম্ম। ইহার প্রথম শাখাটী প্রধান, দ্বিতীয়টীকে উপশাখা বলিলেও বড় দোষ হয় না। কেন না উহা প্রথমোক্ত শাখা হইতেই সমুত্থিত হইয়াছে। যাহাই হউক, উহা উপশাখা হইলেও একই বৃক্ষের শাখা ও উপ-শাখা। উহার এক স্থানে আঘাত করিলে সমুদায় বৃক্ষ শুদ্ধ যে আহত হইবে, তৎপক্ষে আর সন্দেহ নাই। সুতরাং উপশাখা বলিয়া উপেক্ষিত হইতে পারে না। কেন না বামহস্তের পীড়ার যন্ত্রণা যে অনুভব করিবে, দক্ষিণ হস্তের পীড়াও তাহারই অনুভবনীয়।

মনে কর, যাহাকে ভালবাসি, তাহার সঙ্গে একত্র বাস না করিয়া পারি না। ভালবাসার ইহা একটী অনিবার্য্য শক্তি। এ শক্তির অবরোধ করা যায় না। দ্বিতীয়তঃ যাহাকে ভালবাসি তাহাকে কিসে সন্তুষ্ট করিতে পারিব, কিসে তাহাকে একেবারে আপনার ধন করিয়া রাখিতে পারিব, মনে স্বতই এই স্পৃহার উদ্রেক হয়। সুতরাং যে কার্য্য করিলে প্রিয়তম বিরক্ত হইবার সম্ভব, আমি তাহা ভাবিতেও কষ্ট পাই। অতএব প্রিয় ব্যক্তির প্রিয় কার্য্য সাধন করা মানুষের স্বভাব। এ স্থলে সহজেই বুঝা যাই-তেছে যে প্রিয়জন সহ একত্র বাস ও সতত প্রিয়জনদর্শন প্রেমের প্রথম শাখা। প্রিয় ব্যক্তির প্রিয় কার্য্যসাধন প্রেমের দ্বিতীয় শাখা। দ্বিতীয়টীর মূল প্রথম শাখা,

এই জন্য আমরা প্রথমটীকে শাখা দ্বিতীয়টীকে উপশাখা বলিয়াছি।

উপরে ধর্ম্মের যে সকল লক্ষণ প্রদর্শিত হইল, যদিও উহা পৃথক্ পৃথক্ ভাবে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তথাপি উহার মূলানুসন্ধান করিলে একতা পাওয়া যাইবে সন্দেহ নাই। যে কার্য্য দ্বারা মনুষ্যকে কৃতজ্ঞ বলিয়া জানিতে পারা যায়, তাহা তাহার দায়িত্ব হইতে ভিন্ন নহে। আবার যাহার জন্য মনুষ্য দায়ী, তাহা তাহার প্রকৃতিমূলক হওয়া আবশ্যক এবং সেই প্রকৃতির আদর্শ ঈশ্বর না হইলেও চলে না। ঈশ্বর যাহার আদর্শ তাহার নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব তাঁহারই হস্তে বিন্যস্ত থাকা উচিত। যাহার নেতা ঈশ্বর, তাহা প্রেম পূর্ণ হইয়া কিরূপ স্বর্গীয় শোভার আকর হয়, সাধক! তুমি নিজে তাহা বিবেচনা করিও। একবার মাত্র সেই সুন্দর ছবিটী আপন হৃদয়ের সম্মুখে ধরিয়া দেখিও কিরূপ দেখায়।

এখন অতি সুন্দররূপে বুঝা যাইতেছে যে, ঐ সকল সাধারণ ধর্ম্মলক্ষণের মূল একতাপূর্ণ এবং প্রকৃতিমূলক না হইয়া পারে না। কিন্তু যদিও ইহাদিগের পরস্পরে ঐক্য আছে, তথাপি ইহাদের সকল অংশ লইয়া বিচার অল্লায়াস সাধ্য নহে। এ জন্য আমরা পঞ্চতম লক্ষণটি মূল করিয়া ধর্ম্মের বিভাগসকল নিশ্চয় করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

দ্বিতীয় অধ্যায়।
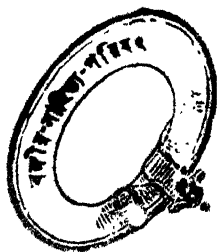
উপাসনার প্রয়োজনীয়তা।

উপাসনা কাহাকে বলে, এই বিষয়ে লোকের অনেক ভ্রান্তি দৃষ্ট হয়। এই জন্য উপাসনা কি তাহা অগ্রে নিশ্চয় করিব; তৎ পর তাহার প্রয়োজনীয়তা এবং তদনন্তর কিরূপ করিয়া তাহা সম্পন্ন করিতে হয় তাহা দেখাইবার চেষ্টা করিব।

উপাসনার মূল দুইটি। এক প্রেম, দ্বিতীয় অভাব। এই দুইটি মূলের প্রকৃতি অনুসারে উপাসনার ভাব দুই ভাগে বিভক্ত হইতে পারে।

যাহাকে ভালবাসি, তাহাকে এক মুহূর্ত্তও চক্ষুর অন্তরাল করিতে অথবা তাহাকে ছাড়িয়া থাকিতে ভয় করি। প্রিয় অভাবে সকল দিক্ ও সকল দেশ শূন্য ভাব ধারণ করে, অতুল সম্পত্তি মধ্যেও অভাববোধ হৃদয়কে ব্যাকুলিত করিয়া তুলে। এই অভাব বা শূন্যভাব দূর করিয়া সর্ব্বদা অবিচ্ছেদে প্রিয় সহবাস ভোগ করিবার জন্য যে চেষ্টা, তাহাকে প্রেমসম্ভূত উপাসনা বলা যাইতে পারে।

অন্য দিকে যাহার অভাব আছে, সেই অভাব দূর করিবার

জন্য আপনা আপনি তাহার ইচ্ছা জন্মে। এই অভাব দূর করিবার ইচ্ছায় অভাবপ্রাপ্ত ব্যক্তি যদি কোন সম্পন্ন ব্যক্তির দর্শন প্রার্থনা করে, তবে সেই দর্শন নির্ব্বিঘ্ন ও অব্যাহত ভাবে চলিবার জন্য যে যত্ন তাহাকে অভাবসম্ভূত উপাসনা বলা যাইতে পারে।

অভাব ও প্রেম এ দুয়ের মধ্যে অনেক ইতর বিশেষ আছে। যে উপাসনা প্রেমসম্ভূত তাহা স্বর্গীয় ভাব-পূর্ণ। তাহাতে ভয় সঙ্কোচ সন্দেহ প্রভৃতি এক মুহূর্ত্তও স্থান পাইতে পারে না। ইহার উদ্দেশ্য কেবল পবিত্র ও উদার প্রীতির বিনিময়। সুতরাং স্বার্থপরতা ইহার ত্রিসীমায় গমন করিতে সমর্থ নহে। প্রীতিই ইহার অভিনেত্রী। প্রীতির শক্তি অনুসারে ইহার অনুগত ব্যক্তি পরিচালিত হইয়া থাকে। অন্যতঃ যে উপাসনা অভাব-সম্ভূত, অভাবই তাহার পরিচালক। এস্থলে দরিদ্র যেমন রাজাকে, ভিক্ষুক যেমন দাতাকে ভয়, সঙ্কোচ ও সন্দেহ করে, অভাব পরিচালিত উপাসকও উপাস্যকে সেইরূপ করে। যে স্থানে ভীতি প্রভৃতির প্রাধান্য আছে, সে স্থানে প্রীতি মুহূর্ত্ত কালও তিষ্ঠিতে পারে না। সুতরাং তাদৃশ উপাসক ভীতিশূন্য পূর্ণানন্দ উপভোগ করিতে সমর্থ হইবেন, এরূপ আশা করা যায় না।

কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, প্রীতি পরিচালিত উপাসকও কখন কখন অভাব প্রেরিত উপাসকের ন্যায় অভাব

জন্য যাতনা ভোগ করিয়া থাকেন। আমরা এ কথায় বিশ্বাস করিতে পারি না। আমার যিনি প্রেমপাত্র, যাঁহার প্রেম সতত সম্ভোগ করিবার আশাতে আপনার সর্ব্বস্ব প্রদান করিয়াছি, নিজের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত মনে রাখিতে পারি নাই, তিনি যদি "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" হন এবং সেই ভূমা মহান্ পুরুষেই যদি আমার প্রেম অবিতথ অর্পিত হইয়া থাকে, তবে আমার তাদৃশ অভাব আসিবে কিরূপে? আমার প্রিয়তম, যাঁহার নিঃশ্বাসের সহিত মিলিত হইয়া আমার প্রত্যেক নিঃশ্বাস প্রবাহিত হইতেছে, তিনি যদি তাদৃশ মহান্ পুরুষ, তবে আমার সেরূপ অভাব থাকিবে কেন? আমার জীবনসর্ব্বস্ব আপনা আপনি আমার অভাব দূর করিবেন, আমি তাহা জানিতেও পারিব না; অথচ শিশু যেমন মাতাকে বিশ্বাস করিয়া সর্ব্বদা ভয়, সঙ্কোচ ও সন্দেহ প্রভৃতি হইতে নিশ্চিন্ত থাকে, আমিও সেইরূপ থাকিতে পারি। অভাবপ্রেরিত উপাসক এরূপ হইবেন কখন আশা করা যাইতে পারে না।

যে দুইটি মূল কারণ হইতে উপাসনার জন্ম, তাহা প্রদর্শিত হইল। সম্প্রতি উপাসনার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে হেতু কি, তাহাই প্রদর্শিত হইতেছে। উপাসনার বিভাগ-সম্বন্ধে সম্প্রতি কিছুই বলা যাইবে না। যখন উপাসনার প্রণালী লিখিত হইবে, সেই সময়ে তাহা বিশেষ করিয়া বলা যাইবে।

প্রথমতঃ যাঁহাকে পাইবার জন্য, যাঁহাকে আপনার করিবার জন্য, আমি যাঁহার হইবার জন্য আপনার প্রাণ মন সমুদায় উৎসর্গ করিয়াছি, সর্ব্বদা নির্ব্বিবাদে তাঁহার দর্শন চাই; সর্ব্বদা তাঁহার সহবাস চাই। সেই প্রেমাননের আলোক এক মুহূর্ত্ত না পাইলে হৃদয় ঘোর অন্ধকারে আবৃত হইয়া পড়ে, প্রাণ কণ্ঠায় থাকিতে চায় না। এই সময়ে প্রবল আকুলতা আসিয়া আক্রমণ করে। আকুলতার প্রভাবে চারি দিক্ অগ্নিবিকীরিত বলিয়া বোধ হয়। প্রিয়তমকে সেই প্রেমের প্রস্রবণকে না পাইলে আর কিছুতেই জীবন শীতল করিতে পারি না। তখন আমি আর কি করিব, কেবল দিনরাত্রি প্রাণেশ্বরকে ধ্যান করি। সম্মুখে পশ্চাতে দক্ষিণে বামে সর্ব্বদা তাঁহার বিদ্যমানতা চিন্তা করি এবং তাঁহার স্বরূপ কি, কি কারণে ও কোন্ গুণে তিনি সর্ব্বাপেক্ষা বরণীয়, সর্ব্বাপেক্ষা রমনীয়, সর্ব্বাপেক্ষা রমণীয়, তাহা চিন্তা করি; একতান ভাবে আমার হৃদয়ের সঙ্গে তাঁহাকে মিলাইয়া ফেলি। এরূপ করি কেন? পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তাঁহাকে ভাল বাসিবার জন্য সর্ব্বস্ব দান করিয়াছি, আপনার জন্য কিছুই রাখি নাই। যখন তাঁহার জন্যই আর সকল ছাড়িয়াছি, তখন এরূপ না করিয়া থাকিতে পারি না। আমি ইচ্ছায় এরূপ করি না, কিন্তু ভালবাসা বলপূর্ব্বক আমাকে এরূপ করায়। সুতরাং যদি এই সময়ে বাহিরের বাধা আসিয়া আমার প্রেমের

যোগ—সেই মণিকাঞ্চনের যোগ—ভাঙ্গিবে মনে করি, তবে যে স্থানে জন মানব নাই, যে দেশে কোন বাধা আসিবার সম্ভাবনা নাই, সেই নির্জ্জন প্রদেশে গিয়া প্রাণসখাকে দেখিয়া, তাঁহার পবিত্র বদনের দুইটি কথা শুনিয়া প্রাণ শীতল করি *।

আর যদি এমন সুখের দিন আইসে—যদি আমার সৌভাগ্যসূর্য্য আর অস্ত গমন না করিবার জন্য উদিত হয়,—যদি আমি প্রাণসখার সঙ্গে একেবারে দৃঢ় করিয়া আপন হৃদয় বান্ধিতে পারি—যদি সে বন্ধন আর কোন কালেও খসিয়া না যায়—তবে আর আমার ভয় থাকে না। আমি আর নির্জ্জনে যাইতে চাহি না, বাধা বিঘ্ন ভাবিয়াও ব্যাকুল হই না। সম্মুখে নৃত্য গীত বাদ্য নিনাদ হইতেছে, বিষম জনকোলাহল শ্রবণশক্তি রোধ করিতেছে, আমার তাহাতে কোন ক্ষতি নাই। আমি তাহারও মধ্যে আমার প্রাণসখাকে ডাকিলেই পাই এবং আলাপ করিয়া কৃতার্থ হই। সময়ে আমি বাহিরের সমুদায় পদার্থ ও সমুদায় ঘটনা ভুলিয়া যাই। এমন কি, আমি আপনার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত মনে রাখিতে পারি না। ইহা উৎকট প্রেমের যোগ †।

---

* কেবল প্রথম অভ্যাসীদিগের পক্ষে এইরূপ অবস্থা ঘটিয়া থাকে।

† এই যোগ হইতেই একাত্মবাদের সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়; এবং ইহাই প্রকৃত সিদ্ধাবস্থা।

এই দেব দুর্লভ অবস্থা লাভ করিবার জন্য উপাসনা করা প্রয়োজনীয়। বহু চেষ্টা ও বহু পরিশ্রম না করিলে দুর্ভাগ্য মনুষ্য ইহা লাভ করিতে পারে না। ইহাতে বাধার সীমা নাই, বিঘ্নের সীমা নাই। উপাসনা ব্যতীত সেই সকল বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করা যায় না। সাধক এই প্রেমযোগ সম্ভোগ করিতেছেন, ইতিমধ্যে যদি কোন কারণ বশতঃ সেই যোগ ভাঙ্গিয়া যায়, প্রাণের প্রাণকে সহসা হারাইয়া ফেলেন, যদি আর তাঁহার প্রেমপূর্ণ চক্ষুঃ তাঁহার উপরে না পড়ে, বহু পরিশ্রম করিলেও যদি আর সেই সৌন্দর্য্য সেই ঐশ্বর্য্য তাঁহার চক্ষুর্গোচর না হয়, তবে সেই ধীর ব্যক্তি আর ধীরতা রক্ষা করিয়া থাকিতে পারেন না। তখন তিনি উন্মাদগ্রস্ত রোগীর ন্যায় অস্থির হইয়া উঠেন। এই সময়ে আরাধনা, ধ্যান, কৃতজ্ঞতা ও প্রার্থনা প্রভৃতি আপনা আপনি তাঁহার হৃদয়ে উদিত হয়। উহা গুপ্ত ভাবে থাকে না ও থাকিতে পারে না।

আমরা এই পৃথিবীতে অনেক দেবরূপী প্রেমিকের জীবন বৃত্তান্ত শুনিয়াছি, তাঁহাদিগের মত্ততার কথাও শুনিয়াছি। যাঁহারা এইরূপ উদার বিশ্বব্যাপী প্রেমে উন্মত্ত, তাঁহারা দেবতা বলিয়া জগতে কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। বস্তুতঃ এই বিশ্বব্যাপী প্রেম ভিন্ন মনুষ্যের দেবত্বলাভের অন্য উপায় নাই*।

---

* চৈতন্য নারদ ও ঈশা প্রভৃতি এইরূপ প্রেমযোগের আদর্শ।

যাহা হউক সাধক এই অবস্থায় প্রেমময়কে অন্বেষণ করিতে প্রবৃত্ত হন। জল, স্থল, শূন্য, বৃক্ষ ও পর্ব্বত, সর্ব্বত্র তাঁহাকে অন্বেষণ করিয়া ভ্রমণ করেন। উদ্দেশ্যে তাঁহার প্রতি অনুযোগ প্রয়োগ করেন, এবং উদ্দেশ্যেই প্রার্থনা করেন। সম্মুখে জীব জন্তু প্রভৃতি যাহা দেখেন, তাহারই নিকটে প্রাণেশ্বরের সংবাদ জিজ্ঞাসা করেন। স্বপ্নে প্রিয়তমের সঙ্গে কথোপোকথন করেন। এ স্বপ্ন জাগ্রদবস্থায়ও অনেক সময়ে সংঘটিত হইয়া থাকে। এই সময়ে সাধক কখন কখন প্রেমময়ের দর্শন লাভ করেন। যখন তাঁহার দর্শন পান, তখন আনন্দের আর পরিসীমা থাকে না। আবার যখন তাঁহাকে হারান, শোক প্রবাহ উচ্ছ্বসিত হইয়া পড়ে। এ অবস্থায় সাধক কখন হাস্য, কখন ক্রন্দন, কখন নৃত্য, কখন গীত, কখন আলাপ করিতে থাকেন। বহু কাল অদর্শনের পর যখন পুনর্ম্মিলন হয়, তখন তিনি কৃতজ্ঞতাতে গলিয়া যান। তখন মৃত্যুকালে জীবন প্রাপ্ত লোকের ন্যায় তাঁহার অবস্থা ঘটে। এ উপকার আর তিনি কখন ভুলিয়া যাইতে পারেন না। শত সহস্র প্রলোভন ও পরীক্ষা আসিয়াও আর তাঁহাকে বিহ্বল করিতে পারে না। তাঁহার চক্ষুর জল কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, চক্ষুর জল আনন্দ প্রকাশ করে ও চক্ষুর জলই প্রার্থনা করে, তিনি কিছু বলিতে পারেন না, কেবল নির্ব্বাক্ ও নিস্পন্দ ভাবে চক্ষুর জল বিসর্জন করিয়া পরিতৃপ্ত হন। ঈশ্বর যদি পুত্র হইতে,

বিত্ত হইতে, এবং অন্যান্য সমস্ত পার্থিব প্রিয় বস্তু হইতে অধিকতর প্রিয় হন*, তবে তাঁহার উপাসনা করা প্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ হইবে। যে পর্য্যন্ত তাহা না হইবে, সে পর্য্যন্ত উপাসনার প্রয়োজনীয়তা হৃদয়ঙ্গম করা যাইবে না।

ভ্রাতঃ! তুমি বৃহস্পতি সূত্র পড়িয়াছ, কপিল মুনির অনীশ্বরবাদ (সাঙ্খ্য দর্শন) দেখিয়াছ, অথবা অগস্ত কোমতের নাস্তিকতার কথা শুনিয়াছ, তুমি হয়ত বলিবে, উপাসনা প্রয়োজন কি?। কিন্তু যে একবার এই প্রসন্ন প্রেমানন অবলোকন করিয়াছে যে একবার সেই সৌন্দর্য্য-সাগরে ডুবিয়াছে, ডুবিয়া আবার হারাইয়াছে, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিও উপাসনা কেন? আর যদি তোমার হৃদয়ে প্রেমের কুসুম বিকসিত হয়, যদি তোমার সহজ জ্ঞানে সেই প্রেমময়ের সৌন্দর্য্যজ্যোতিঃ একবারও নিপতিত হয়, বুঝিতে পারিবে উপাসনার প্রয়োজন কি? তোমার শুষ্কতা না ঘুচিলে তুমি ইহা কখনও বুঝিতে পারিবে না।

দ্বিতীয়তঃ যাহার অভাব আছে তাহাকেও উপাসনা করিতে হইবে †। অভাব থাকিলে, অভাবের যাতনাবোধ থাকিলে সেই অভাব দূর করিবার যত্ন না হইয়া পারে না।

---

* "তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়োবিত্তাৎ প্রেয়োন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাদন্তরতমো যদয়মাত্মা।"

† প্রেমের উপাসনা যদিও শ্রেষ্ঠ, তথাপি প্রথমাবস্থায় মনুষ্য সেরূপ উপাসনায় প্রবৃত্ত হইতে পারে না। কেননা

যাহার উদরে অন্ন নাই, ক্ষুধায় অন্তর জ্বলিতেছে, সে অন্নের অন্বেষণ না করিয়া থাকিতে পারে না। তৃষ্ণায় যাহার প্রাণ ছট ফট করিতেছে, তালু ও কণ্ঠ শুষ্ক হইয়াছে, জল কোথায় তাহাকে অন্বেষণ করিতেই হইবে। যাহার বস্ত্র নাই, শীতে শরীর আড়ষ্ট হইতেছে, অথচ বস্ত্রের জন্য সংস্থান মাত্র নাই, তাহাকে ধনীর দ্বারে অতি দীন ভাবে চক্ষুর জলে বক্ষঃস্থল প্লাবিত করিয়া কাতরতা প্রকাশ করিতেই হইবে। যত ক্ষণ ধনীর নিকট হইতে ভিক্ষা না আসিতেছে, তত ক্ষণ সেই দ্বারে দণ্ডায়মান থাকিতেই হইবে। যাহার ক্ষুধা আছে, সে অন্ন চাহিবে না, তৃষ্ণা আছে, জল চাহিবে না; প্রবল শীতে শরীর আড়ষ্ট হইতেছে, এক খানি চীরবসনও নাই যে তদ্দ্বারা তাহা নিবারণ করিবে, অথচ বস্ত্র চাহিবে না; রোগে শরীর জর্জ্জরিত হইতেছে, অথচ চিকিৎসকের গৃহে যাইবে না, এবং ঔষধ চাহিবে না, ইহা অস্বাভাবিক, সুতরাং অসম্ভব। যাহার যে বিষয়ে অভাব আছে, সে অভাব দূর করিবার জন্য তাহাকে যত্ন করিতেই হইবে, না করিলে চলিবে না।

অভাব নাই কাহার? এ জগতে বিধাতার সৃষ্টিমধ্যে সকলেরই অভাব আছে। কিন্তু সে অভাব বুঝিবার এবং বুঝিয়া প্রতিকারের চেষ্টা করিবার শক্তি সকলের নাই।

মনুষ্যমাত্রেই অভাবগ্রস্ত; এবং অভাবশালী ব্যক্তি কখনও অভাব ছাড়িয়া অন্য চিন্তা করিতে পারে না।

কেবল এক মাত্র মনুষ্য সেই সকল অভাব বুঝিতে ও প্রতিকারের উপায় করিতে সমর্থ, অন্যে নহে। যে অভাব বুঝিতে পারে, অভাবের যন্ত্রণা অনুভব করিতে পারে, সে নিশ্চিন্ত ভাবে নিদ্রা যাইতে পারে না। আমার কিসের অভাব, কাহার নিকটে গেলে সে অভাব দূর হইতে পারে, সময় থাকিতে তাহার অনুসন্ধান করিতে হইবে। তাহা না করিলে অভাবের প্রবল উত্তেজনায় পড়িয়া সহসা প্রাণ হারাইতে হয়। রোগ যখন অল্প, রুগ্ন ব্যক্তি তখন চিকিৎসার জন্য যত্ন করে না। কি রোগ, রোগের উপযুক্ত চিকিৎসক কে, তাহার অনুসন্ধান করে না। তখন সে ভাবে, এ সামান্য পীড়া আপনা আপনি ভাল হইয়া যাইবে, এ জন্য নিরর্থক চিকিৎসককে অর্থদান করিবার প্রয়োজন কি? কিন্তু যখন রোগের যন্ত্রণা অসহ্য হইয়া উঠে, তখন তাহার কর্ত্তব্য জ্ঞান ও পাত্রাপাত্র বোধ থাকে না। এ সময়ে সে অস্থির হইয়া চিকিৎসক অচিকিৎসক সকলকেই ঔষধ জিজ্ঞাসা করে এবং ব্যাকুল অন্তরে রোগের ব্যাখ্যা করে। তাহার কাকুক্তি শুনিয়া উপস্থিত ব্যক্তি যাহা দেয় তাহা ঔষধ কি না, তাঁহাতে রোগের প্রতিকার হওয়া সম্ভব কি না, তাহা বিবেচনা করিবার আর তখন তাহার শক্তি নাই। যাতনায় প্রাণ কণ্ঠাগত, সুতরাং অজ্ঞাত বিষ জ্ঞানপূর্ব্বক সেবন করিয়া প্রাণ হারায়। এই রূপ অভাবগ্রস্ত মনুষ্য কিছু দিন অভাবের সামান্য উত্তেজনা অগ্রাহ্য করিয়া

চলিতে পারে, কিন্তু চিরকাল নহে। যখন অভাবের প্রবল উত্তেজনা উপস্থিত হয়, তখন মনুষ্য একেবারে দিশা হারা হইয়া পড়ে। এই সময়ে সে তাহার হৃদয়জাত মহা-রোগের প্রকৃত চিকিৎসক ঈশ্বরকে ভুলিয়া বিষয়ের পশ্চাৎ ধাবিত হয়। পূর্ব্বে যে সামান্য সংসারক্ষতি চিন্তা করিয়া ব্যাকুলিত হইয়াছিল, এবং উপযুক্ত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হইতেও কুণ্ঠিত ছিল, এখন সে অনুপযুক্ত লোকের হাতে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া বাঁচিতে যায়।

তখন বিষয় তাহার দুরবস্থার মধ্যে তাহার বিনাশের সুযোগ অনুসন্ধান করে, এবং নানা প্রকার প্রলোভন দেখাইয়া তাহাকে আপনার বশীভূত করে। যে ব্যক্তি চিকিৎসা করে, সে রোগের অবস্থা, ঔষধের শক্তি, এবং ঔষধ ও রোগের সম্বন্ধ কিছুই জানে না, অথচ তাহার অর্থের বড়ই প্রয়োজন। সুতরাং সে অর্থ পাইবার জন্য এবং সেই কারণে রোগীর চিত্তাকর্ষণ করিবার জন্য মিথ্যা করিয়া আপন অভিজ্ঞতার ব্যাখ্যা করে। বিষয়সকলও সেই রূপ হতচেতন ও প্রজ্ঞাহীন মানবদিগকে আত্ম-গরিমা বিস্তার করিয়া ঈশ্বর হইতে দূরে লইয়া যায়। অত-এব প্রকৃতি যাহা চায়, তাহাকে তাহা উপযুক্তরূপে প্রদান করিতে হইবে। যে ব্যক্তি কিছু না দিয়া প্রকৃতির গতি অবরোধ করিতে যায়, বালুকা দ্বারা নদীবেগ অবরুদ্ধ করিবার চেষ্টার ন্যায় তাহার চেষ্টা উপহাসে পরিণত হয়।

যিনি প্রকৃতির সদ্ব্যহার করিতে অসম্মত বা অক্ষম, তাঁহার চিত্তবৃত্তি ক্ষিপ্ত অশ্বের ন্যায় বিষয়াভিমুখে ধাবিত হইবে, নিবারিত রাখা যাইবে না। যাঁহারা প্রকৃতির বিরুদ্ধে স্পর্দ্ধা করেন, প্রকৃতির ক্ষমতা কত তাঁহারা অবগত নহেন *। যিনি প্রকৃতির বিরুদ্ধে ঈশ্বরোপাসনা অকার্য্য বলিয়া মনে করিবেন, তাঁহাকে বিষয়োপাসনা কার্য্য বলিয়া মান্য করিতে হইবে। যাঁহারা আপন অভিজ্ঞতা ও সংযমিত্বের অহঙ্কারে অন্ধ, তাঁহারা কেবল অন্ধ নহেন, তাঁহাদিগের ইন্দ্রিয়সকল অবশ্য। সুতরাং অতি সহজে তাঁহারা বিষয়ের বিষগর্ত্তে ডুবিয়া পড়েন, আর উঠিবার তাঁহাদের শক্তি থাকে না। পূর্ব্বে বলা গিয়াছে, আত্মা অপূর্ণ, সুতরাং নানা অভাবের আধার। যাহার অভাব আছে, তাহাকে উপাসনা করিতেই হইবে না করিলে চলিবে না। যিনি অহঙ্কার বশতঃ ঈশ্বরোপাসনার করিবেন না, তিনি অন্ধ হইয়া বিষয়োপাসনা করিবেন। সেই উপাসনা করিবেন, কিন্তু উপাসনার ফল পাইবেন না। কেন না বিষয় নিজেই অভাবের জ্বালায় অস্থির, সে কি অন্যের অভাব মোচন করিতে পারে?

অভাবোত্তেজনার আর একটি কার্য্য দাসত্ব। অভাব-

---

* এই জন্য কৃষ্ণ অর্জুনকে বলিয়াছেন।—"মিথ্যৈষ ব্যবসায়স্তে প্রকৃতিস্ত্বাং নিয়োক্ষ্যতি।" ভগবদ্গীতা।

প্রবৃত্ত হইলেই লোকে ক্ষমতাবান্ ব্যক্তির দাসত্ব ব্রত অবলম্বন করিয়া থাকে। এ সংসারে দাসেরা আপন দাসত্বের বিনিময়ে প্রভুর নিকট অর্থ পায় এবং তদ্দ্বারা নিজের ও পরিবারবর্গের ভরণপোষণ নির্ব্বাহ করে। যাহারা ঈশ্বরের দাসত্বে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, তাঁহাদিগেরও যাহা প্রয়োজন, তাঁহারা তাহা প্রভুর নিকটে প্রাপ্ত হইতে পারেন, কিন্তু ধন, মান, যশ ও অর্থ এ সকল যদিও প্রয়োজনীয়, তথাপি এ সকল সামান্য সম্পদ্ চাহিয়া তাঁহারা আপন প্রভুকে বিরক্ত করেন না। তাঁহারা জানেন, আবশ্যক হইলে প্রভু আপনা হইতে তাঁহাদিগের সে অভাব মোচন করিবেন; তাঁহার নিকট নিজের জন্য কিছুই চাহিবার প্রয়োজন করে না। এই সকল প্রভুপরায়ণ ভৃত্য কেবল নিয়ত প্রভুর সহবাস চান। প্রভুর নিকটে সর্ব্বদা অবস্থান করিতে পারিলে প্রভুর আজ্ঞা কি শুনিতে বা জানিতে পারা যায়। যিনি প্রভুর একান্ত অনুগত, তিনি আর কিছুই চাহেন না, আপনার জন্য কেবল প্রভুর আজ্ঞা চান; এবং প্রভুর আজ্ঞা পাইলেই আপনাকে কৃতকৃত্য মনে করেন। তিনি নিশ্চিত জানেন, প্রভু নিকটে বিদ্যমান থাকিতে ভৃত্য কখন মরে না। তাঁহার যাহা আবশ্যক হইবে, অন্তর্যামী ও সর্ব্বদর্শী প্রভু আপনা আপনি তাহা প্রদান করিবেন; অভাবের জন্য তিনি কখন আপন আশ্রিত ভৃত্যকে মরিতে দিবেন না। ভৃত্য তাঁহার সম্মুখে যদি অনাহারে প্রাণত্যাগ

করে, তবে তাঁহার পতিতপাবন বা অনাথপালন নামে কলঙ্ক আসিবে, ইহা তিনি জানেন।

যে ভৃত্য নিয়ত প্রভুর আজ্ঞা বহন করিতে পারিলেই সুখী হয়, সে মুহূর্ত্তের জন্যও প্রভুর সন্নিকর্ষ পরিত্যাগ করিতে পারে না। সে সর্ব্বদা এই ভাবিয়া ব্যাকুল হয় যে পাছে প্রভু দাসের প্রতি কোন্ আজ্ঞা করেন, আর দাস অনুপস্থান জন্য কিম্বা অপ্রণিধান বশতঃ শুনিতে না পায়, তবেইত সর্ব্বনাশ। কেন না সেরূপ করিলে প্রভু নিঃসন্দেহ ভৃত্যকে উদাসীন বা অমনোযোগী মনে করিবেন। যদি প্রভু অমনোযোগী মনে করিলেন, যে প্রভুর প্রসন্নতাই ভৃত্যের জীবন, সেই প্রভু যদি ভৃত্যকে উদাসীন বলিয়া বুঝিলেন, তবে তাদৃশ ভৃত্যের মৃত্যুই মঙ্গল। এই যে নির্ভর-প্রিয় সংসারবিরক্ত ঈশ্বরানুরাগী উপাসক, উপাসনা ইহার জীবনের প্রীতি, উপাসনা ভিন্ন সে কখনও থাকিতে পারে না।

যিনি প্রার্থনা করিবার পূর্ব্বে স্বয়ং প্রয়োজন বুঝিয়া ভৃত্যকে দান করেন, তাদৃশ প্রভু এ সংসারে নাই। যিনি এইরূপ উদার দানশীলতা দ্বারা ভৃত্যের মন বান্ধিয়া ফেলেন, তিনি সমস্ত বিশ্বরাজ্যের এক মাত্র রাজা। উপাসনা ব্যতীত তাঁহার সামীপ্য লাভের অন্য উপায় নাই। যদি আজ্ঞা পালন আমার জীবন ব্রত হয়, তবে, সর্ব্বদা সমীপস্থ হইয়া না থাকিতে পারিলেও চলে না। সুতরাং উপাসনা ভিন্ন অন্য গতি নাই।

যখন নিঃস্ব ও নিঃসম্বল উপায়বিহীন মানব প্রভুর দাসত্ব করিয়া বিনা প্রার্থনায় সংখ্যাতীত দান পাইতে থাকে, এবং আপনাকে সৌভাগ্য গর্ব্বের উচ্চ শিখরে অধিরূঢ় দেখিতে পায়, তখন কৃতজ্ঞতাভরে তাহার হৃদয় অবনত হইয়া পড়ে। তখন সে ভাবিতে থাকে, যিনি এই দীন হীন ভিকারীর প্রতি এত দয়া করিলেন; এই ঘৃণিত মহারোগগ্রস্ত শরীর যাঁহার পবিত্র হস্তে স্পর্শ করিলেন এবং স্বয়ং সমস্ত পাপ মলিনতা প্রক্ষালন করিয়া দিলেন; সংসারের সকল অভাব সকল যাতনা হইতে মুক্ত করিয়া দিলেন; এত দয়া এত ভাল বাসা যাহাঁর তাহাঁকে কি কিছুই দিব না? এই চিন্তা করিয়া যখন সে প্রভুর দানের প্রতিশোধ করিবার মানসে আপন অধিকৃত বস্তুনিচয়ের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়, তখন দেখিতে পায়, তাহার নিজের কিছুই নাই। যাহা কিছু আছে সে সমস্তই সেই প্রভুর। নিজের শরীরটি পর্য্যন্ত সেই প্রাণরূপী ঈশ্বরের চরণে বিক্রীত। এই অবস্থায় ভৃত্যরূপী সাধক হৃদয়ের বেগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া একবার যোড় হস্তে প্রভুর নিকটে দাঁড়াইয়া চক্ষুর জল দিয়া তাঁহার পাদ প্রক্ষালন না করিয়া থাকিতে পারে না। এই জন্য ধ্যানের প্রয়োজন। ধ্যানের পূর্ব্বে আরাধনা অর্থাৎ স্বরূপ আলোচনা এবং কৃতজ্ঞতা, ও ঈশ্বরের সহবাস সুখ স্থায়ী রাখিবার জন্য প্রার্থনার প্রয়োজন।

তৃতীয়তঃ, ঈশ্বর যিনি আমাদিগের উপাস্য দেবতা, তিনি নিরাকার অতীন্দ্রিয়। যে স্থানে ইন্দ্রিয়সুখের প্রবেশাধিকার নাই, তাহা আমরা সহসা আয়ত্ত করিতে পারি না। আমরা যখন মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হই, তখন হইতে সমুদায় কার্য্য ইন্দ্রিয়গণের সাহায্য লইয়া সম্পন্ন করি। সুতরাং ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয়ের সঙ্গে আমাদিগের যেরূপ ঘনিষ্ঠতা জন্মে, অতীন্দ্রিয় পরমেশ্বরের সঙ্গে সেরূপ জন্মে না। ঈশ্বর অতীন্দ্রিয়, এ জন্য জ্ঞান চক্ষু না ফুটিলে তাঁহাকে অনুভব করা যায় না। বাল্যকালে জ্ঞানের উন্মেষ অধিক হয় না। সুতরাং আমরা বাধ্য হইয়া প্রথমতঃ কেবল গৃহপ্রাচীরের মধ্যবর্ত্তী পদার্থনিচয়ের সঙ্গেই আত্মীয়তা স্থাপন করিতে প্রবৃত্ত হই। কোনটি দর্শন, কোনটি রসন, কোনটি আঘ্রাণ, কোনটি শ্রবণ করিয়া থাকি। যত ইহাদিগের সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যের প্রতি মনোযোগ প্রদান করি, ততই ইহারা আমাদি-গকে আপনার অভিমুখে বলে আকর্ষণ করিতে থাকে। ইহাদিগের সঙ্গে ইন্দ্রিয়গণের নিকট সম্পর্ক, আবার ইন্দ্রিয়-গণের সঙ্গে আমাদিগের অতি নিকট সম্পর্ক। তদনুসারে ইহারা ইন্দ্রিয়দিগকে সর্ব্বদাই আপন অভিমুখে আকর্ষণ করে, ইন্দ্রিয়গণ আবার আমাদিগকে লইয়া সেই অন্ধকার-ময় পথে গমন করিতে থাকে। যৌবনকালে জ্ঞানের উন্মেষ হইলেও আমরা সহসা সে স্রোতের গতিরোধ করিতে পারি না। সুতরাং তখন আমরা বাধ্য হইয়া অজ্ঞাত

সারে ঈশ্বরের হইতে বহু দূরে চলিয়া যাই। অতঃপর বিশেষ জ্ঞানালোচনা না করিয়া আর ঈশ্বরের দিকে অগ্রসর হইতে পারি না। প্রথমতঃ জ্ঞানালোচনা দ্বারা ঈশ্বরের স্বরূপ, সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য, ও মহত্ত্ব প্রভৃতি অবগত হই। তৎপর উপাসনাসম্ভূত প্রীতি ও পবিত্রতা দ্বারা তাঁহাকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া রাখিতে চেষ্টা করি। নতুবা কেবল মাত্র জ্ঞান লইয়া ঈশ্বরের আদিষ্ট পথে স্থির থাকা যায় না। কেন না জ্ঞান দ্বারা কেবল জ্ঞাতব্য বিষয় জানা যায় মাত্র, কিন্তু ধরিয়া রাখা যায় না। অতএব উপাসনা চাই। উপাসনা ব্যতীত ইন্দ্রিয়াতীত প্রাণস্বরূপ ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হওয়া অসম্ভব, পাইলেও তাঁহাকে ধারণ করিয়া রাখিবার জন্য প্রীতি ও পবিত্রতা, ভক্তি ও বিনয়, আশা ও বিশ্বাস প্রভৃতি অভ্যাস করা চাই। ইহার সঙ্গে সঙ্গে আবার চিন্তা ও যত্নের সামঞ্জস্য রক্ষা করাও চাই। এই চিন্তা ও যত্নই উপাসনার মূল। জ্ঞান ব্যতীত ইহাদিগের মূলাধার বিশ্বাস জন্মে না। বিশ্বাস ভিন্ন উপাসনা হয় না। উপাসনা না করিলে কর্ত্তব্য জ্ঞান পরিস্ফুট হয় না।

উপাসনা করিলে জ্ঞানের অনায়ত্ত বিষয়সকলও সুস্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় এবং বিশ্বাসের মূলে দৃঢ়তা আনিয়া দিয়া তাহাকে স্বর্গীয় বলে বলীয়ান্ করে। আমরা নিরাকার, আমাদিগের প্রভুও ইন্দ্রিয়াতীত। নিরাকার প্রভুকে লাভ করিতে হইলে নিরাকার আত্মার যোগ চাই, নতুবা তাঁহাকে

পাওয়া অসম্ভব। কেন না ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জড় পদার্থ তাঁহাকে জানিতে অসমর্থ। জানিতে না পারিলে ধারণ করিব কিরূপে? অতএব উপাসনা চাই, উপাসনা ভিন্ন ঈশ্বর প্রাপ্তির অন্য পথ নাই।

চতুর্থতঃ, উপাসনা করিলে আদেশ প্রাপ্ত (অনুপ্রাণিত) হওয়া যায়। উপাসনা করিতে না পারিলে, পরমাত্মার সহিত প্রগাঢ় যোগে সম্বদ্ধ হইতে না পারিলে, আদেশ পাইবার অন্য উপায় নাই। চিত্তের প্রশস্ততা, মনের একাগ্রতা, ইন্দ্রিয় সংযম, এই সকল যোগশীলতার প্রথম উপায়। যে আত্মা এই সকল অভ্যাস করিয়া যোগী হইয়াছে, সেই আত্মা ঈশ্বর কর্তৃক অনুপ্রাণিত, সেই আত্মাই প্রবল পরাক্রমের সহিত সংসারে কার্য্য করিতে সক্ষম। অনাদিষ্ট জীবন কেবল উদ্দেশ্যবিহীন কুলালচক্রের ন্যায় পরিচালিত হইয়া সংসারে ভ্রমণ করে মাত্র। মনুষ্যজীবনে তাদৃশ উদ্দেশ্যবিহীনতা বড়ই বিড়ম্বনা। সংসারে কর্ত্তব্য অসীম। এক জীবনে সমুদায় কর্ত্তব্য পালন করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। এ স্থলে আপন জীবনের লক্ষ্য স্থির করিয়া লওয়া নিতান্ত আবশ্যক। ঈশ্বর আদেশ ঐ লক্ষ্য স্থির হইবার মূল। সুতরাং উক্ত আদেশই জীবনের অভিনেতা। বিবেক এই প্রত্যাদেশলাভের দ্বার। বিবেকের মধ্য দিয়াই আমরা ঈশ্বরাদেশ প্রাপ্ত হইয়া থাকি। আদেশ প্রাপ্ত হইলে কার্য্য অকার্য্য বলিয়া এবং অকার্য্য কার্য্য বলিয়া ভ্রম জন্মিতে

পারে না। উপাসনা ব্যতীত, প্রগাঢ় যোগশীলতা ব্যতীত আদেশ প্রাপ্ত হওয়া অসম্ভব। আদেশ না পাইলেও বিবেক অপরাজের প্রভাবে কার্য্য করিতে পারে না। যদি মনুষ্য হইয়া কার্য্যাকার্য্য বিষয়ে ভ্রান্তি জন্মিবার সম্ভাবনা রহিল, তবে মনুষ্য হইয়া আর ফল কি দর্শিল! উপাসনার প্রয়োজনীয়তা-সম্বন্ধে এইরূপ আরও অনেক হেতুবাদ প্রদর্শিত হইতে পারে, কিন্তু বহুতর হেতু দর্শাইতে গেলে নিরর্থক প্রস্তাব বৃদ্ধি হইয়া পড়ে। যিনি বস্তুতঃ ধর্ম্মের জন্য ঈশ্বরের জন্য লালায়িত, তাঁহার বুঝিবার ইচ্ছা স্বভাবতই প্রবল। সুতরাং হেতু অল্প হইলেও তিনি অবশ্যই উপাসনার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিবেন; এবং অতি সহজে বুঝিবেন যে উপাসনাই মনুষ্য জীবনের একমাত্র অবলম্বন, উপাসনাই মনুষ্যাত্মার অন্নপান। শরীর যেমন অন্নপান ব্যতীত ক্রমে ক্রমে ধ্বংস পায়, আত্মাও সেইরূপ উপাসনাবিহীন হইলে ক্রমে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। শরীর যেমন অন্নপান দ্বারা সুস্থ ও সবল হইতে থাকে, আত্মাও সেইরূপ উপাসনা দ্বারা সুস্থ ও সবল হইয়া উঠে। শরীর সুস্থ থাকিলে যেমন সহজে ক্ষুধা তৃষ্ণা জন্মে, সহজে ক্ষুধা তৃষ্ণা জন্মিলে যেমন অন্নপানের প্রতি সুন্দর রুচি থাকে, সেইরূপ আত্মা সুস্থ ও প্রকৃতিস্থ থাকিলেই আপন অভাব অতি সহজে বুঝিতে পারে। অভাব বোধ থাকিলেই প্রতিদিন প্রতিমুহূর্ত্তে উপাসনা করিতে প্রবৃত্তি জন্মে। উপাসনা একদিন কি দুই দিনের জন্য নহে;

এক মুহূর্ত্ত কি দশ মুহূর্ত্তের জন্যও নহে, কিন্তু সমস্ত জীবন ইহকাল ও পরকাল ব্যাপিয়া উহা উপভোগ করা চাই। যেমন একদিন ভোজন করিলে দশ দিন সুস্থতার আশা নাই, সেইরূপ একদিনের উপাসনায় মনুষ্য নিরাপদ হইতে পারে না। আত্মা সুস্থ ও প্রকৃতিস্থ থাকিলে একদিনও উপাসনা ব্যতীত অতিবাহিত করা দুষ্কর।

ভোজনে অরুচি জন্মিলে যেমন নিশ্চয় বুঝা যায় যে শরীরের অভ্যন্তরে কোন রোগ প্রবেশ করিয়াছে, এবং সেই রোগে দিন দিন শরীর জীর্ণ শীর্ণ হইয়া যাইতেছে, সেইরূপ যদি উপাসনাতে আমার অরুচি জন্মে, তবে নিশ্চয় বুঝিতে হইবে, আত্মার মূলে কোন প্রবল রোগ প্রবেশ করিয়াছে; এবং এই কারণেই আত্মার জীবন ধারণের উপায় যে উপাসনা, তাহাতে তাহার অনিচ্ছা জন্মিয়াছে। এই সময়ে সাবধান হওয়া নিতান্ত আবশ্যক, এবং অতি সতর্কতার সহিত রোগ নির্ণয় করা প্রয়োজনীয়। স্বয়ং রোগ নিশ্চয় করিতে না পারিলে উপযুক্ত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া চাই, আলস্য করিলে মৃত্যুর আশঙ্কা আছে। এ রোগের প্রকৃত চিকিৎসক কে? এক ঈশ্বর, দ্বিতীয় সাধু। আত্মার দুরবস্থা বুঝিতে পারিলে অনতিবিলম্বে প্রভুর চরণতলে পতিত হইয়া মনের দুঃখ প্রকাশ করিতে হইবে। কাতর ভাবে সরল হৃদয়ে প্রভুর প্রতি তাকাইলে, তিনি পাপীর অবস্থা বুঝেন এবং কৃপা করিয়া সন্তানের হৃদয়

নিহিত শৈল্য উদ্ধার করিয়া দেন। যদি এরূপ দশা ঘটে যে মলিনতা পাপ ও চাঞ্চল্য আসিয়া চিত্তের গতি অস্থির করিয়া দেয়, সহজে আর ঈশ্বরের দিকে তাকাইবার শক্তি না থাকে, তবে সাধুদিগের পবিত্র চরণের শরণাপন্ন হওয়া আবশ্যক। তাঁহারা ইহার গূঢ় কারণ ও প্রকৃতি বলিয়া দিতে পারেন। কেন না তাঁহাদিগের জীবনও এইরূপ দুরবস্থা অতিক্রম করিয়াই সাধুতা লাভ করিয়াছে।

যে সকল উপায়ের কথা উল্লেখ করা গেল, পূর্ব্বকালের ঋষিগণ এই সকল উপায় অবলম্বন করিয়াই জীবনের পবিত্রতা রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন; এবং উপাসনা বা যোগ-শীলতা দ্বারাই তাঁহারা এতাদৃশ উচ্চ জীবন পাইয়াছিলেন যে আমরাও সেইরূপ হইব বলিয়া মনে করিতেও সঙ্কোচ করি। যদিও পূর্ব্বতন ঋষিগণের জীবন অতি উচ্চ আদর্শে সংগঠিত হইয়াছিল, যদিও আমাদিগের পাপ দূষিত আত্মা তাঁহাদিগের অধিকৃত স্থান স্পর্শ করিতেও সঙ্কোচ করে, তথাপি আমরা আবার ইহাও দেখিতে পাই যে তাঁহারাও সকল সময়ে নিরাপদ হইতে পারেন নাই। তাঁহাদিগেরও পতনের ভয় ছিল এবং মনুষ্য মাত্রেরই পতনের ভয় থাকিবে। ঋষিগণ যোগভ্রষ্ট হইলে, উপাসনা শূন্য হইলেই অধঃপতিত হইতেন। তখন পদে পদে তাঁহাদিগের ভ্রান্তি জন্মিত, সুতরাং সহস্র সহস্র আকার্য্য কার্য্য বলিয়া বুঝিতেন। ইহা দ্বারা প্রমাণ হইতেছে, যাঁহারা এই পৃথিবীতে ধার্ম্মিক

চূড়ামণি বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন, তাঁহাদিগেরও ভয় ছিল সুতরাং মানুষ মাত্রেরই ভয় থাকিবে নিশ্চিত। ভয় থাকিলেই সাবধানতা থাকা আবশ্যক। সাবধানতার জন্যই আবার উপাসনাও আমাদিগের অন্নপানের ন্যায় অপরিহার্য্য। কেবল অপরিহার্য্য নহে, কিন্তু অবিচ্ছেদে সমস্ত জীবনের উপভোগ্য। যত অধিক অন্ন পরিপাক করিতে পারিব, দেহ ততই হৃষ্ট পুষ্ট বলিষ্ঠ ও কার্য্যক্ষম হইয়া উঠিবে। আত্মাও সেইরূপ যত অধিক উপাসনা পরিপাক করিতে পারিবে, ততই স্বর্গীয় বলে বলিয়ান্ হইয়া উঠিবে। জ্ঞানাভিমানীদিগের অগ্রগণ্য মিলও স্বীকার করিয়াছেন যে "ধার্ম্মিক ও বিশ্বাসীদিগের উচ্চ জীবন কেবল উপাসনা দ্বারা সংগঠিত হইয়া থাকে।"

উপাসনার পাত্র *।

ইতিপূর্ব্বে উপাসনার প্রয়োজনীয়তা প্রদর্শিত হইয়াছে। এখন জানা আবশ্যক, সেই উপাসনার পাত্র কে, কাহার সন্তোষের জন্য আমরা অকুণ্ঠিত চিত্তে জীবন সমর্পণ করিতে পারি, কাহার হস্তে জীবনের সমস্ত ভার বিন্যস্ত করিয়া আমরা নিশ্চিন্ত হইতে পারি? কে আমাদিগের

* "নাপাত্রেনিহিতা কাচিৎ ক্রিয়া ফলবতী ভবেৎ।"

এমন বন্ধু ? কে আমাদিগের প্রার্থনার অপেক্ষা না করিয়া আপনা হইতে সুখের ভাণ্ডার খুলিয়া দেন ? যিনি “সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম” যিনি “আনন্দরূপমমৃতং” যিনি “শান্তং শিবমদ্বৈতং”, যিনি “শুদ্ধমপাপবিদ্ধং, তিনি।

এই যে সকল শব্দ উল্লেখ করা গেল, ইহার প্রত্যেকটি শব্দ অতি গভীর অর্থে পরিপূর্ণ। সুতরাং সেই সকল অর্থ অতি অল্প মাত্রায়ও বিবৃত হওয়া উচিত। কেন না লোক-চরিত্র চির কাল সাক্ষ্যদান করিতেছে, মনুষ্য একটি মাত্র শব্দকে আপন রুচি ও মনোভাব অনুসারে নানা ভাবের ও অর্থের দ্যোতকরূপে প্রতিপন্ন করে। অতএব নিম্ন লিখিতপ্রকারে ঐ সকল শব্দের অর্থ করা যাইতেছে।

উপাস্য সত্যস্বরূপ। যিনি সমস্ত দেশ ও কালে বিদ্যমান থাকিতে অসমর্থ, তিনি মনুষ্যের উপাস্য হইবার অযোগ্য। একটি সূর্য্যের সঙ্গে যত গ্রহ ও উপগ্রহের সম্বন্ধ আছে—এক সূর্য্যের আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া যাহারা স্থির ভাবে চলিতেছে বা অবস্থান করিতেছে—এক সূর্য্যের আলোকে যাহারা আলোকিত হইতেছে ও সজীব রহিয়াছে—তাহাকে সৌরজগৎ বলা যায়। এইরূপ অসংখ্য অগণ্য সৌরজগৎ যাঁহার সত্তাতে প্রতিষ্ঠিত নহে, ও যাঁহার আশ্রয়ে আশ্রিত হইয়া থাকিতে পারে না, এবং সেই সকল জগৎস্থ প্রত্যেক পরমাণু যাঁহার সন্নিকর্ষ লাভ করিতে সমর্থ নহে, যিনি এই সমস্ত জগতের মূলাধার নহেন,

তিনি উপাস্য হইবার অযোগ্য। সত্যভাবপূর্ণ উপাস্য ব্যতীত জগতের কার্য্য অচল হয়, এবং মনুষ্যেরও আশা পূর্ণ হইতে পারে না। যিনি পৃথিবীতে আছেন, কিন্তু চন্দ্র লোকে নাই, তিনি চন্দ্রলোকের কার্য্য করিতে অক্ষম। আবার যিনি চন্দ্রে আছেন, পৃথিবীতে নাই, তিনিও পৃথিবীর কার্য্য করিতে অসমর্থ। অথবা যিনি কেবল এক দেশে আছেন, অন্য দেশে নাই, তিনিও আপন অনায়ত্ত দেশের সংবাদ লইতে পারেন না। আবার যিনি এখন আছেন, পূর্ব্বে ছিলেন না, তিনি তখনকার পক্ষে অন্ধ। যিনি পূর্ব্বে ছিলেন এখন নাই, তিনিও এখনকার পক্ষে অকর্ম্মণ্য। সুতরাং কোন সঙ্কীর্ণ বস্তু সত্য নামের অযোগ্য। যিনি সত্য নামের অযোগ্য, তিনি মনুষ্যের উপাস্য হইবারও অযোগ্য *।

---

* "তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে। তদন্তরস্য সর্ব্বস্য তদু সর্ব্বস্যাস্য বাহ্যতঃ॥ ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।" ঈশোপনিষৎ।

তিনি চলেন তিনি চলেন না। তিনি দূরে তিনি নিকটে। তিনি সকল জগতের অন্তরে, তিনি সকলের বাহিরে বিদ্যমান রহিয়াছেন। এ জগতে জগৎ বলিতে যাহা কিছু বুঝিতে পারা যায়, তাহা সমুদায় ঈশ্বর কর্ত্তৃক ব্যাপ্ত ও পরিপূর্ণ রহিয়াছে।

" প্রাণোহ্যেষ যঃ সর্ব্বভূতৈর্বিভাতি বিজানন্ বিদ্বান্ ভবতে নাতিবাদী।" মুণ্ডকোপনিষৎ।

উপাস্য জ্ঞান স্বরূপ। উপাস্য যদি জ্ঞান স্বরূপ না হন, তবে তিনি জগৎকে সামান্য বা বিশেষ কোন রূপেই

ইনি সকলের প্রাণস্বরূপ, যিনি সর্ব্বভূতে প্রকাশ পাইতেছেন। জ্ঞানী ব্যক্তিরা ইহাঁকে অতিক্রম করিয়া কথা বলেন না।

"তন্দুর্দ্দর্শং গূঢ়মনুপ্রবিষ্টং গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং পুরাণং।"
"এষ সর্ব্বেষু ভূতেষু গূঢ়োত্মা ন প্রকাশতে।" কঠোপনিষৎ।

তিনি ইন্দ্রিয়াতীত, সুতরাং দুর্দ্দর্শ। তিনি চন্দ্র, সূর্য্য ও পৃথিবী প্রভৃতি সকল বস্তুতে গূঢ়রূপে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছেন। তিনি আত্মাতে স্থিতি করেন, ও অতি নিগূঢ় স্থানেও বাস করেন। তিনি নিত্য।—এই চিৎ স্বরূপ পরমাত্মা সমুদায় প্রাণিমধ্যে প্রচ্ছন্নরূপে অবস্থিতি করিতেছেন।

"এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি! দ্যাবাপৃথিব্যৌ বিধৃতে তিষ্ঠতঃ।" বৃহদারণ্যক।

হে গার্গি! এই অবিনাশী পুরুষের শাসনে দ্যুলোক ও ভূলোক বিধৃত হইয়া অবস্থান করিতেছে।

স বা অয়মাত্মা সর্ব্বেষাং ভূতানামধিপতিঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং রাজা তদ্‌যথা রথনাভৌ চ নেমৌ চারাঃ সর্ব্বে সমর্পিতা এবমেবাস্মিন্নাত্মনি সর্ব্বাণি ভূতানি সর্ব্ব এত আত্মানঃ সমর্পিতাঃ।" বৃহদারণ্যক।

সেই পরমাত্মা সকলের অধিপতি ও সকলের রাজা। যেমন রথচক্রের নাভি ও নেমিদেশে অর সকল সংযুক্ত থাকে, তদ্রূপ এই পরমাত্মাতে সমুদায় প্রাণী ও সকল আত্মা সমর্পিত রহিয়াছে।

জানিতে পারেন না। বিশেষ ও সামান্য ভাবে উপস্থিত জাগতিক ঘটনাবলী না জানিলে জগতের কার্য্য অচল হইয়া পড়ে।

যিনি আমাকে জানেন কিন্তু সমস্ত পৃথিবীকে জানেন না; যিনি কেবল পৃথিবীকে জানেন, কিন্তু চন্দ্র সূর্য্য, গ্রহ নক্ষত্র প্রভৃতি জড় ও তত্রত্য জীবসকলকে জানিতে অসমর্থ; এবং প্রত্যেক প্রাণীর প্রাণযাত্রা নির্ব্বাহ করিবার উপযুক্ত আয়োজন যাঁহার হস্তে নাই; যিনি একটি কীটাণুকেও বিস্মৃত হইয়া থাকিতে পারেন; যিনি প্রকাশ্য ও রহস্য সকল বিষয়ের মর্ম্ম অবগত হইতে অসমর্থ; আমাদিগের আন্তরিক গুহ্য বৃত্তান্ত সকল জানিবার যাঁহার শক্তি নাই,—তিনি অসর্ব্বজ্ঞ, তাঁহাকে বলিয়া জানাইতে হয়, তিনি আপনা হইতে কিছু জানিতে পারেন না। আমরা যে মুহূর্ত্তে কোন সংকল্প করি, চিন্তা করি বা আলোচনা করি—(তাহা পাপ হউক, বা পুণ্য হউক) সেই মুহূর্ত্তে যিনি জানিতে অক্ষম; তাঁহার জ্ঞান পরিমিত সুতরাং দেশকালসাপেক্ষ। যিনি অল্প, তিনি জগতের শাস্তা হইবার অযোগ্য; এবং মনুষ্যের দুঃখ দূর করিয়া বিমল শান্তি প্রদান করিতে অসমর্থ। যাঁহার জ্ঞান অনুসন্ধানসাপেক্ষ, তিনি অন্যের দুরবস্থার মধ্যে প্রবেশ করিতে অক্ষম। যিনি এইরূপ অল্পজ্ঞ, তাঁহাকে নিরবচ্ছিন্ন জ্ঞানস্বরূপ বলা যাইতে পারে না। অসীম জ্ঞানশক্তিসম্পন্ন কোন মহান্ পুরুষ ব্যতীত এই বিশাল

বিশ্বরাজ্যের শাসনকার্য্য চলে না; এবং আমাদিগেরও আশা পূর্ণ হইতে পারে না। যিনি আশা পূর্ণ করিতে অসমর্থ, তিনি উপাস্য হইবারও অযোগ্য *।

উপাস্য অনন্ত। অনন্ত কি? যাহার অন্ত বা সীমা নাই। কোন অন্তবৎ বস্তু মনুষ্যের উপাস্য হইতে পারে না। যাহার আদি ও অন্ত আছে তাহা সত্য নামের অযোগ্য। যিনি গুপ্ত ও প্রকাশিত সকল তত্ত্ব অবগত নহেন, সেই পরিমিতজ্ঞানসম্পন্ন পাত্র কখন প্রকৃত জ্ঞানশব্দের বাচ্য

---

* "য একোঽবর্ণো বহুধা শক্তিযোগাদ্বর্ণাননেকান্নিহিতার্থো দধাতি। বিচৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ স দেবঃ।" শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ।

যিনি এক এবং বর্ণহীন এবং যিনি প্রজাদিগের প্রয়োজন জানিয়া বহু প্রকার শক্তিযোগে বিবিধ কাম্য বস্তু বিধান করিতেছেন, সমুদায় ব্রহ্মাণ্ড আদন্তমধ্যে যাঁহাতে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে, তিনি দেদীপ্যমান পরমেশ্বর।

"যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্মনোমতং। তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥" তলবকারোপনিষৎ।

মন দ্বারা যাঁহাকে মনন করা যায় না, যিনি মনের প্রত্যেক মননকে জানেন, তাঁহাকেই তুমি ব্রহ্ম বলিয়া জান; লোকে যে কিছু পরিমিত পদার্থের উপাসনা করে, তাহা কখন ব্রহ্ম নহে।

" যো বিশ্বাভি বিপশ্যতি ভুবনা। সং চ পশ্যতি স নঃ পুরাবিতা ভুবৎ॥" ঋগ্বেদসংহিতা।

যে প্রতিপালক পরমেশ্বর সকল লোক ও সমুদায় জগৎ বিশেষরূপে দেখিতেছেন, তিনি আমাদিগকে রক্ষা করুন।

নহেন। যিনি সত্য ও জ্ঞানস্বরূপ তিনি অনন্ত না হইয়া পারেন না *। যাহা অদ্য আছে, কল্য থাকিবেক না, তাহা কি মনুষ্যের উপাস্য হইতে পারে? মনুষ্যজীবন অনন্ত কাল স্থায়ী, তাহার আশাও বর্দ্ধনোন্মুখী। যে অন্তবৎ, সে কিরূপে সেই আশা পূর্ণ ও সেই জীবন তৃপ্ত করিতে পারে? যিনি একবার সন্তুষ্ট, আবার বিরক্ত, যিনি এক জনকে প্রীতি, অপরকে বিদ্বেষ না করিয়া পারেন না, যিনি কতক বিষয় বুঝেন, কিন্তু সমস্ত বিষয় বুঝিতে অসমর্থ,

---

"যদৈতমনু পশ্যত্যাত্মানং দেবমঞ্জসা। ঈশানং ভূতভব্যস্য ন ততো বিজুগুপ্সতে॥" বৃহদারণ্যক।

ধীর ব্যক্তি প্রকাশবান্ পরমাত্মাকে সুন্দররূপে দর্শন করেন। কেহই সেই কালত্রয়দর্শী পরমেশ্বর হইতে আপনাকে প্রচ্ছন্ন করিয়া রাখিতে পারে না।

"একোহমস্মীত্যাত্মানং যত্ত্বং কল্যাণ মন্যসে। নিত্যং স্থিতস্তে হৃদ্যেষ পুণ্যপাপেক্ষিতা মুনিঃ॥" মনু।

হে ভদ্র! আমি একাকী আছি, এই যে তুমি মনে করিতেছ, ইহা মনেঃ করিবে না। কারণ এই পুণ্যপাপদর্শী সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ তোমার হৃদয়ে নিত্য স্থিতি করিতেছেন।

* "তদ্বা এতদক্ষরং গার্গ্যদৃষ্টং দ্রষ্টৃ শ্রুতং শ্রোত্রমতং মন্তৃ বিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতৃ নান্যদতোঽস্তি মন্তৃ নান্যদতোঽস্তি বিজ্ঞাত্রেতস্মিন্ খল্বক্ষরে গার্গ্যাকাশ ওতশ্চ প্রোতশ্চেতি"। বৃহদারণ্যক।

হে গার্গি! এই অবিনাশী পরমেশ্বরকে কেহ দর্শন করে নাই, কিন্তু তিনি সকলকেই দর্শন করেন। কেহ তাঁহাকে

কিছু বুঝিবার জন্য যাঁহাকে অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতে হয় এবং পাত্রাপাত্র ও কার্য্যাকার্য্য নির্দ্দেশের জন্য পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনার সঙ্গে পরবর্ত্তী ঘটনার যোগ করিতে হয়, যিনি একটি কার্য্য করিতে পারেন অপরটি করিতে গিয়া দোষে লিপ্ত হন, সুতরাং কখন শক্তি কখন ত্রুটি প্রকাশ পায়—এরূপ ব্যক্তি উপাস্য হইতে পারেন না। এরূপ বস্তুতে মনুষ্যাত্মার অভাব ঘুচিবার কিছু নাই। সুতরাং তৎপ্রতি তাহার লোভ জন্মিতে পারে না ; এবং তাহার নিকট কিছু চাহিবারও ইচ্ছা জন্মে না। অতএব এরূপ বস্তুর নিকট মস্তক অবনত করিলে মনুষ্যের অবমাননা হয়। বস্তুতঃ যাহা অত্যন্ত অভাবান্বিত, যাহার পদে পদে ত্রুটি, যাহার বৈরূপ্য দেখিলেই মনে বিরাগ জন্মে, তাহা দ্বারা কি মানুষের আশা পূর্ণ হয়? যাহা হয় না ও হইতে পারে না, তাহা হইবে কিরূপে ? যাহার বস্তুতঃ কোন সম্পদ নাই সে আবার দান করিবে কিরূপে ?

প্রেম ও অভাবের জন্য উপাসনা। কিন্তু যাহাকে দেখিলে বা মনে করিলেই বিরক্তি জন্মে, তাহার প্রতি প্রেম হওয়া অসম্ভব ; এবং যাহার নিকটে কিছুই পাইবার আশা নাই,

---

শ্রবণ করে নাই, কিন্তু তিনি সকলকেই শ্রবণ করেন। কেহ তাঁহাকে মনন করিতে সমর্থ হয় নাই, কিন্তু তিনি সকলকেই মনন করেন। কেহ তাঁহাকে জ্ঞাত হয় নাই, কিন্তু তিনি সকলকেই জানেন। হে গার্গি! আকাশ এই অবিনাশী পরমেশ্বরেতে ওতঃ প্রোতো ভাবে ব্যাপ্ত রহিয়াছে।

তাহার নিকটে আশা করে কে? অতএব যিনি অনন্ত প্রেমের ও সৌন্দর্য্যের আধার, যাঁহার প্রেম ও দয়া সহস্র সহস্র কোটি কোটি বিরুদ্ধাচরণেও পরাজিত হয় না, যিনি গুপ্ত ব্যক্ত সকল বিষয় অবগত আছেন, ভূত ও ভবিষ্যৎ যাঁহার নিকট বর্ত্তমানে পরিণত, যাঁহার প্রত্যেক কার্য্যে শক্তি ও প্রত্যেক ঘটনাতে মঙ্গলভাব দেদীপ্যমান প্রকাশ পায়, যিনি পূর্ব্বেও ছিলেন এবং পরেও থাকিবেন, যিনি বাক্য মনের অতীত, তিনি উপাস্য। তাঁহারই দ্বারা মনুষ্যের অভাব ঘুচিতে পারে।

উপাস্য ব্রহ্ম। ব্রহ্ম কি? যাহা অপেক্ষা বড় নাই, সমস্ত বিশ্বরাজ্য যাঁহার শাসনে শাসিত, তিনি ব্রহ্ম। যিনি অনন্ত, তিনি অবশ্যই ব্রহ্ম, অবশ্যই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ, ইহাতে আর সংশয় নাই। এই ব্রহ্মত্ব কেবল এক বিষয়ে নহে, কিন্তু সত্তাতে, শক্তিতে, জ্ঞানেতে, প্রেমেতে, দয়াতে, এবং সমস্ত সদ্ভাবে *।

উপাস্য আনন্দ স্বরূপ †। মনুষ্যের নানা বিষয়ে অভাব।

---

* "দিবৌ ভূমৌ তথাকাশে বহিরন্তশ্চ মে বিভুঃ। যো বিভাত্যবভাসাত্মা তস্মৈ সর্ব্বাত্মনে নমঃ"। যোগবাশিষ্ঠ।

যিনি স্বর্গে, ভূমিতে, আকাশে ও আমার অন্তরে বাহিরে প্রকাশিত আছেন, সেই সর্ব্বপ্রকাশকারী পরমাত্মাকে নমস্কার করি।

† আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে আনন্দেন জাতানি জীবন্তি আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি।

তাহার জ্ঞান, প্রেম ও পবিত্রতা সকলই অতি অল্প, সুতরাং মানুষ সর্ব্বদাই শোকমোহে ডুবিয়া থাকিবে নিশ্চিত। শোকমোহে পরিব্রুত সেই মানুষ যাঁহার উপাসনা করিবে তাঁহার আনন্দময় না হইলে চলিবে কেন? আনন্দস্বরূপ ভিন্ন কাহার শোক মোহ ঘুচাইবার শক্তি আছে? যিনি শোক মোহের অতীত, স্বর্গরাজ্যের রাজা, যিনি ভিন্ন চির আনন্দ চির সুখ আর কাহারও থাকিতে পারে না, তিনিই কেবল আমাদিগের শোক মোহ নিরসন করিতে সক্ষম যাঁহার শোক আছে মোহ আছে বিষাদ ও ভয় আছে, তিনি কখন উপাস্য দেবতার উপযুক্ত নহেন। কেন না যাহার প্রতি সর্ব্বদা শোকমোহাদির আধিপত্য, সে কি অপরকে সুখী করিতে পারে? যিনি জ্ঞানস্বরূপ, তাঁহার ভ্রান্তি হওয়া অসম্ভব। ভ্রান্তি না থাকিলে শোক মোহাদি আসিতে পারে না। যিনি অনন্ত প্রেম, অনন্ত দয়া, অনন্ত শক্তি ও স্নেহের আধার, তাঁহাতে চির আনন্দ থাকিবেই থাকিবে। এক মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহাতে নিরানন্দ স্থান পাইতে পারে না, নিরানন্দ না আসিলেও সুখের অভাব হয় না।

উপাস্য অমৃতস্বরূপ। যে বস্তু মৃত্যু বা বিনাশশীল, সে মনুষ্যের উপাস্য হইতে পারে না*। মনুষ্যাত্মা নিজে অবিনাশী; সে কি মরণধর্ম্ম উপাস্যের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া

* "যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাম্॥"

সুখী হইতে পারে? যদি না পারে, তবে মনুষ্যের উপাস্য অমৃত ভিন্ন আর কিছু হইতে পারে না। উপাসক মৃত্যুভয়ে ভীত, সেই মৃত্যুভয় বিনাশ করাই উপাসনার মুখ্য উদ্দেশ্য। যাহার মৃত্যুভয় নিবারণ করিবার ক্ষমতা নাই, যে পদে পদে মৃত্যুকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইতেছে, তাহার উপাসনা করিয়া লাভ কি? যাহাতে কোন ফল নাই, তেমন কার্য্যে কেহ কখন প্রবৃত্ত হয় না *।

উপাস্য শান্তস্বরূপ। জগৎ পরিবর্ত্তনশীল, আজ যাহা এক ভাবে আছে, কল্য তাহার ভাবান্তর হইবে। এই মুহর্ত্তে একটি বস্তুকে যে ভাবে দেখিতেছি, পর মুহূর্ত্তে তাহাকে সে ভাবে দেখিবার আর আশা নাই। উসা প্রদোষ মধ্যাহ্ন ও নিশীথ প্রভৃতি একের পর এক ক্রমে ক্রমে আসিতেছে ও ক্রমে ক্রমে যাইতেছে; শরৎ হেমন্ত শিশির ও বসন্ত দিনে দিনে পরিবর্ত্তিত হইতেছে†। ইহা-

---

* "প্রয়োজনমনুদ্দিশ্য নমোন্দাহপি প্রবর্ত্ততে।"

† এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে মুহূর্ত্তা অহোরাত্রাণ্যর্দ্ধমাসা মাসা ঋতবঃ সংসৎবরা ইতি বিধৃতাস্তিষ্ঠন্ত্যেতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি! প্রাচ্যোন্যা নদ্যঃ স্যন্দন্তে শ্বেতেভ্যঃ পর্ব্বতেভ্যঃ প্রতীচ্যোহন্যায়াং যাঞ্চ দিশমন্বেতি॥" বৃহদারণ্যক।

হেগার্গি! অবিনাশী ঈশ্বরের শাসনে নিমিষ, মুহূর্ত্ত অহোরাত্র, পক্ষ, মাস, ঋতু, সম্বৎসর বিধৃত হইয়া স্থিতি করিতেছে। হে গার্গি! এই অবিনাশী পরম পুরুষের

দিগের সঙ্গে সঙ্গে জগতের কার্য্যপ্রণালীও রূপান্তরিত হইতেছে, সে পরিবর্ত্তন মুহূর্ত্তের জন্যও বিরাম পায় না। এই রূপ জগতের অপরিহার্য্য চঞ্চল স্বভাব। আবার মনুষ্যসমাজের আন্তরিক গতিরও স্থিরতা নাই। আজ একরূপ কল্য হয়ত আর এক রূপ ধারণ করিবে। পরীক্ষা ও প্রলোভন উপস্থিত হইলে আর সে স্থির ভাবে আপন লক্ষ্য স্থানে অবস্থান করিতে পারে না। পদে পদে বিনাশ * ও পদে পদে তাহার পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইয়া থাকে। মনুষ্য এই পরিবর্ত্তনশীলতার মধ্য দিয়া অক্ষত শরীরে† আপন গম্য স্থানে যাইবার জন্য বাধ্য। কিন্তু তাদৃশ বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করা পরিমিতশক্তিযুক্ত মনুষ্যের অসাধ্য। কেন না মনুষ্য অপেক্ষা তাহার শত্রুপক্ষের বল অধিক। সুতরাং মনুষ্য যদি তাহার নিজের বলের উপরে নির্ভর করিয়া চলে, তবে নিশ্চয় মৃত্যুই তাহার হস্তগত হইবে; অথচ এই সকল বিপদ্ মনুষ্যকে অতিক্রম করিতেই হইবে, না করিলে চলিবে না। অতএব অটল, স্থাণু, অক্ষয় ও অচ্যুত সুতরাং শান্তস্বরূপ উপাস্য

শাসনে অনেকানেক পূর্ব্ববাহিনী ও পশ্চিমবাহিনী নদী সকল শ্বেত পর্ব্বত হইতে নিঃসৃত হইতেছে।

* এ বিনাশ শরীর ধ্বংস নহে, কিন্তু পাপলিপ্তি।

† এ শরীর পার্থিব নহে, কিন্তু অধ্যাত্ম।

দেবতা তাহার পক্ষে নিতান্তই প্রয়োজনীয়। আর এক কথা এই, যাহা কথায় কথায় রূপান্তরিত হয়, পদে পদে যাহার পরিবর্ত্তন, তাহার দ্বারা কদাচ মনুষ্য পূর্ণমনোরথ হইতে পারে না; এবং জগতের কার্য্যও সুন্দররূপে চলিতে পারে না। যে দিন প্রথম সূর্য্য উদিত হইয়া জগৎকে অন্ধকারের করাল গ্রাস হইতে মুক্ত করিয়াছিল, সেই আদিম দিন হইতে আজ পর্য্যন্ত সে একভাবে শূন্যমার্গে লম্বিত থাকিয়া আলোক ও কিরণ বিতরণ করিতেছে; এক নিমেষের জন্যও সে তাহার ব্যতিক্রম করিতে পারে না! *। পৃথিবীও সেই দিন হইতে সূর্য্য মণ্ডলকে প্রতিনিয়ত প্রদক্ষিণ করিতেছে, একবারও তাহার বিশ্রাম করিবার সময় নাই। এইরূপ বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি ও কেতু প্রভৃতি বহুসংখ্যক গ্রহ সূর্য্যমণ্ডলকে প্রদক্ষিণ করিতেছে, অথচ সকলি কেমন নিঃশব্দ ও শান্তভাবে চলিতেছে। যিনি শাস্তা ও এই সকলের নিয়ন্তা, তাঁহার অটল শান্তস্বরূপ হওয়া চাই! নতুবা এই প্রকাণ্ড জগতের শান্তিভঙ্গ হইবার বিচিত্র কি †?

* "এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি! সূর্য্যচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ।" বৃহদারণ্যক।

হে গার্গি! এই অবিনাশী পরমেশ্বরের শাসনে সূর্য্য চন্দ্র বিধৃত হইয়া স্থিতি করিতেছে।

† স প্রাচীনান্ পর্ব্বতান্ দৃংহদোজসা ধরাচীনমকৃণোদপামপঃ। অধারয়ৎ পৃথিবীং বিশ্বধায় সস্তভ্নাম্মায়য়া দ্যামব স্রসঃ॥" ঋগ্বেদ।

এই সকল ব্রহ্মাণ্ড জড়, সুতরাং ইহাদিগের আপনার বল শক্তির নিতান্তই অপ্রতুল। তবে তাহারা জগতের এত মঙ্গল সাধন করিতেছে কিরূপে? অতএব ইহা স্বীকার করা আবশ্যক হইল যে যাঁহার শক্তি অত্রুটিত, যাঁহার নিয়ম অলঙ্ঘ্য, যাঁহার শাসন জড়, প্রাণ, ও আত্মা কেহই অতিক্রম করিতে সমর্থ নহে, সেই শাস্তৃস্বরূপ এই বিশ্বরাজ্যের রাজা এবং তিনিই মনুষ্যের উপাস্য দেবতা।

জড় অপরাধ বুঝে না। মনুষ্য অল্প অপরাধেই বিরক্ত হইয়া উঠে ও উষ্ণতা প্রকাশ করে, কিন্তু উপাস্য যিনি, তিনি কোন অপরাধের জন্য বিরক্ত হইতে পারেন না। তাঁহার স্বভাব চিরকাল অবিকৃত থাকা চাই। দোষদর্শনে বিকৃতি জন্মিলে অনুপযুক্ত বা অতিশয় দণ্ড বিহিত হইতে পারে। সেরূপ হইলে উপাস্যের চলিবে না; উপাস্য বা শাস্তা অপরাধের উপযুক্ত দণ্ড বিধান করিবেন; অথচ সেই দণ্ডে স্নেহ ও মমতা অনুরঞ্জিত থাকিবে। যে দণ্ডে স্নেহ মমতা সূচিত হয়, তাহাতে দণ্ডিত ব্যক্তি কখন বিরক্ত হইতে পারে না, প্রত্যুত কৃতজ্ঞ হয়। সেই দণ্ডকে আপন কৃতাপ-রাধের প্রায়শ্চিত্ত জানিয়া দণ্ডিত আপনা আপনি সংশো-

---

তিনি স্বীয় বলে পর্ব্বতসকল স্থাপন করিয়াছেন, তিনি জলরাশিকে নিয়মগামী করিতেছেন, তিনি বিশ্বধাত্রী পৃথিবীকে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, তিনি স্বীয় কৌশলে সৌরজগৎকে পতন হইতে রক্ষা করিতেছেন।

ষিত হইয়া আইসে। বিকৃতির দণ্ড ক্রোধের দণ্ড তাদৃশ উৎকৃষ্ট ফল প্রদান করিতে পারে না; পরন্তু বিনাশ করিতে সমর্থ। অতএব শান্তস্বরূপ উপাস্য দেবতা ব্যতীত মনুষ্যের আশা পূর্ণ হওয়া অসম্ভব।

উপাস্য শিবস্বরূপ। যাহার জ্ঞান অতি অল্প, প্রেম অতি সঙ্কুচিত, সুতরাং স্বাধীনতার মূল প্রহত, ইচ্ছার মূল শূন্য, তাহার পদে পদে অপরাধ সঙ্ঘটিত হইতে পারে, তাহার বিপদ সংখ্যাতীত হওয়াই সম্ভব। উপাস্য দেবতার মঙ্গল ভাব না থাকিলে, সেই ত্রুটিক্ত মনুষ্য কিরূপে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারে*? আমরা জানি পাপ ও অপরাধ কাহাকে বলে, তথাপি সেই সকল কার্য্য করি; প্রলোভনের হস্ত হইতে আত্ম রক্ষা করিতে পারি না। জানি অতি ভোজনে আলস্য বৃদ্ধি করে, বুদ্ধির জড়তা জন্মায়, তথাপি অতি ভোজন করি, জানি শারীরিক ও মানসিক উভয়বিধ নিয়ম সাক্ষাৎ ঈশ্বরের আজ্ঞা উহা একান্ত প্রতিপালনীয়, লঙ্ঘন করিলেই পাপ; তথাপি শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া রুগ্ন হই এবং মানসিক নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া অপ্রতি-কার্য্য পাপে লিপ্ত হই। আমাদিগের এইরূপ দোষ ও দুর্ব্বলতা অনেক। ইহা আর কে দূর করিতে পারে? এ দোষ কে ক্ষমা করিতে পারে? যাঁহার মঙ্গলভাব অসীম,

* "সর্ব্বস্য প্রভুমীশানং সর্ব্বস্য শরণং সুহৃৎ।" শ্বেতাশ্বতর। তিনি সকলের প্রভু, আশ্রয় ও সুহৃৎ।

তিনি পারেন। যাঁহার মঙ্গল ভাব অসীম, তাঁহার দয়া কোন নিশ্চিত সীমার মধ্যে থাকিতে পারে না। যাঁহার দয়া অসীম, তাঁহার নিকট আমাদিগের কৃত দুষ্কর্ম্ম যে পরাজিত হইবে, তাহার আর সন্দেহ কি ? কেন না দুষ্কর্ম্ম অসীম নহে অনেক ; কিন্তু ঐশী দয়া অসীম।

উপাস্য অদ্বিতীয়। অদ্বিতীয় কি ? যাহার আর দ্বিতীয় অর্থাৎ প্রতিযোগী বস্তু নাই। উপাস্যের একত্ব না থাকিলে উপাসক এক দিকে নিবিষ্ট চিত্ত হইয়া স্থির ভাবে অবস্থান করিতে পারে না। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, উপাস্যের সৌন্দর্য্য ও উপাস্যের অসীম জ্ঞান অসীম মঙ্গল ইচ্ছা দর্শন করিয়া যে লোভ জন্মে, সেই লোভ দ্বারা পরিচালিত হইয়াই উপাসক উপাসনা করিতে প্রবৃত্ত হয়। সেই লোভই উপাসকের নেতা, কিন্তু সেই গুণ সকল যদি বহু পাত্রে বিভক্ত হইয়া পড়ে, তবে কোন্ অংশ আশ্রয় করা উচিত, উপাসক তাহা নিশ্চয় করিতে পারে না। কেন না উপযুক্ত পাত্র ব্যতীত, ক্ষমতাবান্ ও শক্তিমান্ প্রভু ব্যতীত অন্য কেহ পরিত্রাণ আনিয়া দিতে পারে না।

বিশেষতঃ একটি পাপীর বহু পরিত্রাতা, এক পৃথিবীর বহু স্রষ্টা, এক সূর্য্যের বহু নিয়ামক বড়ই অসম্ভব। এই জন্য পূর্ব্বোক্ত গুণসকল দ্বিধা ত্রিধা বিভক্ত হইতে পারে না। ঐ সকল গুণের বিভাগ কল্পিত হইলে উপাসকের চাঞ্চল্য দূর হইতে পারে না। চাঞ্চল্য থাকিলে, মনের

গতি বিবিধ পথে ধাবিত হইতে থাকে, আশা নানা পথে প্রবাহিত হইয়া পড়ে, ভরসা নানা পাত্রে বিভক্ত হইতে থাকে। সুতরাং উপাসনা সিদ্ধ হইতে পারে না। উপাসনা সিদ্ধ না হইলে সাধকের আশা অপূর্ণ থাকে। সুতরাং মনুষ্যের উপাস্য এক ও অদ্বিতীয় না হইলে চলে না।

উপাস্য শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্। যাহাতে পাপ আছে, মালিন্য আছে, দুর্ব্বলতা আছে তাহা অপবিত্র। স্বভাবতঃ মনুষ্যাত্মার এ সকল নাই সুতরাং পবিত্র। কিন্তু তাহার সমুদায় গুণ সীমাযুক্ত। সেই সীমা অতিক্রম করিলেই মনুষ্যাত্মাকে মালিন্য প্রবেশ করে। এই মালিন্যের পথ অবরুদ্ধ করিবার জন্যই উপাসনার প্রয়োজন। উপাস্য অপাপবিদ্ধ ও পবিত্রস্বরূপ না হইলে, উপাস্যের নামমাত্রে দোষ দুর্ব্বলতা অপনীত না হইলে, উপাসনা নিষ্ফল বলিয়া প্রতীত হয়। যাহা মলিন, যাহা দুর্ব্বল, যাহা অপবিত্র, পবিত্র মানুষ তাহার উপাসনা করিবে কেন? অতএব উপাস্য শুদ্ধ ও অপাপবিদ্ধ হওয়া প্রয়োজনীয়।

উপাস্য পিতা মাতার অনুরূপ। কেবল অনুরূপ নহে, পিতা মাতার সমুদায় গুণ উপাস্যের আছে, কিন্তু পিতা মাতা অপেক্ষা সেই সকল গুণ তাঁহার কেবল অধিক নহে অনন্ত। যাঁহার ক্ষমা আছে—কেবল ক্ষমা নহে—সে ক্ষমা স্নেহরঞ্জিত, সে ক্ষমা কোমলতায় অনুলিপ্ত, সে ক্ষমা সুগভীর উদারতাপূর্ণ, তিনি পিতার গুণযুক্ত। এইরূপ স্নেহমাখা ক্ষমাগুণ

উপাস্য দেবতার থাকা চাই। নতুবা যে পাপী পুঞ্জ পুঞ্জ পাপ অপরাধ করিয়াছে সে পরিত্রাণার্থী হইবে কিরূপে? পাপী যে পরিত্রাণ চায়, সে কেবল তাহার হৃদয়স্থ আশার বলে, আশা যে স্ফূর্ত্তি পায় সে কেবল প্রভুর অসীম দয়ার গুণে।

আমরা এই জগতে পিতা মাতার স্বভাব দেখিয়াছি। যে পুত্র পিতা মাতার অবাধ্য, যে কোন রূপে পিতা মাতার কথায় ও কার্য্যে মনোযোগ দেয় না, যে পুনঃ পুনঃ দুষ্কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া পিতা মাতাকে জ্বালাতন করে, পিতা মাতা তাদৃশ দুরাচার পুত্রদিগকেও ক্ষমা করিতে পারেন। কেবল কি ক্ষমা করিতে পারেন, আবার ভালও বাসিতে পারেন। অবাধ্য পুত্র পিতামাতার তাদৃশ ক্ষমা পুনঃ পুনঃ দর্শন করিয়া আপনিও ক্ষমা পাইবার আশায় পিতা মাতার নিকট সাহস ও ভরসা পায়, সুতরাং তাঁহাদের সম্মুখে দাঁড়াইয়া কাতরতা প্রকাশ করিতে পারে। আমরা দেখিয়াছি পুত্রের চক্ষুতে এক বিন্দু জল দেখিয়া তৎকৃত কোটি কোটি অপরাধ জননী বিস্মৃত হইতে পারিয়াছেন। জিজ্ঞাসু ভ্রাতঃ! তুমি কি ইহার প্রমাণ চাও? প্রমাণ ব্যতীত আমার কথায় বিশ্বাস করিও না। তবে এস আমার সঙ্গে এস। দেখ, ঐ যে পুত্র রোগশয্যায় শয়ন করিয়া আছে, আর উহার জননী পার্শ্বে বসিয়া অশ্রুমোচন করিতে করিতে কাতর হৃদয়ে শোকসন্তপ্ত চিত্তে শুশ্রূষা করিতেছেন;

আর কত দুর্গন্ধ মলমূত্রাদি হস্তে করিয়া ফেলিতেছেন; এবং বলিতেছেন, "করুণাসাগর ঈশ্বর! আমার পুত্র অজ্ঞান, কিছুই বুঝে না। তুমি কৃপা করিয়া ইহার অপরাধ ক্ষমা কর; এবং পুত্রকে আরোগ্য দান কর। যদি এই পুত্র জীবিত থাকিয়া অর্থোপার্জ্জন করিতে না পারে, না পারিল। অন্ধ বা চিররুগ্ন হইয়া ঘরে থাকুক, আমি ভিক্ষা করিয়া ইহাকে পালন করিব। জীবিত থাকিলে আমি দিনান্তে অন্ততঃ একবার পুত্রমুখ দর্শন করিয়া সুখী হইতে পারিব।"

প্রিয় ভ্রাতঃ! দুই দিন পূর্ব্বে ঐ পুত্র ঐ জননীর বক্ষে পদাঘাত করিয়াছিল। সেই পদাহতা জননী কি বলিতেছেন শুনিলে? জননীর হৃদয় কেমন ক্ষমা ও স্নেহে পূর্ণ দেখিলে? ঐ জননী যখন পুত্রকর্ত্তৃক প্রহতা হন তখন বলিয়াছিলেন, আর পাষণ্ড পুত্রের মুখাবলোকন করিবেন না। দেখ এখন সেই মূর্ত্তি কেমন স্নেহরঞ্জিত হইয়াছে। জননীর মুখে কি পুত্রকৃত সেই অসদ্ভাবের বিন্দু মাত্রও আভাস আছে? ভ্রাতঃ! ইহা জননীর গুণ নহে, জননীর স্নেহের গুণ—জননীর অতুল ক্ষমা ও কোমলতার গুণ—সে গুণ চ্ছেদন করিবার জননীর সাধ্য নাই। তাই তিনি পুত্রকৃত অপমান বিস্মৃতা হইয়া তাহার মঙ্গলচিন্তায় নিমগ্না রহিয়াছেন।

কখন কখন ইহাও হইতে পারে, জননী কি জনক পুত্র-

কৃত দুশ্চরণে বিরক্ত হইয়া পুত্রকে পরিত্যাগ করিতে পারেন। অনেক পিতা মাতা অনেক কুপুত্রকে পরিত্যাগ করিয়া সুখী হইবার চেষ্টা করিয়াছেন; এ পৃথিবীতে ইহারও প্রমাণের অভাব নাই। এরূপ হয় কেন? পার্থিব পিতা মাতার স্নেহ মমতার সীমা আছে এই জন্য। যে স্থানে স্নেহ ও মমতার ব্যভিচার দৃশ্য হয়, সে স্থানে আশা ও ভরসার বল বড়ই অল্প। কিন্তু উপাস্য দেবতার স্নেহ মমতার ব্যভিচার থাকিলে চলিবে না। উপাস্যের পিতৃত্ব ও মাতৃত্ব অনন্ত গুণ থাকা আবশ্যক, যেন সেই স্নেহ মমতার সমুদ্র কেহ অতিক্রম করিতে না পারে।

আমরা শত সহস্র পাপ করিলেও ঈশ্বরের স্নেহ পরাজিত হইতে পারে না, এ বিষয়ে পাপীর মনে দৃঢ় বিশ্বাস থাকা প্রয়োজনীয়। নতুবা ঈশ্বর যদি ভয়ঙ্কর রুদ্ররূপী হন, তাঁহার যদি নির্যাতনপ্রিয়তা থাকে, যদি তাঁহার দয়া কিম্বা প্রেমের ব্যভিচারবিষয়ে লোকের বিশ্বাস প্রবল থাকে, তবে তাদৃশ প্রভুর নিকটে দাঁড়াইতে ও তাঁহার চরণতলে পড়িয়া ক্রন্দন করিতে পাপীর পা সরিবে কেন? পাপীর যদি আশা রাখিবার অল্প মাত্রও স্থান না থাকে, তবে সে আর কিসের জন্য উপাসনা ও ধর্ম্মের ক্লেশ বহন করিবে।

উপাস্য ন্যায়বান্ রাজা। নিয়মবিরুদ্ধ বা আজ্ঞাবিরুদ্ধ কার্য্য করিলে যিনি দণ্ড বিধান করেন, প্রজা হইয়া অপর প্রজার প্রতি অত্যাচার করিলে যাঁহার শাসন করি-

যার ক্ষমতা আছে, তাঁহাকে রাজা বলে। কিন্তু রাজা হইয়া অত্যাচার করিলে তাহার শাসন কে করিবে? এই পৃথিবীতে রাজা অনেক, অত্যাচারীও অনেক। মনুষ্য-জ্ঞানের সমতা নাই, প্রত্যুত দুর্ব্বলতা আছে। সুতরাং সর্ব্বদা ন্যায়ানুমোদিত কার্য্য হইবারও আশা নাই; অত্যাচারেরও বিরাম নাই। এইরূপ ত্রুটিত জ্ঞান ও হত-প্রভ ন্যায়ের দ্বারা যে অনিষ্ট উদ্ভূত হয়, তাহার শান্তি কোথায়?

যাঁহার জ্ঞান অত্রুটিত, ন্যায় অব্যাহত, সহস্র কারণেও যাঁহার ন্যায় দণ্ডে এক বিন্দু কলঙ্ক স্থান পাইতে পারে না, তিনি সকল রাজার রাজা। তিনি দুর্ব্বল ভিকারিকে রক্ষা করেন, তিনি অত্যাচারী দস্যুর প্রতিকার করেন। রাজা হউন প্রজা হউন, কেহ যাঁহার শাসন অতিক্রম করিতে পারে না; এ রূপ শাস্তা ভিন্ন মনুষ্যের উপাস্য আর কেহ হইতে পারে না। যিনি দুর্ব্বলকে দণ্ড দিতে পারেন, কিন্তু সবলকে পারেন না, যিনি কেবল সামান্য প্রজার উপরে কর্ত্তৃত্ব করিতে পারেন, রাজার উপরে পারেন না, যিনি এক দেশের শাসন করিতে সক্ষম, বহু দেশের শাসন করিতে অসমর্থ, যাঁহার ন্যায় দণ্ড ধনী দরিদ্র, জ্ঞানী মূর্খ, দেশ বিদেশ, রাজা প্রজা, সকলের প্রতি, সমান ভাবে আধিপত্য করিতে পারে না, মনুষ্য তাদৃশ অশক্ত দেবতার উপাসনা করিয়া কৃতার্থ হইতে পারে না।

যখন দেখি, আমরা যাঁহার উপাসনা করি, তাঁহার মহিমা তাঁহার প্রতাপ অপরিসীম;—তাঁহার অনতিক্রমণীয় ক্ষমতা কেহ অতিক্রম করিতে পারে না;—জড় কি প্রাণ সকলেই তাঁহার আজ্ঞা প্রণত মস্তকে বহন করে;—তাঁহার রাজ্যে তাঁহার সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে কাহারও অন্যায় ও অবিচার হইতে পারে না; আমরা কৃতার্থ হই এবং আনন্দাশ্রু সম্বরণ করিয়া রাখিতে পারি না।

উপাস্য পরিত্রাতা। যাঁহাতে পিতা ও মাতার গুণ আছে, তাঁহাতে পরিত্রাতার গুণও অবশ্য থাকিবে। কেন না পিতা মাতা স্নেহ মমতা ও দয়াশীলতার আধার। পরিত্রাণও স্নেহ ও দয়ার কার্য্য। কিন্তু রাজা কিরূপে পরিত্রাতা হইবেন, রাজারত পরিত্রাণ করা কার্য্য নয়; দণ্ড দেওয়া ও শাসন করা তাঁহার কার্য্য। যে শাসন করিবে, সে পরিত্রাণ করিবে কিরূপে? তাহাতে দুই বিপরীত গুণের সামঞ্জস্য হইবে কি প্রকারে! আশ্চর্য্য! আমাদিগের উপাস্য যেমন দণ্ডবিধাতা, তেমনিই পরিত্রাতা। দণ্ড ও পরিত্রাণ দুইটি বিপরীত কার্য্যই তাঁহাতে থাকা প্রয়োজনীয়। উপাস্য যেমন দণ্ড দিবেন, তেমনই পরিত্রাণও দিবেন। এরূপ না হইলে উপাসকের আর আশা থাকিবে কিরূপে? উপাস্য যে দণ্ড দেন, তাহা নিষ্ঠুরতামূলক হইতে পারে না। তাহা স্নেহ ও দয়ার কার্য্য। উপাস্যে পিতা মাতার গুণ আছে। পিতা মাতাও দণ্ড দেন, কিন্তু পিতা মাতা যেমন দণ্ড দেন, সেইরূপ স্নেহও

করেন। পিতা মাতা যে দণ্ড দেন, তাহা মঙ্গলের জন্য, বিনাশের জন্য নহে। তাঁহাদিগের দণ্ডে অবাধ্যসন্তান বাধ্য হয়, অশিক্ষিত শিক্ষা পায়, আর দুষ্কর্ম্ম করে না। দণ্ডিত ব্যক্তি আর দুষ্কর্ম্ম না করে, ইহাই দণ্ডের উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যেই সর্ব্বপ্রকারের দণ্ড বিহিত হইয়াছে। কিন্তু মনুষ্যের ত্রুটি পদে পদে। বিধান থাকিলেও সে বিধান সর্ব্বদা কার্য্যকর হইতে পারে না। সুতরাং প্রায়শঃ দণ্ড নিষ্ঠুরতামূলক হইয়া পড়ে। যে দণ্ড হিংসা ও বিদ্বেষ হইতে উৎপন্ন হয়, তাহার অভিনেত্রী শত্রুতা। তাহাতে দণ্ডিত ব্যক্তিকে বিনাশ করে, আরোগ্য দান করে না। যদি দণ্ডদ্বারা বিনাশ হইল, তবে দণ্ডের ফল কি ফলিল? যে দণ্ডে জীবনের ক্ষতি, তাহা দণ্ড নহে, দস্যুতা। দস্যুতা হইতে জগতের মঙ্গল হয় না, অমঙ্গল হয়। অতএব উপাস্য যেমন দণ্ড বিধাতা, সেইরূপ স্নেহময় পরিত্রাতা হইবেন, নতুবা চলিবে না। কেন না স্নেহময় পিতা ও স্নেহময়ী জননীর দণ্ডই পরিত্রাণ আনিয়া দেয়, আরোগ্য ও আনন্দ আনিয়া দেয়। সে দণ্ড কাহারও দুঃখজনক নহে, কিন্তু শান্তি ও আনন্দজনক। সে দণ্ডে ক্রোধ নাই, হিংসা নাই, ঈর্ষা নাই, পক্ষপাত নাই, তাহাতে কেবল বিশুদ্ধ স্নেহ মমতা, তাহাতে কেবল আশা ও আনন্দ। সুতরাং দণ্ড পরিত্রাণপ্রদ। সুতরাং আমাদিগের উপাস্য পরিত্রাতা। ফলতঃ যিনি রাজা তিনিই পিতা, যিনি পিতা তিনিই রাজা, এখানে রাজগুণ এবং পিতৃগুণ এ দুয়ের অসামঞ্জস্য হওয়া অসম্ভব।

চতুর্থাধ্যায়।

উপাসকের যোগ্যতা।

যেমন অপাত্রে বিন্যস্ত ক্রিয়া কখনও ফলোন্মুখী হয় না, সেইরূপ অনুষ্ঠাতার যোগ্যতা ভিন্ন অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হইতে পারে না। কোন কার্য্য অনুষ্ঠান করিবার পূর্ব্বে আপনাকে যোগ্যতাসম্পন্নকরা আবশ্যক, নতুবা অনুষ্ঠিত কার্য্য নির্দ্দোষ ও নিষ্কলঙ্ক ভাবে সম্পাদিত হওয়া অসম্ভব। আপনি উপযুক্ত হইলে, অনুষ্ঠানের ইষ্টানিষ্ট ফলাফল বিষয়ে অভিজ্ঞ হইলে এবং যোগ বিয়োগ-বিষয়ে নিপুণ হইলে, অনুষ্ঠিত কার্য্য নির্দ্দোষরূপে সম্পন্ন হইতে পারে। অতএব উপাসনারূপ অনুষ্ঠানের পূর্ব্বে আপন যোগ্যতাসাধনজন্য বিশেষ যত্ন করা প্রযোজন। এই যোগ্যতা সাধন করিতে কিং কি আয়োজন করা আবশ্যক, তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে।

ইন্দ্রিয়সংযম।

আমাদিগের ইন্দ্রিয় দশটি। তন্মধ্যে পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয়। যে সকল ইন্দ্রিয় জ্ঞানের পথে সহায় তাহারা জ্ঞানেন্দ্রিয়; যাহারা কর্ম্ম সাধনের

উপায়, তাহারা কর্ম্মেন্দ্রিয়। শ্রুতি, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা ও নাসা ইহারা বিষয়গ্রাহী, সুতরাং জ্ঞানের পথে সহায়। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ ইহারা যথাক্রমে ঐ পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিষয়। সংসারে যত জ্ঞাতব্য বিষয় আছে, তাহারা প্রত্যেকে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ প্রভৃতির আধার। সুতরাং জ্ঞানেন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়াই বিষয়সকল আমাদিগের আয়ত্ত হইয়া থাকে। ইন্দ্রিয়গণ জ্ঞাতব্য বিষয় অতিক্রম করিয়া জ্ঞানের সাহায্য করিতে অসমর্থ। বিষয়সকলও ইন্দ্রিয়গণের অনুভূতি ব্যতীত অকর্ম্মণ্য। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ ভিন্ন বিষয় নাই; শ্রুতি, ত্বক, চক্ষু, জিহ্বা ও নাসিকা ভিন্ন গ্রহীতা নাই। সুতরাং বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়গণ অপরিহার্য্য সম্বন্ধে সম্বদ্ধ। কৃপা-ময় পরমেশ্বরের কৃপায় এই অপরিহার্য্য সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এ সম্বন্ধ অতিক্রম করিবার কাহারও সাধ্য নাই।

আবার বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, জনন, এই পাঁচটি কর্ম্মসাধনের উপায়, কর্ম্মেন্দ্রিয় নামে খ্যাত। ভাষা-প্রয়োগ, আদান প্রদান, গমনাগমন, মলত্যাগ, প্রজোৎ-পাদন প্রভৃতি যথাক্রমে ঐ সকল কর্ম্মেন্দ্রিয়ের কর্ম্ম। এই সকল কর্ম্মের সঙ্গেও উক্ত ইন্দ্রিয়গণের একটি অপরিহার্য্য সম্বন্ধ আছে। কর্ম্মের সঙ্গে কর্ম্মেন্দ্রিয়ের ও বিষয়ের সহিত জ্ঞানেন্দ্রিয়ের যেমন একটি অপরিহার্য্য সম্বন্ধসূত্র লম্বিত আছে, সেইরূপ এই সকল ইন্দ্রিয়গণের সঙ্গে মনের একটি

অপরিহার্য্য সম্বন্ধ আছে। ইন্দ্রিয়গণের মূলে মনোযোগ না থাকিলে ইহারা আপন চেষ্টা দ্বারা কোন বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারে না। এই জন্য প্রাচীন পণ্ডিতগণ মনকে ষষ্ঠেন্দ্রিয় ও অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের প্রবর্ত্তক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ফলতঃ মন চেতনাশক্তি। এই চেতনাশক্তিই আত্মা, জীব বা আমি। মন ও ইন্দ্রিয়ের যোগ আমাদিগের মঙ্গলের জন্য হইয়াছে। ইহাদিগের পরস্পর সম্বন্ধের দ্বারা যে করুনার ভাব সূচিত হইয়াছে, তাহা পরাক্রমের সহিত আমাদিগের কৃতজ্ঞতা আকর্ষণ করে। আমরা চিন্তা করিলে অতি সহজেই বুঝিতে পারি যে, কৃপানিধান পরমেশ্বর এই সকল অপূর্ব্ব ভূষণ প্রদান করিয়া আমাদিগকে অত্যন্ত সুখী করিয়াছেন। ইন্দ্রিয়বিহীন মনুষ্য যেরূপ কৃপাপাত্র, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। জগতে যত শিক্ষণীয় বিষয় ও কর্ত্তব্য কর্ম্মসকল আমাদিগের নির্দ্দিষ্ট আছে, ইন্দ্রিয় অভাবে আমরা তাহা আরম্ভ করিব, এ কথা মনে করিতে পারি না। কিন্তু ঐ সকল ইন্দ্রিয়ও অন্ধ প্রকৃতি হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। এ জন্য উহারাও অন্ধ। অন্ধতা বশতঃ ইহারা বিষয় ও কর্ম্মের প্রয়োজন বুঝে না এবং তদনুযায়ী পরিমাণ রক্ষা করিতেও পারে না। সুতরাং ইহাদিগের দ্বারা আত্মার যে পরিমাণে উপকার হওয়া উচিত, কেবল ইহাদিগের প্রতি নির্ভর করাতে জগতে তাহা হয় না। বিষয়

সকল বাহির হইতে ইন্দ্রিয়গণকে আকর্ষণ করে, ইন্দ্রিয়-গণও তাহার বিমুগ্ধকর আকর্ষণের স্রোতে অবশ হইয়া ভাসে। ইচ্ছার দুর্ব্বলাবস্থায় মনও অন্ধের ন্যায় তাহা-দিগের অনুসরণ করিতেই প্রবৃত্ত হয়। তখন সুখের ইন্দ্রিয়গণ প্রায়ই দুঃখের নিদান হইয়া দাঁড়ায়। এই জন্য পূর্ব্বতন পণ্ডিতগণ ইন্দ্রিয়সংযম করা আবশ্যক বুঝিয়াছিলেন এবং বিবিধ উপায়ে ইন্দ্রিয়দমন করিতে পরামর্শ প্রদান করিয়াছেন। বস্তুতঃ ইন্দ্রিয় বশ করিতে না পারিলে ধর্ম্ম সাধনে কৃতকার্য্য হওয়া বড়ই অসম্ভব। কিন্তু আজ কাল এ বিষয়ে নানাবিধ কুসংস্কার ও ভ্রান্তি দেখিতে পাওয়া যায়। সম্প্রতি ইন্দ্রিয়সংযম বলিলে লোকে ইন্দ্রিয়দিগকে ক্রিয়াশূন্য করা বুঝে। ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াহীনতা আর ইন্দ্রিয়হীনতা একই কথা। যদি ইন্দ্রিয়কার্য্য একেবারে না থাকা উচিত হইত, তবে সর্ব্ব-দর্শী পরমেশ্বর মনুষ্যদিগকে ইন্দ্রিয় প্রদান করিতেন না। এই বিষয়ে পূর্ব্বতন পণ্ডিতগণ যে সকল মত প্রকাশ করিয়া-ছেন, তাহার আলোচনা করিলেও আমরা বুঝিতে পারি, ইন্দ্রিয়সংযম ইন্দ্রিয়হীনতা নহে। তাঁহারা ইন্দ্রিয়-দমন, ইন্দ্রিয়শাসন, ইন্দ্রিয়সংযম ও ইন্দ্রিয়জয় প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। ইহার একটি শব্দেরও অর্থ ইন্দ্রিয়গণের নিষ্ক্রিয়তাসূচক নহে। ইহার প্রত্যেক শব্দের অর্থ ইন্দ্রিয়দিগের উপর কর্তৃত্ব লাভ করা। বস্তুতঃ

আপন ইচ্ছানুসারে ইন্দ্রিয়দিগকে নিযুক্ত ও বিযুক্ত করিবার শক্তি লাভ করাই প্রকৃত ইন্দ্রিয়সংযম *।

যদি পূর্ব্বতন ঋষিগণের কথা দ্বারা ইন্দ্রিয়ের নিষ্ক্রিয়তা ইন্দ্রিয়সংযম না হয়, তবে লোক সমাজে এই ভ্রান্তি প্রবেশ করিল কিরূপে? ভ্রান্তি কখনও আপনা আপনি সমাজে বদ্ধমূল হইতে পারে না এ কথা সত্য; কিন্তু লোক যখন ভ্রান্ত হয়, তখন অতি গুরুতর বিষয়সকল অতিক্রম করিয়া সামান্য বিষয়েও ভ্রান্ত হয়। পূর্ব্ব কালের শ্রুতি,—ঋষিগণ অরণ্যে বাস করিতেন, অনাহারে যাট হাজার বৎসর তপস্যা করিতেন, তাঁহাদিগের শরীরে বল্মীক নির্ম্মিত হইলেও টের পাইতেন না এবং বৃক্ষ লতাদি সেই বল্মীকে বদ্ধমূল হইয়া গেলেও তাঁহারা উঠিতেন না। এই প্রবাদ বা শ্রুতি সত্য কি মিথ্যা, তাহা লইয়া আমি কিছু বলিতে চাহি না। কেন না তাদৃশ কথাতে পূর্ব্বতন গ্রন্থকর্ত্তাদিগের প্রতি অশ্রদ্ধার ভাব উপস্থিত করিতে পারে এবং সেই কারণে অধুনাতন সমাজ আমার প্রতি অকৃতজ্ঞতার দোষারোপ করিতে পারেন †। কিন্তু আমি ইহা অবশ্যই বলিব যে ঋষিগণ

---

* "যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু। যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগোভবতি দুঃখহা॥" ভগবদ্গীতা।

† যে সকল ঋষি সমাধি অবলম্বন করিতেন, তাঁহারা নিশ্চেষ্ট জড়ের ন্যায় অবস্থিতি করিতেন। কথিত আছে

অরণ্যে বাস করিতেন যে গ্রন্থে লিখিত আছে, মুনিপত্নী মুনিকন্যা ও মুনিপুত্র প্রভৃতি পরিবারের কথা সেই সকল গ্রন্থেই আছে। ঋষিগণ অনাহারে ষাট হাজার সত্তর হাজার বৎসর কাটাইতেন যে গ্রন্থে লিখিত আছে, সেই গ্রন্থেই আবার রাজন্যকুলের যাগ যজ্ঞ শ্রাদ্ধ শান্তিতে পঙ্গপালের ন্যায় নিমন্ত্রণ খাইতে যাইতেন লিখিত আছে। সুতরাং ইহা অতি সহজে বুঝা যায় যে মুনিগণ অরণ্যে বাস করিতেন, তাঁহাদিগের স্ত্রী পুত্র পরিবারও ছিল, নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণ লোকলৌকিকতাও ছিল, এবং তাঁহারা অত্যন্ত ইন্দ্রিয়সংযমশীলও ছিলেন। সুতরাং ইন্দ্রিয়সংযম বলিলে যে ইন্দ্রিয়গণের ক্রিয়াহীনতা বুঝায়, ইহা পূর্ব্বতন মুনিগণের জীবনে লক্ষিত হইতেছে না। তবে নারদ,

---

তাঁহারা মৃত্তিকাতে প্রোথিত হইলেও সেই ভাবে থাকিতেন। এ কালেও এক ব্যক্তি একজন ইউরোপীয়কে ঐরূপ অবস্থা দেখাইয়াছিল। সুতরাং বল্মীকাদিতে প্রোথিত এবং বহুকাল অনাহার থাকার যে প্রবাদ আছে তাহা ঐ ব্যাপার হইতে নিঃসন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে। যোগবাশিষ্ঠে রাম বশিষ্ঠকে এই বিষয়ের কারণ জিজ্ঞাসা করাতে তিনিও সমাধিতে সমুদায় ধাতুর সাম্য বশতঃ জড়ের ন্যায় অবস্থিতি হয় বলিয়াছিলেন। কাল যে মনের কল্পনাসম্ভূত তাহা স্পষ্টই উল্লিখিত হইয়াছে, "কল্পং ক্ষণীকরোত্যন্তঃ ক্ষণং নয়তি কল্পতাম্।" যদি সমাধিতে এইরূপই হয়, তবে উহা অসাধারণ ব্যাপার, কদাচ সাধারণ নহে। অনেক প্রাচীন গ্রন্থকার ওরূপ অবস্থার নিন্দাও করিয়াছেন।

শুক প্রভৃতি দুই এক জন ঋষি সংসারশূন্য ছিলেন সত্য; কিন্তু তাহা সমস্ত পৃথিবীর দৃষ্টান্তস্বরূপ গৃহীত হইতে পারে না। এক জন মনুষ্য জীবনের কোন বিশেষ কার্য্য-সাধনের জন্য তাদৃশ ব্যবহার করিতে পারেন এবং আজও যদি কাহারও কর্ত্তব্যবোধ হয়, তবে সেইরূপ কঠোর জীবনব্রত অবলম্বন করিতে পারেন; কিন্তু তেমন ব্যব-হার সাধারণের অপরিহার্য্য অবলম্বনীয় বলিয়া সিদ্ধান্ত করা যায় না।

মনুষ্য হইলেই তাহার জ্ঞানের পরিমাণ থাকিবে, জ্ঞানের পরিমাণ থাকিলেই ভ্রম প্রমাদ অপরিহার্য্য, ইহা পূর্ব্বতন আর্য্যগণ স্বীকার করিতেন। তাঁহারা পূর্ব্বে কি ছিল, বর্ত্তমানে কি আছে, পরে কিসের প্রয়োজন হইবে, এ সকল বিচার করিতেন। বিচার করিয়াই তাঁহারা পূর্ব্বতন মতের পরিবর্ত্তন করিয়া নূতন নূতন মত প্রতিষ্ঠিত করিয়া-ছেন; পূর্ব্বে যাহা আছে, তাহার সত্যগুলি অখণ্ডিত রাখিয়াছেন; বর্ত্তমানে যাহার প্রয়োজন, অভাব হইলে তাহা সংযোজিত করিয়াছেন। এইরূপে বেদের পর উপ-নিষৎ, উপনিষদের পর পুরাণ, পুরাণের পর তন্ত্র প্রভৃতি গ্রন্থ একই ধর্ম্মমতপরিবর্ত্তনের সাক্ষ্য দান করিতেছে। এই সকল পরিবর্ত্তনে সর্ব্বদা মঙ্গল ঘটে নাই, অনেক পরি-বর্ত্তনে অমঙ্গল সংঘটিত হইয়াছে। কিন্তু পরিবর্ত্তনশীল জগতে পুনর্ব্বার পরিবর্ত্তন আসিবে, অপরিবর্ত্তনীয় কিছুই

থাকিবে না, তাঁহারা ইহা জানিতেন। পরে যে পরিবর্ত্তন আসিবে, সে পরিবর্ত্তনের কেহ প্রতিরোধ করিতে পারিবে না, ইহাও তাঁহারা বুঝিতেন। বুঝিতেন বলিয়াই এত পরিবর্ত্তন করিতে পারিয়াছেন, নতুবা পারিতেন না। অধুনাতন লোকের অবস্থা স্বতন্ত্র। ইঁহারা পরিবর্ত্তনের কথা শুনিলে অগ্নি অবতার হন। কিন্তু ইঁহাদিগের এ উগ্রতা আত্মপর নির্ব্বিশেষে নহে। প্রয়োজন মতে আপনারা এত পরিবর্ত্তন করেন যে তাহা ভাবিলে বিস্ময় বোধ হয়। তাঁহাদের এই পরিবর্ত্তন সৎকার্য্যে নহে, কিন্তু অসৎ কার্য্যে—সুরুচিতে নহে, কিন্তু কুরুচিতে। আমি ইহার দৃষ্টান্ত দিতে অসমর্থ। কেন না তাদৃশ কুরুচির দৃষ্টান্ত তুলিলে পুস্তক খানি অপবিত্রতাস্পৃষ্ট হইবে। যাঁহারা সত্যানুরাগী তাঁহারা সংসারের অবস্থা চিন্তা করিলে বহু দৃষ্টান্ত পাইবেন। লোকে জানে সংসারে ইন্দ্রিয় বড় প্রয়োজনীয় সহায়। ইন্দ্রিয় ব্যতীত এক মুহূর্ত্ত চলে না। তাদৃশ ইন্দ্রিয়দিগকে বিনষ্ট বা ক্রিয়াশূন্য করিলে যে মনুষ্য নামের অর্থ থাকে না, ইহা কাহারও অগোচর নাই। সংসারে মানুষের যত কর্ত্তব্য আছে, ইন্দ্রিয়গণের সাহায্য ব্যতীত তাহার একটিও সম্পন্ন হইতে পারে না। আবার এই ইন্দ্রিয়গণ হইতেই মনুষ্য পদে পদে বিপদাক্রান্ত হইয়া থাকে। অতএব ইন্দ্রিয়শাসন যেমন প্রয়োজনীয়, ইন্দ্রিয়বিনাশ তেমনই পাপ। এ সকল লোকের অজ্ঞাত নাই, তথাপি লোকে এত কুসংস্কার

পরিপুষ্ট হইল কেন ? সম্প্রতি সংসারে নিরক্ষর লোকের মাত্রা কিছু অধিক হইয়াছে। তাঁহারা কিসের কি উদ্দেশ্য, কি কর্ত্তব্য কি অকর্ত্তব্য, এ সকল বিবেচনার ভার নিজের উপরে রাখিতে সম্মত নহেন এই জন্য। অথবা ইন্দ্রিয় দমন করিতে হইলে যথেচ্ছাচার কমাইতে হইবে, তাহাতে অবৈধ ভোগের ব্যাঘাত জন্মিবে, ইহা তাঁহাদিগের প্রকৃত চিন্তার বিষয়। ইন্দ্রিয়গণ অপরিহার্য্য সম্পদ্। উহা পরিত্যাগ করিবার কাহারও সাধ্য নাই। সুতরাং ইন্দ্রিয়সাহায্য পরিত্যাগ করিবার কাহারও সাধ্য হইবে না ইহা নিশ্চিতরূপে লোকের বিশ্বাস আছে। এ জন্য যাহা অসাধ্য সাধন বলিয়া লোকের সংস্কার আছে, তাহা লইয়া যদি কেহ বলে "ইন্দ্রিয় সংযমকর" তবে বলা হইবে "উহা মানুষের অসাধ্য।" এ কথায় যদি কেহ আপত্তি করে, তবে তাহার উত্তর দিবার জন্য পূর্ব্বকথিত বৃক্ষলতাসমাচ্ছন্ন বল্মীকপ্রোথিত ঋষিজীবনের কথা বলিলেই প্রচুর হইতে পারিবে, এইটি তাঁহাদিগের ভরসা। যাহা হউক, যে যাহা করুক বা না করুক, ধর্ম্ম সাধন করিতে হইলে ইন্দ্রিয়সংযম করিতে হইবে, ইহা নিশ্চিত সিদ্ধান্ত। যিনি ধর্ম্মের জন্য ব্যাকুল, সমাজের মুখাপেক্ষা করিবার তাঁহার অধিকার নাই। সমাজের যাহা সুবিধা সমাজ তাহা করিবে, যাহা অসুবিধা হইবে তাহা করিবে না। সাধক! তুমি যদি সমাজের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া নিজের জীবন প্রস্তুত করিতে যাও, যদি সমাজকে

প্রতিকূল দেখিয়া আপন গন্তব্য স্থানে উপনীত হইতে ভীত বা সঙ্কুচিত হও, তবে কোন কালেও তুমি পূর্ণমনোরথ হইতে পারিবে না। কেন না সমাজ ধার্ম্মিকের চিরশত্রু, ইহার প্রমাণ অনেক আছে। তুমি জান গ্রিশীয় পণ্ডিত পরমধর্ম্মজ্ঞ সক্রেটিশ সমাজের প্রতিকূলতায় প্রাণ হারাইয়াছেন। তুমি জান আমেরিকান্ পণ্ডিত ও ধার্ম্মিকবর থিওডোর পার্কর সত্যের জন্য কত লাঞ্ছনা সহ্য করিয়াছেন। তুমি জান খ্রীষ্টধর্ম্মপ্রবর্ত্তক ঈশা কিরূপ কষ্টে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছিলেন! তুমি জান মহর্ষি মহম্মদ কিরূপ যন্ত্রণা সহ্য করিয়াছেন। জান চৈতন্য নানক কবির হরিদাস প্রভৃতি সাধু মহাত্মাগণ সমাজের প্রতিকূলতায় কত ক্লেশ মস্তকে বহন করিয়াছেন। যদি না জান তবে তাঁহাদিগের জীবন বৃত্তান্ত পাঠ কর, জানিতে পারিবে ধর্ম্মের জন্য কত ক্লেশ সহ্য করা মানুষের উচিত, এবং কিরূপ বীরত্বের সহিত আপন গন্তব্য স্থানে উপনীত হওয়া আবশ্যক। সমাজের বিরুদ্ধে দেশের বিরুদ্ধে একাকী দণ্ডায়মান হইতে গেলে নিশ্চয় দুঃখভোগ করিতে হইবে। সুতরাং তেমন দুঃসাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া বুদ্ধিশালী মনুষ্যের উচিত নয় বলিয়া কেহ কেহ নিশ্চয় করিতে পারেন। যাঁহারা বুদ্ধির নিকট পরামর্শ লইয়া ধর্ম্মসাধনে প্রবৃত্ত হইতে যাইবেন, তাঁহারা এই কার্য্য দুঃসাহসিকতার কার্য্য বলিয়া ইহাতে প্রবৃত্ত হইতে পারিবেন না। প্রবৃত্ত হইলেও আপনাকে

অসহায় ও উপায়হীন ভাবিয়া পদে পদে বিড়ম্বিত হইবেন সন্দেহ নাই। কিন্তু যাঁহারা ঈশ্বরকে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর ও শাস্তা বলিয়া বিশ্বাস করেন, সেই অগণ্য ব্রহ্মাণ্ড-পতি পরমেশ্বরের শাসন মান্য করিয়া চলিলে ও তাঁহার আজ্ঞাবহ ভৃত্য বলিয়া আপনাকে বিশ্বাস করিতে পারিলে, তিনি সেই সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরকে সহায়রূপে প্রাপ্ত হইতে পারিবেন, ইহাও তাঁহার বিশ্বাস থাকিবে। সমস্ত বিশ্ব রাজ্যের শাস্তা যদি সহায় থাকেন, তবে তিনি অক্ষত ভাবে আপন প্রভুর কার্য্য সাধন করিতে পারিবেন, ইহা তিনি বিশ্বাস না করিয়া থাকিতে পারেন না। কেন না যিনি সকলেরই প্রভু তাঁহার কার্য্যে বিঘ্ন হইবে ইহা বিশ্বাস করিতে বা চিন্তা করিতেও তাঁহার প্রাণ কাঁপিয়া উঠে। আবার যিনি কেবল প্রেমের দাসত্ব করেন, তিনি প্রেমপাত্রের প্রিয়কার্য্য করিতে ইতস্ততঃ ও কর্ত্তব্য কি অকর্ত্তব্য, ইহা চিন্তা করিয়া পারেন না। কেন না এ সকল চিন্তা তাঁহার প্রিয়তমের ক্ষতি করিবার পরামর্শ দিবে। যিনি প্রেমিক, তিনি প্রেমময়ের ক্ষতি সহ্য করিতে অক্ষম। কাজে কাজেই নিজের ভাল হইবে কি মন্দ হইবে, ইহা চিন্তা করিয়া তিনি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারেন না। তাঁহার প্রিয়তমের যাহা প্রিয় ও প্রভুর আদেশ বলিয়া জানেন, তিনি হৃদয়ের অনুরাগ ও কর্ত্তব্যপরায়ণতার বাধ্য হইয়া তাহা সম্পাদন করেন।

অতএব সাধক! তুমি যদি সাধন করিতে চাও, তবে বুদ্ধির

ইতিকর্ত্তব্যবিমূঢ়তা পরিত্যাগ কর। লোকচরিত্রঘটিত দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিও না। ইন্দ্রিয়বিনাশের সঙ্কল্প ও ভয় মনে রাখিও না, কিন্তু ইন্দ্রিয়গণের সংযম কর। সংযম না করিলে ইন্দ্রিয়গণের অবৈধ গতি নিবারিত হইবে না। ইন্দ্রিয়গণের অসঙ্গত গতি থাকিলে তুমি কদাচ আপন অভীষ্ট ফললাভ করিতে সমর্থ হইবে না। ইন্দ্রিয়দিগকে বৈধগতিসম্পন্ন করিতে হইলে অগ্রে জানা আবশ্যক, ইন্দ্রিয়গণ কেন বিষয়ের প্রতি আসক্ত হয়। ইহার মূলানুসন্ধান করিলে জানা যাইবে, ইন্দ্রিয়গণ বাহ্যবস্তুর উৎকর্ষতাপকর্ষতানুসারে কখনও বিরক্ত আবার কখন অনুরক্ত হইয়া থাকে। এই যে আসক্তি ও বিরক্তি ইহারা উভয়েই উপাসকের যোগ্যতালাভের অন্তরায়। বিষয় যত চাকচিক্যময় ও উৎকৃষ্ট বা সুন্দর হইবে, ইন্দ্রিয়গণ ততই আসক্ত হইয়া পড়িবে। ইন্দ্রিয়গণ বিষয়াসক্ত হইলে সর্ব্বদাই আত্মার অবাধ্যতা প্রকাশ করে। আত্মার যাহা ইচ্ছা ইন্দ্রিয়গণ কোনরূপেই তাহা সম্পাদন করিতে দেয় না। প্রত্যুত আত্মাকে বলপূর্ব্বক বিপথে চালিত করে। এই পরিচালনার উদ্বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া আত্মা কর্ত্তব্য জ্ঞানে শিথিল ও প্রতিজ্ঞাভ্রষ্ট হইয়া পড়ে, এবং ইন্দ্রিয়গণ স্ব স্ব ইচ্ছানুসারে আত্মাকে লইয়া অযোগ্য পথে ধাবিত হয়। এই অবস্থায় আত্মা অসাড়, মৃতকল্প ও যন্ত্রের ন্যায় নিতান্ত পরবশ হইয়া কার্য্য করে। আত্মার স্বাধীন ইচ্ছার বল ও নির্ম্মল বিবেকের

সহায়তার অভাব হইলে এই অনিষ্টাপাত উপস্থিত হয়। ইন্দ্রিয়ের প্রয়োজন ও তদনুযায়ী ভোগের পরিমাণ রক্ষা করিবার ক্ষমতা ইচ্ছা ও বিবেকশক্তির। এই বিবেকানুবর্ত্তিনী ইচ্ছা যত নিস্তেজ বা স্ফূর্ত্তিবিহীন হইবে, ততই আত্মা বিবশ ভাবে অধোগমন করিবে।

অন্য দিকে আবার যদি ইন্দ্রিয়গণ আসক্ত না হইয়া বিরক্ত হয় এবং সেই বিরক্তি যদি বিষয়ের অসৌন্দর্য্য বা নিকৃষ্টতা হইতে উপস্থিত হয়, সে বিরক্তি হইতেও আত্মার অপকার জন্মে। কেন না তাহা প্রকৃত বিষয়বিরাগ নহে; কিন্তু আসক্তিমূলক বিষয়বিরাগ। বিষয়ের প্রতি লোভ আছে, সুতরাং বিষয় উৎকৃষ্ট ভোগ্য হইলে ইন্দ্রিয়গণ পরিতৃপ্ত হয়, অপকৃষ্ট হইলে ভোগের ব্যাঘাত জন্মে বলিয়া বিরক্ত হয়। এই বিরক্তি ভোগের ইচ্ছা অপূর্ণ থাকে বলিয়া উপস্থিত হয়, ইচ্ছার নিবৃত্তি হইয়াছে বলিয়া নহে।

এখন অনায়াসে বুঝা যাইতেছে যে, বিষয়ের নিকৃষ্টতা ও সৌন্দর্য্য বিহীনতা হইতে যে বিরাগ জন্মে তাহা আসক্তিমূলক। ভোগের ব্যাঘাত জন্মে বলিয়া যে অতৃপ্তি উপস্থিত হয়, সেই অতৃপ্তির জন্য উদ্বেগ ও উদ্বেগ জন্য বিরক্তি জন্মে। এই যে আসক্তিমূলক বিরক্তি, ইহা দ্বারা আত্মার অযোগ্যতা প্রকাশ পায়। অতএব ইন্দ্রিয় দমন করিতে হইলে বিবেকসহযোগে প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের প্রয়োজন চিন্তা করিতে হইবে; এবং সেই সেই প্রয়োজন অনুসারে ভোগের পরিমাণ স্থির

করিতে হইবে। যে ভোগের যত টুকু প্রয়োজন ইন্দ্রিয়-গণকে যত্ন পূর্ব্বক তাহার সীমাতে রাখিবে, সীমার বাহিরে যাইতে দিবে না। এইরূপ সীমার অভ্যন্তরে অবস্থিতি যাহাতে নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের ন্যায় সহজ সাধ্য হইতে পারে, তাহার উপায় বিধান করা প্রয়োজনীয়। যত দিন এই ব্যাপার সহজ ভাবে পরিণত না হইবে, তত দিন পতনের সম্ভাবনা মনে রাখিয়া চলিতে হইবে *।

মন।—পূর্ব্বে যে সকল ইন্দ্রিয়ের উল্লেখ করা হইয়াছে, এই সকল ইন্দ্রিয়ের প্রবর্ত্তক মন †। মনের প্রবৃত্তি ভিন্ন ইন্দ্রিয়-গণ স্বতঃ কিছুই করিতে পারে না। মনকে বশীভূত করিতে

---

* কেহ কেহ আপত্তি করিতে পারেন যে পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, প্রকৃতিমূলক কার্য্য ধর্ম্ম। ইন্দ্রিয়গণও প্রকৃতি সম্ভূত। সেই প্রকৃতিসম্ভূত ইন্দ্রিয়ের সংযমে প্রয়োজন কি, এবং মনুষ্য প্রকৃতির উপরেই বা শক্তি প্রকাশ করিবে কিরূপে? ইহার উত্তর এই, প্রকৃতি যে ধর্ম্ম তাহা সত্য এবং প্রকৃতি যে অন্ধ তাহাও সত্য; মনুষ্য যে স্বাধীন ইহাও সত্য। মনুষ্য প্রকৃতির উপরে কর্ত্তৃত্ব সংস্থাপন করে বলিয়াই স্বাধীন, ইহা পূর্ব্বে বলা গিয়াছে। সুতরাং এস্থলে প্রকৃতি প্রকৃতি অনুসারে নিয়মিত হইতেছে। প্রকৃতি প্রকৃতি অনুসারে নিয়মিত হওয়াই যদি ইন্দ্রিয়সংযম হয়, তবে আর উহাতে অপ্রাকৃতিকতা রহিল কোথায়?

† প্রাচীন পণ্ডিতগণের মতে সঙ্কল্পবিকল্পাত্মক মন। আমরা মনকে সাধারণভাবে চেতনাশক্তি বলিয়াছি। সঙ্কল্প ও বিকল্প এই চেতনাশক্তির বৃত্তিবিশেষ। সঙ্কল্প এবং বিকল্পই

পারিলে, অন্যান্য ইন্দ্রিয় সহজে আয়ত্ত হইতে পারে। কেন না মন সকল ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি-গ্রাহী হস্তস্বরূপ। মন যাহাতে নাই, ইন্দ্রিয় কখনও সেই বিষয় গ্রহণে সমর্থ হইতে পারে না। মনে কর তুমি লিখিতেছ, এমন সময়ে যদি মনে অন্য চিন্তা প্রবেশ করে, তবে তোমার লিখিত বিষয় দূষিত হইবে। তোমাকে কেহ কিছু বলিতেছে, তুমি বক্তার মুখের দিকে তাকাইয়া শুনিতেছ, এমন সময়ে যদি তোমার মন অন্যাসিক্ত হয়, তবে আর তুমি সে কথা শুনিতে পাইবে না। শুনিলেও মর্ম্মগ্রহণে সমর্থ হইবে না। কাজে কাজেই তখন তোমাকে পুনর্ব্বার সেই কথা বলিবার জন্য বক্তাকে অনুরোধ করা আবশ্যক হইবে; এবং বক্তার প্রাথমিক পরিশ্রম তোমার মনোযোগের ত্রুটিতে বিফল হইল দেখিয়া তোমাকে অত্যন্ত লজ্জা পাইতে হইবে। এই প্রকারে চিন্তা করিলে জানা যাইবে যে সংসারে যত প্রকার কর্ত্তব্য আছে, তাহার প্রত্যেক কর্ত্তব্যে মনের একাভিমুখ্য বিশেষ প্রয়োজনীয়। মনের গতি বিশৃঙ্খল হইলে, অথবা এক সময়ে নানা বিষয়ে বিক্ষিপ্ত হইতে থাকিলে, সংসারে একটিও কার্য্য সিদ্ধ হওয়া সম্ভব নহে। অতএব যখন তুমি চিন্তা করিবে বা কোন কার্য্য করিবে, তখন আপন লক্ষ্য হইতে

ইন্দ্রিয়গণের বিষয়ে প্রবৃত্তির কারণ মন শব্দটি চির দিন চেতনাশক্তির বৃত্তিবিশেষরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া আমরাও এখানে মনকে ভাষার ব্যবহারানুযায়ী ব্যবহার করিলাম।

বিচ্যুত হওয়া দোষ, ইহা মনে রাখিয়া সাধনাবস্থায় অতি সতর্কভাবে সকল প্রকার আসক্তিজনক বিষয় হইতে দূরে থাকিবে। যাহা চাকচিক্যময় লোভনীয় ভাবে পরিপূর্ণ, তাদৃশ দ্রব্য কদাচ ব্যবহার করিবে না। যদি উপাসনাকালে চাক্‌চিক্যময় পরিচ্ছদ পরিধান কর, এবং তোমার মন সেই সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ হইয়া থাকে, তবে পুনঃ পুনঃ অন্তরে সেই বস্তুর প্রতিবিম্ব পতন হওয়াতেও তোমার উপাসনার ব্যাঘাত জন্মিবার সম্ভব। অতএব তাদৃশ কোন কৃত্রিম সুন্দর বস্তু তুমি ব্যবহার করিও না। আলোক চিন্তার ব্যাঘাত জন্মায়, আলোক চিন্তিত বিষয় হইতে বিচ্যুত করে, ইহা পণ্ডিতবর্গের পরীক্ষিত সত্য। অতএব যিনি চিন্তাশীলতা অভ্যাস করিতে প্রবৃত্ত হইবেন, তাঁহার পক্ষে অন্ধকারময় নিভৃত স্থান বিশেষ প্রয়োজনীয়। যে স্থানে জনকোলাহল, সাংসারিক নানা উচ্ছৃঙ্খল ভাব সর্ব্বদা বিদ্যমান আছে, সেই উদ্বেগকর স্থান প্রথমাভ্যাসীর মহা অন্তরায় জানিয়া তাহা পরিত্যাগ করত নিস্তব্ধগম্ভীরভাবপূর্ণ স্থানে উপাসনা করিতে বসিবে। আসনের বন্ধুরতা, ভূমির বন্ধুরতা, উপবেশনের প্রণালীর দোষ, এ গুলিও অনেক সময়ে মনকে উদ্বেজিত করিয়া তুলে। এ সকল বিষয়ে সাবধান হইয়া চলিলে মন অনেক উদ্বেগশূন্য হইবে।

ইতঃপর মনকে সুন্দররূপে বশীভূত করিতে হইলে প্রথমতঃ চিন্তার একটি সুন্দর প্রণালী বাহির করা আবশ্যক। তৎ-

পর সেই স্থিরভাবাপন্ন মনকে এরূপ করিয়া সেই প্রণালীতে প্রবেশ করাইতে হইবে যে যেন সে আপন গন্তব্য পথ পরিত্যাগ করিয়া অন্য পথে বাহির হইয়া না পড়ে। যে বিষয়টি চিন্তা করিবে, অথবা যে কার্য্যটি সম্পাদন করিবে, তাহা এমন সুন্দর করিয়া সাজাইতে হইবে যেন মন তাহা পাইয়া সন্তুষ্ট হয়। মনের অসন্তোষকর সজ্জা হইলে তাহাতে মনকে আবদ্ধ করিয়া রাখা সহজ হইবে না। এ জন্য প্রথমতঃ সরল সুন্দর ও পরিষ্কৃত একটী প্রণালীর প্রয়োজন। এই প্রণালীর পথে মনকে প্রবেশ করাইয়া সুসজ্জিত বিষয়টি সুম্মুখে দেওয়া চাই। বিষয়টি মনের সম্মুখে দিয়া জ্ঞানের একটি পরিষ্কৃত আলোক তাহার নিকটে রাখা আবশ্যক। নতুবা মন অন্ধকারময় প্রণালী দিয়া অধিক ক্ষণ চলিতে না পারিয়া ফিরিয়া আসিতে পারে। মনকে যে জ্ঞানের আলোকটি প্রদান করা হইবে তাহা যেন বাহিরের বায়ু সন্তাড়িত হইতে না পারে, সে দিকে দৃষ্টি রাখা প্রয়োজনীয়।

এইরূপে মনকে ইচ্ছানুসারে নিযুক্ত করিবার শক্তি উপার্জন করিতে পারিলে, এক চিন্তা কিম্বা এক কার্য্য করিবার সময়ে মন নানা দিকে ধাবিত হইতে পারিবে না। তখন তুমি অনায়াসে আপন চিন্তনীয় বিষয় আয়ত্ত করিতে পারিবে এবং আপন কর্ত্তব্য কার্য্য সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও অক্ষুন্ন ভাবে সম্পাদন করিতে পারিবে। সংসারের নানা বিধ অপ্রীতিকর ঘটনা উপস্থিত হইয়া সময়ে সময়ে মনকে অত্যন্ত

উত্তেজিত করিয়া তুলে। সে সময়ে সাবধান হইতে না পারিলে অনেক ক্ষতি হইবার সম্ভব। অতএব প্রত্যেক সাংসারিক কার্য্য সম্পাদন করিতে কিম্বা চিন্তা করিতে অতিশয় সহিষ্ণুতা অবলম্বন করা আবশ্যক, এবং যাহাতে সর্ব্বদা শান্ত ও সমাহিত ভাবে জীবন কাটান যায় তাহার জন্য প্রস্তুত থাকা উচিত। নতুবা অপ্রস্তুত অবস্থায় কোন উত্তেজনা আসিয়া উপস্থিত হইলে তোমার প্রতিজ্ঞা স্থির রাখিতে সমর্থ হইবে না। কেন না উত্তেজনার প্রবল বেগে তোমার স্মৃতিশক্তি বিলয় পাইবে। সুতরাং পশ্চাত্তাপিত হওয়া ভিন্ন পূর্ব্বে সাবধান হইতে পারিবে না। দিবা রাত্রির মধ্যে যখন যে স্থানে যাইবে, কি যে ঘটনা উপস্থিত হইবে, তখন প্রতিমুহূর্ত্তে স্মরণ রাখিবে যে তুমি আপন মনকে বিরক্ত ও বিশৃঙ্খল হইতে দিবে না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছ। এইরূপ করিতে পারিলে বড় সহজে মনঃসংযম করিতে পারিবে। সর্ব্ব প্রকার মানসিক বিঘ্ন হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য এটি বড় উৎকৃষ্ট উপায়। এ উপায় অবলম্বন করিতে যদি শিথিল প্রযত্ন হও, তবে আর কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিবে না।

দর্শন :—ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় সকলের মধ্যে পার্থিব পরমাণু সর্ব্বাগ্রে গ্রহণীয়। শব্দ স্পর্শ রূপ রস ও গন্ধ এই যে ইন্দ্রিয় বৃত্তির বিষয়, ইহারা সকলেই অল্পাধিক ভাবে পার্থিব পরমাণুতে অবস্থান করে। এই জন্য মূর্ত্ত বস্তু ইন্দ্রিয়বিষয় মধ্যে সমধিক স্থূল; এবং সর্ব্বাগ্রে দর্শনেন্দ্রিয়ের বিষয়

প্রদর্শন করা প্রয়োজনীয়। কেন না স্থূল বিষয়ের পর সূক্ষ্ম বিষয় বুঝিতে সহজ।

মূর্ত্ত বস্তু মাত্রেরই প্রধান গুণ রূপ। এই রূপ দর্শনেন্দ্রিয়ের বিষয়। আপাততঃ দেখিতে বোধ হয় রূপ দুই প্রকার। এক রূপ, দ্বিতীয় কুরূপ। বস্তুতঃ তাহা নহে, রূপের অভাবই কুরূপ। বস্তুর গঠনপ্রণালীর পারিপাট্য এবং বর্ণাদির ঔজ্জ্বল্য থাকিলেই তাহার নাম রূপ। এ স্থলে বর্ণের চিক্কণতার সহিত যদি গঠনের ভাব সঙ্গত হয়, তাহাই উৎকৃষ্টতা দ্যোতক হইবেক, কিন্তু নীল পীত কি লোহিতের সদ্ভাবানুসারে রূপ হইবে না। যদি নীলবর্ণ গঠনের প্রণালী অনুসারে ভাব সঙ্গত হয়, তাহাতেও রূপ হইবে। পীতবর্ণ যদি বিশুদ্ধভাবে প্রতিফলিত হয়, তাহাতেও রূপ হইবে। লোহিত বর্ণের বিশুদ্ধভাবে সংমিশ্রণ হইলেও তাহাই হইবে। সুতরাং কোন বর্ণ রূপের দ্যোতক, কোন বর্ণ রূপের রোধক হইবে না; কিন্তু সকল বর্ণই রূপের দ্যোতক। ফল কথা, যদি গঠনের পারিপাট্য থাকে, তাহার সঙ্গে যদি চিক্কণতাপূর্ণ উপযুক্ত বর্ণ সংযোজিত হয়, তবেই রূপ হইবে। আর যে স্থলে রচনাপারিপাট্যের অভাব এবং বর্ণের চিক্কণতা ও ঔচিত্য নাই, তাহাই কুরূপ। সুতরাং কুরূপ কিছু নয়; রূপের অভাব হইলে তাহাকে কুরূপ বলা যায়। যে স্থানে রূপের সদ্ভাব, সেই স্থানে দর্শনেন্দ্রিয় আসক্ত, যে স্থানে রূপের অভাব, সেই স্থানে বিরক্ত।

এই যে আসক্তি ও বিরক্তি ইহারও মূল একই। কেন না রূপের প্রতি আসক্তি আছে বলিয়া অভাব হইলে বিরক্তি হয়। সুতরাং এ বিরক্তিও আসক্তিমূলক। রূপবৎ বস্তুর প্রতি যে দর্শনেন্দ্রিয়ের আসক্তি ইহা দূষিত নহে। এটি তাহার স্বভাব। কিন্তু এই স্বভাবও বিবেকবর্জিত হইলেই দূষিত হইবার সম্ভব। যখন স্বভাব বিবেকসহ-যোগে কার্য্য করে, তখন তাহাকে দেবভাব এবং বিবেক-বর্জিত হইলে তাহাকে পশুভাব বলা যায়। যদি আমরা কোন নীচপ্রবৃত্তিচরিতার্থতার জন্য অন্ধভাবে ইন্দ্রি-য়ের অনুসরণ করি এবং তদনুসারে অন্ধানুরাগে আক্রুষ্ট হই, তবেই পশুত্বরূপ নরকে অতি সহজে নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকি। কেন না তাহাতে বিবেকের সাহায্য থাকে না। যাহাতে বিবেকের সাহায্য থাকে, তাহার অন্ধভাব থাকে না। অন্ধতা না থাকিলে অমঙ্গল আসিতে পারে না। সুতরাং যদি বিবেকের পবিত্র উপদেশ গ্রহণ করিয়া ইন্দ্রিয়-গণের অনুসরণ করি, তবে অতি সহজে দেবত্বলাভে সমর্থ হইতে পারি। কেন পারি? বিবেক ইন্দ্রিয়ের প্রয়ো-জন ও ভোগের পরিমাণের কথা বলিয়া দিতে পারে এই-জন্য।

এ বিষয়টি আরো কিঞ্চিৎ স্ফুট হওয়া আবশ্যক। এই জন্য একটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছি। মনে কর, সম্মুখে, একটি সুন্দর পুরুষ কি সুন্দরী স্ত্রীর মূর্ত্তি দর্শন করি

লাম, এবং তাহার মহিমান্বিত সৌন্দর্য্যদর্শনে আমার ইন্দ্রিয় আকৃষ্ট হইল। মন ইন্দ্রিয়ের অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে সম্পর্কিত, সুতরাং মনও তাহার অনুসরণ করিতে চলিল। ইহা অস্বাভাবিক নহে। কেন না বস্তু সুন্দর হইলেই আত্মার তৃপ্তি বিধান করিবে। ঈশ্বর সমস্ত সৌন্দর্য্যের আকর। এই জন্য রূপের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের প্রকৃতিসম্ভূত আকর্ষণ আছে। ইন্দ্রিয়ের প্রতি সৌন্দর্য্যের এত বল যে সে তাহাতে আকৃষ্ট না হইয়াই পারে না। কিন্তু ইহার মধ্যে পশুত্ব আর দেবত্ব এই দুইটি ভাবের জন্য আমরা মরি আর বাঁচি। ফল কথা, পূর্ব্ব কথিত সুন্দর বা সুন্দরীর রূপমাধুরী যদি আমাকে বিবেকবর্জ্জিত পশু-ভাবে আকর্ষণ করে, তবেই আমার মৃত্যুর সম্ভাবনা। আর যদি তাহার চিত্তবিমুগ্ধকর রূপরাশি আমার অন্তরে ঈশ্বরকে জাগ্রৎ করিয়া দেয়, তবে আমার জীবন লাভ হয়। এই দুইটি ভাবকে পশুত্ব ও দেবত্ব বলি কেন? পশুর প্রকৃতি বৈধাবৈধভাববর্জিত; বিবেকবিহীন ইন্দ্রিয় প্রবৃত্তিও আমাদিগকে বৈধাবৈধবিচারশূন্য করে, এই জন্য উহা পশুত্ব। বিবেকের অনুমোদিত কার্য্যে অবৈধভাব দূর করিয়া অন্তরের দেবতা ঈশ্বরকে স্মরণ করাইয়া দেয়, এই জন্য উহা দেবত্ব। পশুত্বই মৃত্যু এবং দেবত্বই জীবন। চক্ষুরিন্দ্রিয়সংযমকালে এই দুইটি ভাব মনে রাখিতে পারিলে অনায়াসে ইন্দ্রিয়কে বশে রাখিয়া চলিতে পারা

যায়। এই দেবত্ব উপার্জ্জন করিয়া পশুত্ব বিসর্জ্জন করাই মনুষ্যজীবনের কর্ত্তব্য। কিন্তু পশুত্বের আকর্ষণ এমন প্রবল যে তাহার হস্ত হইতে মনুষ্য সহজে মুক্তি লাভ করিতে পারে না; অথচ ইহা না করিতে পারিলেও মনুষ্য নামের গৌরব রক্ষা পায় না। এই জন্য যাঁহারা প্রথমতঃ ইন্দ্রিয়শাসনে প্রবৃত্ত হইবেন, তাঁহাদিগের জন্য কতকগুলি নিয়ম প্রদর্শিত হইতেছে।

পূর্ব্ব কথিত রূপবৎ বস্তুনিচয়ের মধ্যে কতক গুলি বস্তু এরূপ আছে, যাহারা স্বভাবতই মনে স্বর্গীয় ভাব ঢালিয়া দেয়। কিন্তু মানুষ এত অপবিত্র হইয়াছে যে তাহারও মধ্যে কেবল ইন্দ্রিয়তৃপ্তির উপায় ব্যতীত আর কিছু অনুসন্ধান করিয়া পায় না। ইহা কেবল মনুষ্যের পশুত্বের আধিক্য হইতে হয়। অতএব প্রথমতঃ ধীরতার সহিত বিবেককে আশ্রয় করা কর্ত্তব্য। বিবেক দ্বারা ইন্দ্রিয়ের প্রয়োজন ও সেই প্রয়োজনের সীমা কত দূর বিস্তৃত হওয়া উচিত এইটি অবগত হইবে। পরে সেই অবগতি অনুসারে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে। এ স্থলে আর একটি প্রয়োজনীয় কথা আছে। বিবেককে যদি সাধারণ ভাবে গ্রহণ করা যায়, তবে তাহার পরামর্শ সুপরামর্শ বলিয়া পালন করিতে ইচ্ছা হইবে না। অতএব বিবেককে সাক্ষাৎ ঈশ্বরাজ্ঞা বলিয়া বিশ্বাস করিবে; এবং বিবেকের পরামর্শ বুঝিবার ও পালন করিবার জন্য যাহাতে মনে

উৎসাহের সঞ্চার হয়, এই জন্য দিন রাত্রি সমান ভাবে ঈশ্বরের করুণা প্রার্থনা করিবে। এই যে প্রার্থনার ভাব ইহা বিস্মৃত হইলে চলিবে না। প্রতিনিশ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে ইহা স্মরণ করিতে হইবে।

দ্বিতীয়তঃ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার সময়ে বীর পুরুষদিগের ন্যায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইবে। আমি অমুক কার্য্য করিবই করিব, উহা আমার একান্ত কর্ত্তব্য, এই বলিয়া প্রতিজ্ঞারূঢ় হইলে এবং সেই প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন না করিলেই চলিবে না, মনে এই ভাবটি রাত্রি দিন জাগ্রৎ রাখিতে পারিলে, আপনাকে অধ্যবসায়ী করিতে পারা যায়। আপনি অধ্যবসায়ী থাকিলে অনায়ত্ত বিষয় আয়ত্ত হইবার পক্ষে সহজ হইতে পারে। এই প্রতিজ্ঞা ও অধ্যবসায় কেবল নিজের বলে সজীব থাকা অসম্ভব। ইতিপূর্ব্বে যত সাধু ধর্ম্মার্থী এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহারা নিজের প্রতিজ্ঞার ক্ষণভঙ্গুরতা জানিতেন। এই জন্য কার্য্য করিবার পূর্ব্বে তাঁহারা দৃঢ় ভাবে ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর করিতেন। ঈশ্বর অবশ্যই আমার সাধু কার্য্যের সহায় হইবেন, আবার ঈশ্বর সহায় হইলে সকল প্রকার কঠিন কার্য্যই হস্তগত করিতে পারিব; এ বিশ্বাস মনে রাখিতে পারিলে তাহার পক্ষে কোন কার্য্য অসাধ্য সাধন বলিয়া অকৃত বা অসম্পন্ন থাকিতে পারে না।

তৃতীয়তঃ রূপ ভাল; কিন্তু রূপ হইতে মনে যে অপ-

বিত্রতা উপস্থিত হয়, তাহাই দূষিত, সুতরাং অনিষ্টোৎ-
পাদক। এই কথাটি স্মরণ করিয়া যে সকল বস্তু বস্তুতঃ
প্রকৃতিগত বিশুদ্ধ, যাহা হইতে বিনা চেষ্টায় মনে অপবি-
ত্রতা জন্মে না, সেই সকল বস্তু নিকটে রাখিতে যত্ন করিবে
এবং যে সমস্ত বস্তু হইতে অতি সহজে মন্দ ভাব হৃদয়ে
জাগিয়া উঠে, তাহা হইতে দৃষ্টিশক্তি আকর্ষণ করিয়া
রাখিবে। যথা—পুষ্পের সৌন্দর্য্য ও সৌকুমার্য্য, পক্ষি-
শরীরের বিচিত্রতা, তরু লতাদির চিত্তস্নিগ্ধকর ভাব,
রজনীর গভীরতা নিস্তব্ধতা ও মাধুর্য্য, তারকাখচিত নভো-
মণ্ডলের রমণীয়তা ইত্যাদি। এইগুলি প্রাকৃতিক অথচ
নিস্বার্থ সুখপ্রদ মনোহর দৃশ্য। ইহা হইতে অতি সহজে
ঈশ্বরের প্রেম, পবিত্রতা, বরণীয়তা, রমণীয়তা প্রভৃতি মনে
আনা যায়। অতএব যাহাতে সেই ভূমা মহান্ পুরুষের
মহিমা এই সকল প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য হইতে হৃদয়ে মুদ্রিত
করা যায়, তাহার জন্য চেষ্টা করিবে। যত দিন হৃদয়
বিশ্বস্ত বন্ধুর ন্যায় না হয়, তত দিন নিম্নলিখিত বস্তু-
নিচয় হইতে দূরে থাকিবার যত্ন করিবে। যথা—স্বামী
বা স্ত্রী, পুত্র কন্যা ও অর্থ প্রভৃতি এবং শয্যা, পরিচ্ছদ, গৃহ
ইত্যাদি। এ সকল সংসারের অপরিহার্য্য বস্তু অথচ এই সকল
দ্বারা অতি সহজে মনুষ্য-হৃদয় আসক্ত ও স্বার্থপরায়ণ হইয়া
উঠে। সুতরাং এই সকল দৃশ্য প্রথমাভ্যাসীদিগের বিপদ্ব-
র্দ্ধক। বিপদ্বর্দ্ধক অথচ এ সকল না হইলে সংসারে

এক মুহূর্ত্তও চলে না। বিশেষতঃ ভোগ্য বস্তু হইতে দূরে থাকা নিরাপদ্ অবস্থা নহে। আজ দূরে আছি বলিয়া নিরাপদ্ আছি; কিন্তু কাল যদি কোন অনিবার্য্য কারণে নিকটে যাইতে হইল, তাহার উপায় কি? তখনকার বিপদ্ হইতে পরিত্রাণ পাইবার আশা কি? অতএব এই সকল বস্তুর ব্যবহারবিষয়ে একটি প্রণালী অবলম্বন করা আবশ্যক। স্বামী ও স্ত্রী এই সম্বন্ধময় দৃশ্য আবশ্যকীয় হইলেও প্রথম অভ্যাসকারীদিগের বিঘ্নোৎপাদক। অতএব হৃদয় প্রস্তুত করিবার পূর্ব্বে এই সম্বন্ধে আবদ্ধ হইবে না। যদি দৈবাৎ বা কোন অনিবার্য্য ঘটনা বশতঃ না করিলে না হয়, তবে করিবে; কিন্তু পৃথক্ ভাবে উপযুক্ত আচার্য্যের নিকট থাকিয়া চিত্তবশীকরণ শিক্ষা করিবে *। আমার এই পরীক্ষিত মতের বিরুদ্ধে স্বার্থপরায়ন কেহ কেহ অনেক আপত্তি করিতে পারেন; কিন্তু এ স্থলে আমার বিনীত নিবেদন এই যে, কুযুক্তি স্বার্থের অনুকূল, সুতরাং মিষ্ট, কিন্তু বিপদের বাহন; এই কথাটি স্মরণ রাখিয়া কার্য্য করিলে নিরাপদ্ হইবার আশা আছে।

পুত্র কন্যাও মনের অতিশয় মমতাবর্দ্ধক দৃশ্য। ইহারা নিকটে থাকিলেই পুনঃ পুনঃ দর্শনের ইচ্ছা জন্মে,

---

* 'সন্ত পরমারথী, শীতল উন্‌কি অঙ্ । তপন্ বুঝাওত আন কো ধরাওত আপনা রং॥" তুলসী।

এবং সেই ইচ্ছা হইতে অসঙ্গত ভাববিকৃতি উপস্থিত হইয়া মনুষ্যকে বিনাশ করে। অতএব সাধক সাধনকালে এ সকল সম্মুখে রাখিলে কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন, ইহা বড়ই দুরাশা। সাধকের শয্যা চাই; কিন্তু অতি সামান্য শয্যা হইলেই হইতে পারে। পরিচ্ছদও চাই। সাধকের পক্ষে পরিষ্কৃত থাকিলেই উহা প্রচুর বলিয়া মানিতে হইবে। শয্যা ও পরিচ্ছদের চাকচিক্য, মনোহর বর্ণবিচিত্রতা ও রচনাচাতুর্য্য প্রভৃতি অনিষ্টজনক। কেন না ইহা দ্বারা অন্তঃকরণ অত্যন্ত চঞ্চল এবং ধারণাশক্তির লাঘব হয়। অর্থ কেবল প্রাণ যাত্রা নির্ব্বাহোপযোগী রাখিবে, অধিক রাখিবে না। অধিক অর্থ থাকিলে সর্ব্বদা সদ্ব্যয় করিবে।

স্পার্শন।

স্পার্শ ত্বগিন্দ্রিয়ের অধিকার। স্পৃশ্য বস্তু ইহার বিষয়। স্পৃশ্য বস্তু অনেক। তন্মধ্যে বস্তু সকলের প্রকৃতি অনুসারে তাহাদিগকে আট শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। যথা—কোমল ও কঠিন, মসৃণ ও বন্ধুর, শীতল ও উষ্ণ, স্নিগ্ধ ও রুক্ষ। ত্বক্ বস্তু গ্রহণ করিতে পারে না; কিন্তু বস্তুর এই কএকটি ভাব মাত্র গ্রহণ করিতে পারে। যে কএকটি ভাবের কথা উপরে উল্লেখ করা হইল, উহারা যথাক্রমে একটি অন্যটির বিপরীত। কঠিন কোমলের

বিপরীত, বন্ধুর মসৃণের বিপরীত, উষ্ণ শীতলের বিপরীত, রুক্ষ স্নিগ্ধের বিপরীত। এই যে যুগ্মাত্মক ভাববৈপরীত্য, আমাদিগের ত্বগিন্দ্রিয় কেবল এই ভাববৈপরিত্যাটি গ্রহণ করিয়া জ্ঞানের পথে সাহায্য করিতে পারে, আর কিছু পারে না। চর্ম্মের এই ভাবগ্রাহিণী শক্তি অতি প্রয়োজনীয়, এমন কি না হইলে চলে না, সুতরাং উহা প্রাণীদিগের একান্ত উপযোগী। এই ভাবগ্রাহিণী শক্তি প্রাণিগণের যেমন উপযোগী, ইহার আতিশয্য তেমনই অনিষ্টোৎপাদক। অতএব যাহাতে এই শক্তি সাম্য ভাবে অবস্থান করে, তাহার উপায় করা কর্ত্তব্য।

আপাততঃ কোমল বস্তু কঠিন বস্তু অপেক্ষা অধিক স্পৃহণীয় বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু উহা কেবল চর্ম্মের সহনীয়তার অভাবে ঘটিয়া থাকে। বাল্যকালের চর্ম্ম অতি কোমল, সুতরাং তৎকালে কঠিন বস্তু তাহার অনুপযোগী। কিন্তু যেমন দন্তোদ্গম না হওয়া পর্য্যন্ত দুগ্ধ ভিন্ন আর সমুদায় খাদ্য তৎকালের অনুপযোগী, সুতরাং অব্যবহার্য্য, দন্ত উঠিলে আর কেবল দুগ্ধ মাত্রের প্রতি নির্ভর করা উচিত নহে, সেইরূপ শরীর দৃঢ় ও সবল হইতে আরম্ভ হইলে, ক্রমে কোমল বস্তুর পরিবর্ত্তে কঠিন বস্তু ব্যবহার করা একান্ত প্রয়োজনীয়। এইরূপ পরিবর্ত্তন প্রাকৃতিক। ইহা করিলে ইষ্ট, না করিলেই অনিষ্ট। আমরা যখন মাতৃগর্ভে সুকোমল জরায়ু শয্যায় শয়িত

ছিলাম, তদপেক্ষা বস্ত্রমণ্ডিত মাতৃ বা ধাত্রী ক্রোড় যে কঠিন, তৎপক্ষে আর সন্দেহ নাই। তৎপর ইতস্ততঃ ক্রোড় হইতে ক্রোড়ান্তরে সঞ্চালন ও সংঘর্ষণাদি দ্বারা চর্ম্ম অধিক সহনীয়তা প্রাপ্ত হইতে থাকে, এবং যত বয়ঃক্রম বৃদ্ধি পাইতে থাকে, ততই বাহিরের তেজ ও বায়ু দ্বারা শরীরের চর্ম্ম উত্তরোত্তর দৃঢ়তর হইয়া আইসে। ইহার সঙ্গে সঙ্গে শয্যা ও পরিচ্ছদাদির কোমলতা দূর করিয়া কাঠিন্য আশ্রয় করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কেন না যে বস্তু যে সময়ের উপযোগী, প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে তাহা সে সময়ে অবশ্য প্রয়োজন, অন্যথা অনিষ্ট সম্ভব। এইরূপ পরিবর্ত্তন না করিলে চর্ম্মের মৃদুতা দূর হয় না। চর্ম্ম মৃদু ও স্পর্শাসহিষ্ণু থাকিলে শীতল কি উষ্ণ, মৃদুতা কি কাঠিন্য কিছুই সহন করিবার সামর্থ্য থাকে না। মনুষ্য নানা অবস্থায় পতিত হইয়া নানা প্রকার বাহ্য বস্তুর সহিত অপরিহার্য্য সম্বন্ধে সম্বদ্ধ হয়। বুদ্ধিমান্ মনুষ্য সেই সমস্ত অবস্থা হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য পূর্ব্বেই আয়োজন করিয়া রাখে। না রাখিলে যে বিপদ্ অনিবার্য্য তাহা অতি সহজে বোধ্য; সুতরাং প্রমাণ দেওয়া নিষ্প্রয়োজন।

পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে চর্ম্ম দৃঢ়তা প্রাপ্ত হইলে, তাহাকে আরও অধিক পরিমাণে সহনীয়তা প্রদান করা আবশ্যক। কেন না মনুষ্যের কর্ত্তব্য অনেক; এবং সেই সকল কার্য্য সাধন করিতে হইলে কেবল প্রাকৃতিক সহিষ্ণুতা লইয়া

চলা যায় না; তাহা অপেক্ষা আরও কিছু অধিক সহিষ্ণুতার প্রয়োজন। অধিক সহিষ্ণুতা লাভ করিবার প্রধান উপায় ব্যায়াম। ব্যায়াম দ্বারা শরীরের পেশী, শিরা, ধমনী প্রভৃতি সতেজ ও ধারণাশক্তি প্রাপ্ত হয়। রস, রক্ত, মেদ, মাংস, মজ্জা ও শুক্র প্রভৃতি শারীরিক উপাদান সকল ঘনীভূত হইয়া দীর্ঘারোগ্য ও দীর্ঘজীবন প্রদান করে। এই জন্য পূর্ব্ব কালে গৃহী, বানপ্রস্থ, যোগী, ঋষি সকলেরই মধ্যে ব্যায়ামশিক্ষার প্রথা প্রচলিত ছিল। যদি শরীর বলিষ্ঠ ও কার্য্যক্ষম হয়, কি সংসার কি তপস্যা সকল কার্য্যসাধনেরই সুবিধা হইতে পারে *। শরীর অপটু হইলে, তপস্যা সম্ভূত ক্লেশের ত কথাই নাই,

* তপস্যা দ্বারা শরীরকে ক্ষীণ ও দুর্ব্বল করা শাস্ত্রসিদ্ধ অনেকে মনে করিতে পারেন। তাঁহারা গীতার এই শ্লোকটি সর্ব্বদা স্মরণে রাখিবেন, "কর্শয়ন্তঃ শরীরস্থং ভূতগ্রামমচেতসঃ। মাঞ্চৈবান্তঃশরীরস্থং তান্ বিদ্ধ্যাসুরনিশ্চয়ান্॥" পাতঞ্জল দর্শনের ভাষ্যে বেদব্যাস যাহাতে ধাতুবৈষম্য উপস্থিত হয়, ইন্দ্রিয়সংযম জন্য এরূপ কৃচ্ছ্রব্রত পরিত্যাগ করিতে বলিয়াছেন। শরীর মন স্বাভাবিক অবস্থায় থাকিলে যে দৃশ্য দেখিয়া ইন্দ্রিয়বিকার উপস্থিত হওয়া দূরে থাকুক লজ্জা ও ঘৃণা উপস্থিত হয়, তাদৃশ দৃশ্য দেখিয়া যে কোন কোন পূর্ব্বতন কঠোরব্রত ঋষির পতন হইয়াছে, তাহার কারণ অন্যায়রূপে ধাতুকর্ষণ। যাঁহারা চিকিৎসাশাস্ত্র পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা এ কথার সত্যতা বিলক্ষণ জানেন।

সংসারের কার্য্যও সুন্দররূপে নির্ব্বাহ হওয়া দুষ্কর। কেন না ব্যায়াম দ্বারা পটু না হইলে শরীর কিঞ্চিৎ শীতাধিক্য বা উষ্ণাধিক্য সহনে সমর্থ হয় না। যাঁহার শরীর ব্যায়ামপটু, তিনি স্নিগ্ধ ও রুক্ষ, কোমল ও কঠিন, মসৃণ ও বন্ধুর, কিছুতেই ভীত বা কুণ্ঠিত নহেন। যেহেতু তিনি পূর্ব্বেই এ সকল সহ্য করিবার শিক্ষা করিয়াছেন। যদি শরীর তেমন নিয়মিত ভাবে দৃঢ় করিবার যত্ন করা না যায়, তবে কোমল ও মসৃণ বস্তু ব্যতীত কঠিন ও বন্ধুর বস্তু ব্যবহার করিতে পারা যায় না; অথচ ধর্ম্মসাধন কোন একটি বিষয়ে আসক্তি থাকিলে অসম্পন্ন থাকিবে। সামর্থ্য লাভ না করিয়া যদি বলপূর্ব্বক কিছু করিতে যাওয়া যায়, কৃতকার্য্য হইতে পারা যাইবে না। পরন্তু আরও ক্লেশ কল্পনা আসিবারই অধিক সম্ভব। এইরূপ অনুপযুক্ত চেষ্টা হইতে রোগ শোক প্রভৃতি নানাবিধ উৎপাত উপস্থিত হইয়া ইহকাল ও পরকাল সকল সুখের বাধা জন্মাইতে পারে। কেহ কেহ বলিতে পারেন, ব্যায়াম অপ্রাকৃতিক, সুতরাং অধর্ম্ম। আমি তাঁহাদিগের জন্য এই মাত্র বলিতে চাই যে পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনাসকল পরবর্ত্তী ঘটনার সূচক, এবং উহা প্রকৃতির নিয়মানুসারেই হয়। যেমন শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ প্রভৃতি বিষয় জননীগর্ভে গ্রহণ করিবার প্রয়োজন হয় নাই; কিন্তু ভূমিষ্ঠ হইলে আবশ্যক হইবে জন্য গর্ভেই তত্তদ্গ্রাহক ইন্দ্রিয় সঙ্গঠিত হইয়া থাকে; এবং

উহারা চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী বিষয়সমূহের উপযোগী হইতে পারে এ জন্য ব্যবহার ও পোষকবস্তুযোগে ক্রমে পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। এ পরিবর্ত্তন প্রাকৃতিক নিয়মসঙ্গত ভিন্ন অপ্রাকৃতিক কেহ বলিতে পারে না। তদ্রূপ ব্যায়াম দ্বারা যে শরীর রূপান্তরিত হইয়া সুফল প্রসব করে, তাহাও প্রকৃতিগত নিয়মের বলে, অন্য কাহারও বলে নহে। সুতরাং ব্যায়াম ধর্ম্মও প্রাকৃতিক কার্য্য এবং প্রত্যেক মনুষ্যের অনুষ্ঠেয়।

এইরূপ সাধনে কৃতকার্য্য হইলে বিবেকসহযোগে ত্বগিন্দ্রিয়ের প্রয়োজন ও পরিমাণ স্থির করত, যত টুকু প্রয়োজন ও সেই প্রয়োজনের পরিমাণ যত টুকু, সেই টুকু গ্রহণ করিয়া অধিক গ্রহণে বিরত হইতে হইবে।

রসন।

স্বাদ বা রস গ্রহণ রসনেন্দ্রিয়ের কার্য্য। স্বাদ রসনার বিষয়। স্বাদ দুই প্রকার, সুস্বাদ ও বিস্বাদ। স্বাদের এই যে প্রকার ভেদ, ইহার একতর ভাব, অন্যতর অভাব মাত্র। যে স্থানে স্বাদের অভাব, তাহাই বিস্বাদ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। বিস্বাদ প্রকৃতি নহে, বিকৃতি। বিস্বাদ রস নহে, বিরস। অম্ল, মধুর, তিক্ত প্রভৃতি রসশালী পদার্থই স্বাদের বাসস্থান। আপাততঃ বোধ হয়, যাহা মিষ্ট তাহাই সুস্বাদ, আর যাহা তিক্ত

তাহা বিস্বাদ; কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। তিক্ত বস্তুও সুস্বাদ হইতে পারে, মিষ্ট বস্তুও বিস্বাদ হইতে পারে। ফলতঃ যে শক্তি দ্বারা মনুষ্য বস্তুর প্রতি আসক্তি প্রকাশ করে, তাহারই নাম স্বাদ। এই যে স্বাদ, ইহা অম্ল, মধুর, তিক্ত প্রভৃতি সকল বস্তুতেই আছে। তবে কোথাও কিছু অধিক, কোথাও কিছু অল্প এই মাত্র প্রভেদ। ক্ষীর ও শর্করা প্রভৃতি বস্তুতে স্বাদ অধিক, এই জন্য তাহার প্রতি মনুষ্য অধিক আসক্ত এবং নিম্ব ও লকুচাদিতে স্বাদের মাত্রা অল্প, এই জন্য মনুষ্য তাহার প্রতি বড় অনুরাগী নহে। আবার অনেক স্থলে মনুষ্যকে মিষ্ট অপেক্ষা তিক্ত কটু প্রভৃতি বস্তুতেই অধিক অনুরাগ প্রকাশ করিতে দেখা যায়। বস্তুতও কেহ কেহ কটু কিম্বা তিক্ত বস্তু এত ভালবাসে যে তিক্ত কটু প্রভৃতি পাইলে মিষ্ট বস্তুকে অনাদর করে *। ফলতঃ বস্তু বিকৃত হইলে বিস্বাদ হয়, প্রকৃতাবস্থায় থাকিলেই সুস্বাদ। এ স্থলে আর একটি বিষয় স্ফুট করিয়া না বলিলে ভ্রম হইবার সম্ভব আছে। লোকে রূপান্তরিত বস্তুকেও বিকৃত বলিবার রীতি আছে;

---

* ঐই জন্য ভারতবর্ষীয় আর্য্যগণ সত্ত্ব রজ তম প্রভৃতি শারীরিক গুণের তারতম্যানুসারে মানুষদিগের ভোজ্য নির্ব্বাচন করিয়াছেন। যথা—"কট্বম্ললবণাত্যুষ্ণ আহারা রাজসপ্রিয়াঃ। যাতযামং গতরসং পূতিপর্য্যু- ষিতঞ্চ যৎ। উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ং।"

কিন্তু আমার মত তাহা নহে। বিকৃতি আর রূপান্তর দুই প্রকার। যেমন দুগ্ধ দধি হয় নাই, অথচ দুগ্ধের প্রকৃত স্বাদ তাহাতে নাই, এই অবস্থাকে বিকৃতাবস্থা বলা যাইতে পারে। কিন্তু দুগ্ধ দধিত্ব প্রাপ্ত হইলে বিকৃতি থাকে না, তাহা রূপান্তরিত হয়। এই বিকৃতি ও রূপান্তরের অর্থ এই যে বিকৃতিমদ্বস্তু বিস্বাদ ও অপকারী, প্রকৃতিমৎ রূপান্তরিত বস্তু সুস্বাদ ও উপকারী।

যাহা হইতে আমাদিগের শরীর পুষ্ট ও বলিষ্ঠ হয়, তাহা পূর্ব্বোক্ত কটু, তিক্ত, অম্ল, মধুর, ক্ষার ও কষায় প্রভৃতি রসকে আশ্রয় করিয়া বস্তুসকলে অবস্থান করে। ইহার প্রমাণ দিবার জন্য নিম ও চিরতা, শর্করা ও দুগ্ধ, লঙ্কা ও পলাণ্ডু, তিন্তিড়ী ও বদরী, লবণ ও লৌহের কথা উল্লেখ করিতে পারি। নিম ও চিরতার তিক্তত্ব, শর্করা ও দুগ্ধের মধুরত্ব, লঙ্কা ও পলাণ্ডুর কটুত্ব, তিন্তিড়ী ও বদরীর অম্লত্ব, লবণের ক্ষারত্ব ও লৌহের কষায়ত্ব প্রভৃতিই পুষ্টি ও বলের আধার। রাসায়নিক পণ্ডিতগণ পরীক্ষা করিয়াছেন, এই সকল বস্তু প্রকৃতিতে থাকিলে বা রূপান্তরিত হইলে মহোপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়। বিকৃতাবস্থায় ইহারা অত্যন্ত অপকারী বলিয়া বিখ্যাত। বস্তুতঃ রস মাত্রেই শরীররক্ষার উপযোগিতা আছে। কিন্তু ইহারও মধ্যে একটি আশ্চর্য্য কৌশল আছে। যে বস্তু অধিক পোষক ও বলকারী, তাহাতে তত অধিক স্বাদ আছে। স্বাদ

যাহাতে অধিক, আমাদিগের রসনেন্দ্রিয় সেই বস্তুর প্রতি অধিক আসক্ত। স্বাদ ও বলকরী শক্তির পরিমাণ অনুসারে ইন্দ্রিয়াকর্ষণের পরিমাণ। যে সকল বস্তু সর্ব্বদা খাইতে হয় না, এ কৌশল তাহাতে নাই। যে সকল বস্তু আমাদিগের নিত্যসেব্য, এ কৌশল তাহাতে আছে। ইহাও দয়াময় ঈশ্বরের দয়াসূচক এক অদ্ভুত কৌশল। এ স্থলে আমাদিগের প্রতি ঈশ্বরের যে করুণাসূচিত হইতেছে, তাহা কেমন প্রবল বেগে আমাদিগের কৃতজ্ঞতা আকর্ষণ করিতেছে, সাধক! বিবেচনা করিও।

অধিক স্বাদবান্ বস্তু শরীররক্ষোপযোগী। কিন্তু পরিমাণে অধিক হইলে তাহারই দ্বারা শরীর বিনষ্ট হইতে দেখা যায়। স্বাদের অংশ অধিক হইলে অন্ধ রসনেন্দ্রিয়ও অধিক আসক্ত হইবে। আসক্তা রসনা যদি নিরঙ্কুশ ভাবে ক্রমাগত স্বাদবৎ বস্তু ব্যবহার করিতে নিযুক্ত হয়, তবে অতি ভোজনের দোষে নানা প্রকার পীড়া আসিয়া আমাদিগকে আক্রমন করিতে পারে। সুতরাং আমাদিগের ইহকাল কি পরকাল সকল কালের সুখ ইন্দ্রিয়দ্বারা বিনষ্ট হইবার সম্ভব। ঈশ্বরের করুণাদত্ত বিবেক দ্বারা রসনেন্দ্রিয়ের প্রয়োজন ও সেই প্রয়োজনের পরিমাণ অবগত হইয়া যে সকল বস্তু শরীর রক্ষায় উপযোগী অথচ ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্য বৃদ্ধি করে

না এমত বস্তু যথাযথ ব্যবহার করিবে; তদ্বিপরীত বস্তু পরিহার করিবে।

শ্রবণ।

শব্দ শ্রবণেন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়। প্রথমতঃ বোধ হয়, শব্দের সঙ্গে আমাদিগের কোন উপকার বা অপকারের সম্বন্ধ নাই। কেন না শব্দ বায়ুতরঙ্গোদ্ভূত একটি অমূর্ত্ত পদার্থ। অমূর্ত্ত শব্দের সহিত মূর্ত্ত শরীর ও শরীরাভ্যন্তরস্থ মনের অতি দূর সম্পর্ক বলিয়া অনুমান করা যায়, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। ভাবিয়া দেখিলে জানা যাইবে যে শব্দের উপর যেমন মনুষ্যের ইষ্টানিষ্ট নির্ভর করে, এমন আর কিছুরই উপর করে না। শব্দের সঙ্গে শরীরের সম্বন্ধ অল্প হইলেও মনের সম্বন্ধ অল্প নহে। পৃথিবীর সমুদায় কুভাব ও সুভাব শব্দযোগে এক স্থান হইতে স্থানান্তরে সংক্রামিত হইয়া থাকে। শব্দ গুরুজনের স্নেহরঞ্জিত আশীর্ব্বাদ, শব্দই প্রিয় জনের শ্রান্ত্যপনোদনকারী বিশ্রম্ভালাপ। শব্দ বন্ধু জনের আনন্দবর্দ্ধক প্রিয় সম্ভাষণ, শব্দই শত্রুর চিত্তবিদারক বজ্রোপম কর্কশ বাক্য। শব্দ বীণাতন্ত্রীর সুমধুর কাকলী, শব্দই পৃথিবীর ভয়প্রদ কঠোর নিনাদ। শব্দ বিহঙ্গকণ্ঠের মনোবিমুগ্ধকর কলরব, শব্দই বন্ধুজনবিয়োগাবধুর চিত্তের স্খলিতপদ বিলাপ ও প্রলাপ। শব্দ চিত্তপ্রসাদকর ধর্ম্মভাবের উদ্দীপনকারী, শব্দই

চিত্তের সমস্ত সুভাবনাশক বিষয়ের বিষময় কোলাহল। শব্দ ভাববাহী, শব্দ অভাববাহী। শব্দ মাধুর্য্যবাহী, শব্দ পারুষ্যবাহী। শব্দই ভয় বিষাদ, শোক মোহ, অহঙ্কার বিদ্বেষ, উদ্বেগ ও কলহ বহন করিয়া আনে। শব্দই আশা ভরসা প্রীতি সদ্ভাব সুখ শান্তি আনন্দ ও আরাম প্রভৃতি স্বর্গীয় ধনে হৃদয় পূর্ণ করে। আমরা সুস্থ মনে ও সুস্থ শরীরে থাকিলে শব্দই শরীরমনের সেই সুস্থতা ভঙ্গ করিতে পারে। আবার অসুস্থ থাকিলেও শব্দই সুস্থতা প্রদান করিতে সমর্থ হয়। ফলতঃ শব্দ হইতেই জীবন পাইবার আশা, শব্দ হইতে মৃত্যুর নিতান্ত সম্ভাবনা। অতএব এই শব্দ শ্রবণ করিতে শ্রবণেন্দ্রিয়কে নিয়মিত করা একান্ত কর্ত্তব্য।

যদি শ্রবণেন্দ্রিয়সংযম প্রয়োজনীয়, তবে তাহা সংযমের উপায়ও জানা প্রয়োজনীয়। অতএব জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, শ্রবণেন্দ্রিয় সংযমের উপায় কি? যে শব্দ সহজে মনকে বিকৃত করে—যে শব্দ হৃদয়ের অশান্তি ও উদ্বেগ বৃদ্ধি করে—যে শব্দ চিত্তের সমুদায় স্বাস্থ্য ও মাধুর্য্য বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লয়—যাহা সাধু জনবিগর্হিত পথ প্রদর্শন করে—তাহা শ্রবণ করা অনুচিত। অশ্লীল সঙ্গীত, কুশ্রীলভাববর্দ্ধক গাথা, কাহারও অনুচিত নিন্দা, কোন দুরভিসন্ধিমূলক মন্ত্রণা, পরস্পর বিদ্বেষমূলক বিবাদ, কোন শাস্ত্র কি সাধুর চরিত্র মন্দ বলিয়া পরিচিত করিবার জন্য যে বিতণ্ডা হয় তাহা, যাহাতে কেবল স্বার্থপরতার

প্রশ্রয়, সাংসারিকতার বৃদ্ধি হয় এরূপ কোন কুযুক্তিপূর্ণ তর্ক, ঈশ্বর পরকাল ধর্ম্ম প্রভৃতি মূল সত্য গুলির বিরুদ্ধে যে সকল নাস্তিকতাপোষক শব্দ সময়ে সময়ে ব্যবহৃত হইয়া থাকে তাহা এবং ঈদৃশ অন্যান্য বিষয় হইতে সাধকের ভূরিশঃ অনিষ্টের আশঙ্কা আছে। অতএব যাহাতে এ সকলের নিকট-বর্ত্তী হইতে না হয়, সাবধান হইয়া তদ্রূপ উপায় অবলম্বন করিবে। ফল কথা প্রত্যেক শব্দের মর্ম্ম সুভাব কি কুভাব ব্যঞ্জক আগে বিবেকসহযোগে তাহা অবধারণ করিবে। যদি পূর্ব্বকথিত কোন প্রকার মন্দ ফল হইবার আশঙ্কা থাকে, যত্ন পূর্ব্বক তাহা বর্জ্জন করিবে, এবং যে সকল শব্দ ঈশ্বরের পথে সহায়তা প্রদান করে তাহা আগ্রহ সহকারে শ্রবণ করিবে। ইহাই শ্রবণেন্দ্রিয়সংযমের স্থূল অভিপ্রায়। এ সকল বিষয় ব্যক্ত করিতে গেলে, গ্রন্থবাহুল্য হইয়া পড়ে, এ জন্য কেবল দিঙ্‌মাত্র প্রদর্শিত হইল। যিনি সুচতুর সাধক, তিনি সর্ব্বত্র প্রয়োজন বুঝিয়া কার্য্য করিবেন।

ঘ্রাণ।

গন্ধ ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের বিষয়। গন্ধ দুই প্রকার। সুগন্ধ ও দুর্গন্ধ। সুগন্ধি দ্বারা শরীর ও মনের স্বাস্থ্য জন্মায়। দুর্গন্ধি দ্বারা তাহার বিপরীত অস্বাস্থ্য বর্দ্ধিত করিয়া তুলে, এবং নানা প্রকার শারীরিক মানসিক রোগেরও জন্ম হইয়া

থাকে। সুগন্ধিতে স্বাস্থ্য এবং দুর্গন্ধিতে অস্বাস্থ্য বা রোগ-বর্দ্ধন হয় ইহা নিতান্ত সত্য নহে। কেবল দুর্গন্ধি হইতে রোগ জন্মে না, কেবল সুগন্ধি হইতে ও রোগ দূর হয় না। অন্য দিকে আবার সুগন্ধি হইতেও রোগ জন্মিতে পারে, দুর্গন্ধি হইতেও রোগের উপশম হইতে পারে। সুতরাং এই যে সুগন্ধি আর দুর্গন্ধি নাম ভেদ, ইহা গুণ বা ফলানুরূপ নহে, কিন্তু তৃপ্তি ও বিরক্তির অনুরূপ। যাহাতে তৃপ্তি আছে, তাহা সুগন্ধি। যাহাতে বিরক্তি আছে, তাহা দুর্গন্ধি। কিন্তু রোগ তৃপ্তিজনক বস্তু হইতে জন্মে, অতৃপ্তিজনক বস্তু হইতেও জন্মে, আরোগ্যও এইরূপ। তবে সুগন্ধিকে স্বাস্থ্য ও দুর্গন্ধিকে স্বাস্থ্যনাশক বলিয়া প্রথমতঃ গ্রহণ করা হইল কেন? না, অধিকাংশ ফলের প্রতি লক্ষ করিয়া।

এই যে সুগন্ধি ও দুর্গন্ধি বস্তু, সামান্যতঃ ইহারা ধর্ম্ম সাধনের তেমন গুরুতর অন্তরায় বলিয়া বোধ হয় না ; কিন্তু নাসিকায় গন্ধ প্রবিষ্ট হইলে তদ্দ্বারা মস্তিষ্ক উত্তেজিত হইয়া উঠে। ইহাতে ক্রমশঃ আন্তরিক চাঞ্চল্য ও উদ্বেগ বৃদ্ধি পায়। ইহা দ্বারা চিন্তা ধ্যান, ধারণা, ও সমাধি প্রভৃতি সাধনাঙ্গ হইতে মনুষ্যের চিত্তগতি স্খলিত হইয়া যায়। অন্য দিকে আবার আসক্তিজনক গন্ধাদির প্রতি অন্ধতা জন্মিলেও অনিষ্ট হইবার সম্ভব। এই জন্য অতি সতর্ক ভাবে গন্ধ হইতে আত্ম রক্ষা করিবার যত্ন করিবে। এ স্থলে কোন বিশেষ উপায় প্রদর্শন করিবার প্রয়োজন বোধ হয় না।

কেবল ইন্দ্রিয়ের প্রয়োজন ও পরিমাণের প্রতি দৃষ্টি থাকিলেই যথেষ্ট। জ্ঞানেন্দ্রিয়সকলের কিরূপ করিয়া সংযম করা প্রয়োজনীয়, তাহা প্রদর্শিত হইল। সম্প্রতি কর্ম্মেন্দ্রিয়ের বিষয় প্রদর্শন আবশ্যক, কিন্তু আমি এস্থলে সেই বিষয় প্রদর্শন করা উচিত বোধ করি না। ইতঃপর মনুষ্যের কর্ত্তব্যপ্রণালী প্রদর্শন করিবার সময়ে কর্ম্মেন্দ্রিয়ের শাসনপ্রণালী বিশেষ করিয়া লিখিবার ইচ্ছা রহিল।

বিশ্বাস।

বিশ্বাস যোগ্যতা লাভের একটি প্রধান উপায়। বিশ্বাস কি? বিশ্বাস বস্তুর ভাবগত প্রত্যয় বা নিঃশংসয়তা। আমি অমুক ব্যক্তিকে জ্ঞানী বলিয়া বিশ্বাস করি। কেন? লোকের মুখে শুনিয়াছি, "তিনি বড় জ্ঞানী" এই জন্য, অথবা স্বয়ং তাঁহাতে অনেক জ্ঞানের চিহ্ন দর্শন করিয়াছি এই জন্য।

অনুষ্ঠানের পূর্ব্বে এই বিশ্বাস চাই, নতুবা অনুষ্ঠিত কার্য্য অক্ষুন্ন ভাবে সম্পন্ন হইতে পারে না। সম্পন্ন কেন, কার্য্যসাধনে যত্নও চলিতে পারে না। মনে কর, আমি যে অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত আছি, তাহার উদ্দেশ্য ও পাত্রাপাত্রতা বিষয়ে আমি নিঃশংসয় হইতে পারি নাই, অথচ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেছি। ইহাতে আমার অনুষ্ঠিত কার্য্য সম্পন্ন হইয়া সুফল প্রসব করিবে কিরূপে?

যাহা বলা হইল তাহাতে এই পাওয়া যাইতেছে যে, বিশ্বাস কোন প্রমাণের উপর তিষ্ঠিয়া থাকে, কিন্তু প্রমাণ ব্যতীত এক মুহূর্ত্তও তিষ্ঠিতে পারে না। যদি বিশ্বাস রাখিবার প্রমাণ আবশ্যক, তবে সে প্রমাণ কি? বিশ্বাসের প্রমাণ দুই প্রকার। এক কুলক্রমাগত আচার পদ্ধতি, দেশাচার ও স্বদেশপ্রচলিত ধর্ম্মশাস্ত্র। দ্বিতীয় প্রজ্ঞানিষ্ঠ স্বতঃসিদ্ধতা ও অবশ্যম্ভাবিতা। আমার পিতা পিতামহ প্রভৃতি পূর্ব্বপুরুষদিগকে যেরূপ আচার ব্যবহারে রত দেখিয়াছি, দেশের সাধারণ মানবগণ যেরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন, এবং স্বদেশে যে সকল ধর্ম্মশাস্ত্রের শাসন প্রচলিত আছে, এই সকলকে প্রমাণ করিয়া বিশ্বাস অবস্থান করিতে পারে। আবার বৈজ্ঞানিক সত্য, যাহার স্বরূপ কি লোকে জানে না, অথচ স্বভাবতঃ তাহার অনুরূপ কার্য্য করে, উহা স্বতঃসিদ্ধ বিশ্বাস। এই বিশ্বাসে প্রমাণের প্রয়োজন করে না, উহা আপনি আপনার প্রমাণ।

বিশ্বাস বস্তুতঃ পদার্থ এক, সুতরাং উহার স্বভাব ও শক্তি একই রূপ। কেবল আধারগত বিভিন্নতাহেতু পণ্ডিতগণ এই একই বিশ্বাসকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। এক অপ্রকৃত, অপর প্রকৃত। এক অন্ধ, অপর চক্ষুষ্মান্। আমরা আত্মার স্বভাব ও ঈশ্বরের স্বরূপগত ভাব হইতে যে অখণ্ড ও অমোঘ বিশ্বাস প্রাপ্ত হইয়া থাকি, তাহা প্রকৃত এবং চক্ষুষ্মান্। ইহা দ্বারা

সমুদায় অদৃশ্য ও অস্পৃশ্য বিষয়েও নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি, এবং যত বার ইচ্ছা পরীক্ষায় পতিত হইলেও প্রমাণের জন্য ভীত বা কুণ্ঠিত হই না। এরূপে পুনঃ পুনঃ পরীক্ষা দিতে হইলেও মনে সঙ্কোচ জন্মে না। কিন্তু অপ্রাকৃত অন্ধ বিশ্বাস এরূপ নহে। উহা চিন্তা ও পরীক্ষার ভার সহ্য করিতে পারে না, এবং প্রমাণ চাহিলেই পলায়ন করে। যত ক্ষণ বৌলিক আচার পদ্ধতি, দেশের রীতি নীতি ও শাস্ত্রীয় বচনের দোষ গুণ চিন্তাপথে না আসিতেছে. যত ক্ষণ কোন পরীক্ষা বা প্রমাণ দিবার প্রয়োজন না পড়িতেছে, তত ক্ষণ উহার বল; কিন্তু পরীক্ষা ও প্রমাণের প্রয়োজন হইলে, উহা আর আপন অধিকৃত স্থানে স্থির ভাবে অবস্থান করিতে পারে না।

যে বিশ্বাস লোকপরম্পরাগত আচার ও দৃষ্টান্ত অথবা কোন শাস্ত্রীয় বচনকে প্রমাণ করিয়া জীবিত থাকে, তাহা চিরকাল পর মুখাপেক্ষী, কেন না সে অন্ধ। সে স্বয়ং দেখিয়া শুনিয়া কিছুই করিতে পারে না। কোন বস্তু দেখিয়া পরীক্ষা করিতে কহিলে, সে তৎক্ষণাৎ পশ্চাদগামী হয়। স্বয়ং কোন পরীক্ষায় পড়িলে অথবা তর্ক ও যুক্তি দ্বারা শাস্ত্রীয় বচন খণ্ডিত হইলে সে এত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে যে আর তাহার উত্থান শক্তি থাকে না। কিন্তু প্রজ্ঞা-প্রসূত বিশ্বাস চিরকাল অটল ভাবে আপন অধীকৃত স্থানে অবস্থান করে, এবং সমস্ত মোহজাল অন্ধকার ও

প্রতিকূলতা প্রভৃতি ভেদ করিয়া সমুত্থিত হয়; কখনও উহার বিষাদ বা ভয় জন্মে না। যত পরীক্ষা আসুক, কিছুতেই উহার স্বতঃসিদ্ধতার বল লঘু করিতে পারিবে না *। যেমন কার্য্যকারণসম্বন্ধের বল কেহ লঘু করিতে পারে না; কিন্তু যত অনুসন্ধান করে, ততই পুঞ্জ পুঞ্জ প্রমাণ আসিয়া উপস্থিত হয়।

এই বিশ্বাস নানা প্রমাণ দ্বারা দৃঢ়িষ্ঠ হইলে এবং পুনঃ পুনঃ সংঘর্ষণে সম্মার্জ্জিত হইলে, উহা অপাত্রে বিন্যস্ত হইতে পারে না। প্রকৃত বিশ্বাস যেমন অপাত্রে বিন্যস্ত হওয়া অসম্ভব, অপ্রকৃত বিশ্বাস তেমনি সুপাত্রে বিন্যস্ত হওয়াও অসম্ভব। কেন না পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, পাত্র-নির্ব্বাচনশক্তি উহার নাই, উহা অন্ধ। অন্ধ যেমন পদশব্দ-শ্রবণ মাত্র লোকের নিকট যাচ্ঞা করে; কিন্তু পথগামী ব্যক্তির দান করিবার শক্তি আছে কি না তাহা বুঝিতে পারে না, সুতরাং প্রায়শঃ নিরাশ ও প্রতারিত হইয়া থাকে; অন্ধ বিশ্বাসও সেইরূপ পাত্রাপাত্র চিনিতে পারে না। সম্মুখে যাহাকে পায়, তাহাকেই লক্ষ্য করে, সুতরাং প্রায়শঃ কেবল প্রতারিত হইয়া থাকে। অনুপযুক্ত স্থানে উপবিষ্ট ব্যক্তি যেমন পুনঃ পুনঃ এক স্থান হইতে অন্য স্থানে উপবিষ্ট হইতে থাকে,

* বিশ্বাস একটি সহজ পদার্থ; কিন্তু বিজ্ঞান দ্বারা তাহা দৃঢ়তা প্রাপ্ত হয়। ১৭৯৮ শক, ১লা পৌষের ধর্ম্মতত্ত্ব।

অন্ধ বিশ্বাসও সেইরূপ এ পাত্র হইতে ও পাত্রে, ও পাত্র হইতে সে পাত্রে স্থাপিত হইতে থাকে। এই বিশ্বাস সর্ব্বদা উঠিবার ও বসিবার যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া পরিশেষে দেশত্যাগী হইয়া চলিয়া যায়। সুতরাং যিনি এই বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া এত কাল জীবিত ছিলেন, তাঁহার মৃত্যু অতি শীঘ্র আসিয়া উপস্থিত হয়।

মনে কর, এক জন বৈষ্ণব আপন পিতা পিতামহ প্রভৃতির নিকট শুনিয়াছিলেন, কৃষ্ণ জগতের উপাস্য, কৃষ্ণই সৃষ্টিস্থিতি সমুদায়ের মূল কারণ। এই শ্রুতির উপরে পিতৃগণের শ্রদ্ধার গ্রন্থ দেশীয় প্রচলিত ভাগবত প্রভৃতি পুরাণ প্রাণস্বরূপ হইয়া সেই ধারাবাহী বিশ্বাসের জীবন দান করিয়াছিল। এইরূপ বিশ্বাসী জীবন লইয়া মানবাত্মা কিছু কাল সুখে কাটাইতে পারে, অথবা এই-রূপ অকিঞ্চিৎকর ক্ষণভঙ্গুর প্রমাণের উপরেও কিছু কাল মাত্র মানবাত্মারবিশ্বাস দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে। কিন্তু যখন সেই সাধক সাধুর বদনে ও নানাবিধ ধর্ম্মগ্রন্থে দেখিতে ও শুনিতে পাইলেন যে ঈশ্বর অজ, অক্ষর, অচ্যুত, তখন আর তিনি নিশ্চিন্ত মনে মুখে অন্ন দিতে পারিলেন না। কৃষ্ণের সঙ্গে এই সকল স্বরূপের সামঞ্জস্য না দেখিয়া তাঁহার হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠিল। কেন না তিনি ভাবেন ঈশ্বর অজ, তাঁহার জন্ম নাই, কিন্তু

কৃষ্ণ বসুদেব দেবকীর বা নন্দ যশোদার পুত্র। ঈশ্বর অক্ষর ও অচ্যুত কিন্তু কৃষ্ণ পদে পদে বিচলিত ও বিচ্যুত হইতেছেন। ঈশ্বর সত্যস্বরূপ কিন্তু যত দূর হইতে পারে কৃষ্ণ অসদ্ভাবাপন্ন সঙ্কীর্ণ। এই সময়ে সাধকের বিশ্বাস একান্ত ভাবে ঘুরিতে থাকে। সুতরাং পুরাণপ্রণেতাগণ ঈশ্বরের অবতার সম্বন্ধে যে সকল হেতু প্রদর্শন করিয়াছেন পুনঃ পুনঃ তাহার আলোচনা করেন। তখন তাঁহার বিশ্বাস একবার কৃষ্ণ, আবার বিষ্ণু, আবার শিবকে আশ্রয় করিতে ব্যস্ত হয়, এবং পরিশেষে মারাত্মক নাস্তিকতায় নিপতিত হইয়া একবারে দেশত্যাগী হইয়া চলিয়া যায়।

আর যদি সাধকের সহজ জ্ঞান নিষ্কলঙ্ক থাকে, যদি সে প্রজ্ঞার স্বতঃসিদ্ধ প্রভাব অনুভব করিতে সমর্থ হয়, তবে তাহার বিশ্বাস যথার্থ পাত্রে স্থাপিত হইয়া সেই মোহজাল হইতে সে পরিত্রাণ লাভ করে। যেমন অন্ধ অনুপযুক্ত পাত্রের নিকট যাচ্ঞা করিয়া প্রতারিত হয়, কিন্তু তাহার যাচ্ঞা অব্যাহত ভাবে চলিতে থাকিলে এক সময়ে উপযুক্ত পাত্রের সাক্ষাৎ পাইয়া কৃতার্থ হয়, সেইরূপ অপ্রকৃত বিশ্বাস ঘুরিতে ঘুরিতে যদি প্রজ্ঞার সাক্ষাৎ পায় তবেই কৃতার্থ হয়। অতএব বিশ্বাস অবিকৃত রাখিতে হইলে, সহজ জ্ঞানের সুস্নিগ্ধ আলোকে আপনাকে যত্ন পূর্ব্বক ধরিয়া রাখিতে হইবেক। ইহার বিশুদ্ধতা ও স্বতঃসিদ্ধতার উপরে আপনাকে স্থির রাখিয়া উত্তরোত্তর অগ্রসর হইতে হইবে, নতুবা প্রতিপদে বিপদ্।

মনে কর, ঈশ্বর সৃষ্টিস্থিতির কারণ। সুতরাং যিনি এই অসীম লোকমণ্ডলের স্রষ্টা, যিনি সর্ব্বতোভাবে সমুদায় বিশ্বরাজ্যে নিয়ম ও গতি বিধান করিতেছেন, যাঁহার হস্তে আলোক ও উত্তাপের ভাণ্ডার এই মহান্ সূর্য্য বিধৃত হইয়া চিরকাল অবস্থান করিতেছে, এবং সমস্ত সৌর জগৎকে যিনি সেই সূর্য্যমণ্ডলের সহিত গ্রথিত করিয়া রক্ষা করিতেছেন; সেই ভূমা ঈশ্বরকে মনুষ্যের স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান কখনও জন্মমৃত্যুবর্জ্জিত ও সর্ব্বশক্তিমান্ না বলিয়া থাকিতে পারে না, এবং তাদৃশী মহতী শক্তিকে কোন ত্রুটিযুক্ত ও সঙ্কীর্ণ মানব কি জড়ের উপর আরোপ করিতে পারে না*। এই সিদ্ধান্ত যেমন সহজ ও সরল, তেমনই অভ্রান্ত ও অটল। সুতরাং প্রজ্ঞাপ্রসূত এই অটল ও অবিকৃত বিশ্বাস সহকারে উপাসনাতে প্রবৃত্ত হওয়া আবশ্যক। পূর্ব্ব সংস্কার বশতঃ যদি কোন প্রকারে ঈশ্বরের স্বরূপ হইতে এই সকল ঐশ্বরিক গুণ অপসৃত হইতে প্রক্রম করে, তখনি সাবধান হওয়া প্রয়োজন। কেন না মনুষ্যের চিত্ত এমনি দুর্ব্বল যে তাহাকে অবকাশ দিলেই সে অনন্ত পুণ্যময় ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করিয়া আপনার সঙ্কীর্ণ-

* "যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌমইজ্যধীঃ। যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলেষু কর্হিচিৎ পুমান্ মনুষ্যেষু সএব গোখরঃ॥" শ্রীমদ্ভাগবত।

তার অনুরূপ একটী দেবতা গঠন করিয়া তাঁহার পূজায় প্রবৃত্ত হইবে।

অনুরাগ।

দ্বিতীয়তঃ অনুরাগ যোগ্যতাসাধনের উপায়। কিন্তু অনুরাগ কি ? অনুরাগের স্বভাব ও শক্তি কিরূপ, অগ্রে তাহা জানা আবশ্যক। কেন না স্বরূপ ও স্বভাব অবগত হইতে না পারিলে, তাহা দ্বারা কার্য্য করা যায় না। বিশ্বাস অনুরাগের জনক। যখন বস্তুর স্বরূপগত প্রত্যয় জন্মে, তখন অনুরাগের উদয় হইয়া থাকে। বস্তুর গুণাগুণ বিষয়ে যে দৃঢ়তা, তাহা বিশ্বাস নামে খ্যাত। এই দৃঢ়তা জন্মিলে তাহা দ্বারা যদি বস্তুর প্রতি লোভ জন্মে, তাহাই অনুরাগ। সুতরাং অনুরাগ এক প্রকার আকর্ষণ। অনুরাগ জন্মিলে অনুরক্তকে প্রবল বেগে আকর্ষণ করে, অনুরক্ত সেই আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়াই আপন অভীপ্সিত বস্তুর প্রতি ধাবিত হইয়া থাকে। অনুরাগ বিশ্বাস হইতে জন্মে। সুতরাং বিশ্বাস যেরূপ, অনুরাগও সেই রূপ হইবে। বিশ্বাস প্রকৃত হইলে, তৎপ্রসূত অনুরাগ প্রকৃত হইবে। বিশ্বাস অপ্রকৃত হইলে, অনুরাগও অপ্রকৃত বা অন্ধ হইবে। এই জন্য বিশ্বাস যে স্থানে, অনুরাগও সেই স্থানে থাকিবে ; বিশ্বাস বিচলিত হইলে অনুরাগও বিচলিত

হইবে। প্রকৃত্তার নিশ্চিত ও মঙ্গলময় উপদেশ দ্বারা আমরা যাহা সত্য সুন্দর মঙ্গলময় বলিয়া বিশ্বাস করি, অনুরাগ সেই স্থানে আপনি গিয়া আসন গ্রহণ করে। আর যদি অপ্রকৃত বিশ্বাস অনুসারে আমরা কোন অসত্য, অমঙ্গল ও অসুন্দর বস্তুকে প্রিয় বলিয়া বরণ করি, তবে সেই বিশ্বাস যখন পরীক্ষার ভার বহন করিতে না পারিয়া পলায়ন করে, তখন অনুরাগও তাহার সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্হিত হইয়া যায়।

অনুরাগ প্রকৃতই হউক, আর অপ্রকৃতই হউক, সাধক অনুরাগী হইলে উন্মত্ত না হইয়া পারেন না। অনুরাগ কর্তৃক আকৃষ্ট হইলে সাধক আর আর সমুদায় বস্তু হইতে বিযুক্ত ও সর্ব্ব প্রকার প্রয়োজন হইতে অপসৃত হইয়া পড়েন। তখন তিনি অনন্যচিত্ত হইয়া কেবল আপন অনুরাগের পাত্রকে দেখিবার ও তাঁহার সঙ্গে একত্র বাস করিবার জন্য লালায়িত হন। সুতরাং কোথায় গেলে এবং কি করিলে তাঁহাকে প্রাপ্ত হইতে পারিবেন, দিন রাত্রি কেবল সেই চিন্তা করিয়াই কর্ত্তন করেন। এ সময়ে সাধক সংসারের সমুদায় বিষয়ের সম্পর্ক পরিত্যাগ করিতে যত্ন করেন। ফলতঃ যাহা কিছু আপন অভীষ্ট সিদ্ধির প্রতিবন্ধক বলিয়া বুঝেন, যত্ন পূর্ব্বক তাহা হইতে দূরে অবস্থান করেন। অনুরাগের পাত্র যদি দুষ্প্রাপ্য হয়, তবে অনেক সময়ে তাঁহার স্বরূপগত চিন্তাতেও অনুরক্ত হইয়া

আপনাকে সুখী মনে করেন। সুতরাং তিনি তখন সমস্ত মানব জাতির সংস্রব হইতে অতিশয় নির্জনে গিয়া অভীপ্সিত বস্তুর ভাব ও সৌন্দর্য্য প্রভৃতি চিন্তা করিয়া পরিতৃপ্ত হন।

অনুরাগ গাঢ়তা প্রাপ্ত হইলে অনুরক্ত কোন রূপেই বিচলিত হইতে পারে না। অনুরাগের পরিমাণ যত অধিক হইবে, অনুরক্ত তত অবিচলিত ভাবে কার্য্য করিবে। আবার অনুরাগের বন্ধন শিথিল হইলেও অনুরক্ত আর সে স্থানে সুস্থির ভাবে থাকিতে পারে না। অতএব অনুরক্তের পক্ষে অনুরাগের বৃদ্ধি যেমন মাঙ্গলিক ও সুখের, অনুরাগের শিথিলতা তেমনই অমাঙ্গলিক ও অসুখের। এই অনুরাগই বিষয়বিরাগের মূল। বিষয় বিরাগের জন্য যত্ন করিতে হয় না, ঈশ্বরানুরাগ জন্মিলে বিষয় বিরাগ আপনি জন্মে *। যখন সাধক সত্য সুন্দর মঙ্গল বস্তুর প্রতি অনুরক্ত হন, তখন বিষয়সকল কাযে কাযেই তাঁহার নিকট উপেক্ষিত হইতে থাকে। এক দিকে বিষয়ের ক্ষণস্থায়িত্ব, বিষয়ের নশ্বরত্ব, বিষয়ের অকিঞ্চিৎকরত্ব সেই বিরাগ আরও বৃদ্ধি করিয়া তুলে; অন্য দিকে ঈশ্বরের সত্য ভাব, ঈশ্বরের সৌন্দর্য্য, ঈশ্বরের মঙ্গলভাব সাধককে অত্যন্ত প্রলোভিত করে। সেই প্রলোভন অতিক্রম করিতে না পারিয়া

* "বিষয়েষু গরিষ্ঠোঽপি রাগো যত্র বিলীয়তে।"
হরিভক্তিরসামৃতসিন্ধু।

তিনি বিষয়ের প্রতি বিরক্ত হইয়া উঠেন। সুতরাং এই অবস্থাতে কাম ক্রোধ লোভ প্রভৃতি রিপু দমন সাধকের অনায়াস সাধ্য হয়। কেন না ইহারা আপনা আপনি শান্ত হইয়া যায়। এই সকল রিপুবর্গের উত্তেজক বিষয় বাসনা যদি না থাকে, তবে রিপুগণ কাজেই পৃষ্ঠ ভঙ্গ না দিয়া তিষ্ঠিতে পারে না। সুতরাং উপাসনা করিবার যোগ্যতা চাহিলে, ঈশ্বরানুরাগ সঞ্চয় করা প্রয়োজনীয়। যে হৃদয়ে অনুরাগসূত্রের আকর্ষণ নাই, তাহা ঈশ্বরের দিকে আকৃষ্ট থাকিবে কিসের বলে? সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে অনুরাগ উপাসনার যোগ্যতা সাধনে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায়।

ব্যাকুলতা।

ব্যাকুলতা কি, ইহা বুঝাইবার জন্য অধিক পরিশ্রম করা নিষ্প্রয়োজন। এ সংসারে ব্যাকুলতার অভাব নাই। প্রত্যেক মনুষ্যই সময়ে সময়ে ব্যাকুলতা অনুভব করিয়া থাকেন। যাঁহার কিছু আশা আছে এবং সেই আশা ফলবতী হইতে বিলম্ব হইয়াছে, তিনিই জানেন ব্যাকুলতা কাহাকে বলে। এ সংসারে আশা নাই কাহার? আর এখানে কাহারই বা আশা অনায়াসে ফলবতী হইতে পারে? অতএব ব্যাকুলতা সকলেরই অনুভবযোগ্য। তথাপি

আমি সরল ভাবে ইহার ভাব ব্যক্ত করিবার জন্য দুই একটি কথা বলিব। কেন না ইহার স্বরূপ ও শক্তির বিষয় কিঞ্চিৎ স্ফুট হইলে ইহাকে আয়ত্ত করা সহজ হইবে।

পূর্ব্বে যে অনুরাগের কথা বলা গিয়াছে, হৃদয়ে সেই অনুরাগের সঞ্চার হইলেই ব্যাকুলতার আরম্ভ হইতে থাকে। এই ব্যাকুলতাকে উৎকণ্ঠা বা উদ্বেগ নামেও নির্দ্দেশ করা যায়। শ্রবণে অনুরাগ ও দর্শনে প্রীতির উদয় হয়। অনুরাগের পর ও প্রীতির পূর্ব্ববর্ত্তী কালের যে অবস্থা বস্তুতঃ তাহাকেই আমরা ব্যাকুলতা বলিতেছি। ফলতঃ সাধকহৃদয়ে অনু-রাগের পাত্রকে শীঘ্র পাইবার জন্য যে সকল উদ্বেগ ঘটিত চেষ্টা উপস্থিত হয়, পণ্ডিতগণ তাহাকেই ব্যাকুলতা বলেন। অনুরাগ অনুরক্তকে প্রবল বেগে আকর্ষণ করে, অনুরক্ত সেই আকর্ষণের বল অতিক্রম করিতে না পারিয়া বিবশ প্রায় হইয়া প্রার্থিত বস্তুর প্রতি ধাবিত হয়। এই সময়ে যদি কোন বাধা আসিয়া অনুরক্তের গতি অবরোধ করে, তখন অনুরক্ত উন্মত্তের প্রকৃতি ধারণ করে। সুতরাং বহুবিধ প্রলাপ ও বিলাপ বাক্য বলিতে থাকে। নানা স্থান ভ্রমণের মধ্যে ও নানা লোকের কথিত বাক্যাবলীর মধ্যেও অনুরক্ত সাধক আপন অভীপ্সিত বস্তুর অনুসন্ধান করিতে নিযুক্ত হন; এবং যে সকল বাধা দ্বারা তিনি আপন প্রত্যাশিত লাভে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই, সেই সকল বাধা অতিক্রম করিবার জন্য প্রাণ দিয়া যত্ন করেন।

এই অবস্থায় সাধক আপন শারীরিক সুখ দুঃখাদির প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন হইয়া পড়েন। সুতরাং জল স্থল শূন্য পর্ব্বত প্রান্তর ও গিরিগুহা প্রভৃতি কোন স্থানে যাইতে তিনি ভীত বা কুণ্ঠিত হন না। ঈশ্বরলিপ্সু ব্যাকুলাত্মা মানব যখন এই অবস্থায় পতিত হন, তখন পৃথিবীর লোকেরা তাঁহাকে উন্মত্ত বলিয়া উপহাস করে। এই লৌকিক উপহাস সাধক পুরুষকে ব্যথিত বা নিরস্ত করিতে পারে না। কেন না তখন তাঁহার নিজের মান সম্ভ্রম প্রভৃতি অনুদ্বোধিত অবস্থায় অবস্থান করে। নিজের মান মর্য্যাদা প্রভৃতি স্মরণে থাকিলে প্রকৃত ব্যাকুলতা উদিত হইতে পারে না।

কোন বস্তুর মহিমা হৃদয়ে সুন্দররূপে মুদ্রিত না হইলে অনুরাগ জন্মে না। অনুরাগ না জন্মিলে আসঙ্গলিপ্সা জন্মে না। আসঙ্গলিপ্সা ও দর্শনেচ্ছা না জন্মিলে লাভ করিবার জন্য হৃদয় উদ্বেজিত হয় না। বস্তুর সৌন্দর্য্য, বস্তুর মহত্ত্ব, একবার হৃদয়ে গভীর ভাবে অঙ্কিত হইলে নিজের অভাবসকল জাগ্রৎ হইয়া উঠে। তখন তাহাকে দর্শন করিবার, তাহার সঙ্গে একত্র বাস করিবার, তাহাকে আপনার করিবার ও আপনি তাহার হইবার এবং যথাসর্ব্বস্ব তাহাকে প্রদান করিয়া তাহার তুষ্টি সাধন করিবার জন্য মনুষ্য লালায়িত হয়। যখন আমরা দূর হইতে কোন গোলাপ কি রজনীগন্ধ পুষ্পের সৌরভ প্রাপ্ত হই, তখন তাহা পাইবার জন্য আমাদিগের

হৃদয় লালায়িত হয়। যত ক্ষণ তাহা না পাইতেছি, তত ক্ষণ কিছুতেই চিত্তের উদ্বেগ দূর হয় না। গোলাপ একটি জড় পদার্থ। গোলাপ ঈশ্বরের সৃষ্ট বস্তু এবং ঈশ্বরের সৃষ্ট সৌন্দর্য্যবিভূতির অতি সামান্য বিন্দু মাত্র। তাহার সহিত আমাদিগের কেবল ইন্দ্রিয়গণেরই সম্বন্ধ; এবং তদ্দ্বারা কেবল ইন্দ্রিয়গণই পরিতৃপ্ত হইতে পারে। সেই গোলাপের আকর্ষণ যদি এত প্রবল, তবে সেই অনন্ত শক্তির আধার প্রেমময় ঈশ্বরের আকর্ষণ কত অধিক হইবেক, তাহা অতি সহজেই অনুমান করা যায়। ঈশ্বরাকর্ষণে আকৃষ্ট ব্যক্তির ব্যাকুলতার সঙ্গে পৃথিবীর অন্য কোন ব্যাকুলতা তুলিত হইতে পারে না। যে দরিদ্র ক্রমাগত প্রতি দিন উদরে অন্ন দেয় নাই, অন্নাভাবে যাহার প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়াছে; যে পথিক গ্রীষ্ম কালের প্রখর রৌদ্রের তেজ সহ্য করিয়া অনবরত হাঁটিতেছে, প্রবল তৃষ্ণায় আক্রান্ত অথচ বিস্তৃত মরুভূমিতে পতিত হইয়াছে, আশ্রয় বা জল পাইতেছে না; যে চিররুগ্ন অন্তরস্থ মহারোগের জ্বালায় অস্থির, কোথাও উপযুক্ত চিকিৎসক পাইতেছে না; ইহারা সকলেই ব্যাকুল, কিন্তু এ সকল ব্যাকুলতা পার্থিব অভাবের জন্য। ইহা দূর করা অনায়াসসাধ্য। যাহার অন্নের অভাব, সে দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত দেশে থাকিলেও তাহার আশা—দেশান্তরে অন্ন আছে। এক সময়ে এই পৃথিবীই তাহার অভাব মোচন করিতে পারে। মরুদেশীয় প্রান্তরস্থ তৃষ্ণাতুর

পথিক প্রান্তর পার হইলে, অথবা কোন সঞ্চিতসম্বল ব্যক্তির সাক্ষাৎ পাইলে তৃষ্ণা দূর করিয়া জীবন বাঁচাইতে পারিবে আশা আছে। চিররুগ্ন ব্যক্তিও এক সময়ে এই পৃথিবীতেই পূর্ণমনোরথ হইতে পারে। কিন্তু যাহার হৃদয়ে ঈশ্বরবিরহানল প্রজ্বলিত হইয়াছে, এ পৃথিবীর জলে কি তাহার সে হৃদয় শীতল হইতে পারে, পৃথিবীর অন্ন পান কি তাহার ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবারণ করিতে পারে, এই পৃথিবীর চিকিৎসক কি তাহার আত্মার রোগ দূর করিতে পারে, কখনও না। সেই সম্পদ্ প্রদান করিবার পৃথিবীর অধিকার নাই। দীনা পৃথিবী সেই পরম সম্পদ্ দেবদুর্লভ ধন কোথায় পাইবে? তাহার যাহা নাই সে কোথা হইতে তাহা প্রদান করিবে?

এই প্রকারে সাধক পৃথিবীর অতীত প্রদেশে উত্থিত হইয়া এখানকার সমস্ত আশা ভরসা হইতে বিমুক্ত হন। যখন তিনি মানুষ হইয়া ক্ষুদ্র কীট হইয়া সেই স্বর্গের বরণীয় দেবতার প্রেমের ভিকারী হন, তখন তাঁহার মনে ঈশ্বরের ভূমা মহান্ ভাব ও বরণীয়তা, নিজের পাপময় অনুপযুক্ততা, এবং সংসারে ঈশ্বর সাধনের প্রতিকূলতা প্রভৃতি উদিত হইতে থাকে। এই সকল কারণে যতই তিনি ঈশ্বরপ্রাপ্তি কালসাপেক্ষ বলিয়া চিন্তা করেন, ততই তাঁহার হৃদয়ের উদ্বেগ বর্দ্ধিত হইয়া উঠে। এই সময়ে তাঁহার হৃদয়ের গতি নিতান্ত অসংযত ভাবে যথা তথা

ধাবিত হয়। কোন স্থানে আরাম নাই, সুখ নাই ও শান্তি নাই। যত ক্ষণ তিনি আপন চিত্তপ্রসাদকর সামগ্রী সেই দেবদুর্ল্লভ সম্পদ্ না পাইতেছেন, তত ক্ষণ তাঁহার বিরাম নাই, আলস্য নাই, নিদ্রা নাই; দিবা রাত্রি সমান ভাবে ঘুরিতে এবং অনুসন্ধান করিতেই নিযুক্ত আছেন। তাঁহাকে সুভোগ্য অন্নপান প্রদান কর, তিনি তাহাতে পরিতৃপ্ত হইবেন না। তাঁহাকে চিত্তবিনোদকর নানা প্রকার সামগ্রী প্রদান কর, তাহাতে তিনি সুখ পাইবেন না। তাঁহাকে ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিকর নানা উপাদেয় মণি মুক্তা প্রবাল ও স্বর্ণ রৌপ্যের আভরণ বা নানাবিধ উৎকৃষ্ট শয্যা ও পরিচ্ছদ প্রদান কর, তিনি তাহার কিছুই চাহিবেন না। তিনি কেবল ব্যাকুল অন্তরে দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে কোথায় প্রিয়তম, কোথায় প্রিয়তমের পরিবার বা সেবক, কোথায় তাঁহার সংবাদবাহী গ্রন্থ ও সাধু, তাহারই অন্বেষণ করিয়া ফিরিবেন। যত দিন তাঁহার আশা পূর্ণ না হইবে, তত দিন তিনি শান্ত হইতে পারিবেন না। এই প্রকার ব্যাকুল মানব উপাসনা করিবার যোগ্য পাত্র। ইঁহার উপাসনা যেমন সহজ সরল ও মধুরতা-পূর্ণ, এমন আর কাহার ও নহে।

দীনতা।

দীনতাও উপাসকের যোগ্যতাবিষয়ক সাধন। দীনতা না জন্মিলে সাধক কদাচ অভীষ্ট সাধনে কৃতকার্য্য হইতে

পারেন না। কিন্তু দীনতা কি, কিরূপে তাহা জন্মে, জান্মিলেই বা লাভ কি, আগে জানা আবশ্যক। সাধক! তুমি যদি সুদীন ঈশ্বরলিপ্সু সাধকের দর্শন পাইয়া থাক, তবে অবশ্য জান, দীনতা কি? দীনতার আকৃতি স্বতন্ত্র নাই, কিন্তু দীনতার আকৃতি দীনেতে আছে। অতএব দীন দেখিয়া দীনতা চিনিতে হইবেক। এই জন্য দীনেতেই দীনতার লক্ষণ বলিব। যে গুণ থাকিলে উচ্চারিত শব্দ অনুচ্চ, ভাষা ও প্রকৃতি সরল, গতি মৃদু ও স্বর সুমধুর হয়, তাহাকেই আমরা দীনতা বলিতেছি। ফলতঃ অভাবব্যঞ্জক কাতরতার নাম দীনতা। যে লক্ষণ থাকিলে বুঝিতে পারি, ইহার কিছু নাই, তাহাই দীনতা।

যাহার অভাব আছে, সেই কাতর, কিন্তু অভাব নাই কাহার? পৃথিবীর চতুর্দ্দিক কেবল অভাবে পরিপূর্ণ। কাহারও সকল বিষয়ের সদ্ভাব নাই। রাজা বল, প্রজা বল, ধনী বল, কেহই সমগ্র সদ্ভাব লাভ করিতে পারে না। তবে কি সকল মনুষ্যই দীন? হাঁ, সকলেই দীন; কিন্তু এ সকল অভাবের প্রতি আমার লক্ষ্য নাই। যাহার অন্ন নাই সেও কাতর; বস্ত্র নাই সেও কাতর; সুস্থতা নাই সেও কাতর; পিতামাতা নাই, ভ্রাতা ভগিনী পুত্র কন্যা নাই, সেও কাতর; যাহার প্রিয় সুহৃৎ ও প্রিয়তমা ভার্য্যা নাই, সেও কাতর; কিন্তু পৃথিবীতে এ সকল কাতর্য্যের পরিমাণ আছে। কেন না এই সকল পার্থিব অভাবের মধ্যে

একতর ভিন্ন প্রায়শঃ সকল অভাব এক জনের পক্ষে ঘটে না। ঘটিলেও পুনর্ব্বার অল্প দিনেই তাহার অভাব বিমোচিত হইবার আশা থাকে। কিন্তু যাহার ঈশ্বর নাই, তাহার সকলেরই অভাব; তাহার কাতর্য্য অপরিমিত। ঈশ্বরের অভাবে যাঁহার ব্যাকুলতা, পিতা মাতা ভ্রাতা ভগিনী পুত্র কন্যা সুহৃৎ সখা অন্ন বস্ত্র দাস দাসী, ইহারা কেহই সে ব্যাকুলতা দূর করিতে পারে না। সুতরাং সংসারে সহস্র সুখের সামগ্রী থাকিলেও তাঁহার ক্লেশের সীমা নাই। আবার ঈশ্বর যাঁহার হৃদয়ের কেন্দ্র; এক মুহূর্ত্তও যিনি ঈশ্বর সহবাস সুখে বঞ্চিত নহেন, তাঁহার সংসারে কোন অভাব হয় না। পৃথিবী যত্নপূর্ব্বক তাঁহার সকল অভাব দূর করে। সাধক! তুমি যদি ঈশ্বর প্রেমী সাধু পুরুষ কখন দেখিয়া থাক, তবে অবশ্যই দেখিয়াছ তাঁহার কেমন ঐশ্বর্য্য। যিনি ঈশ্বরের প্রেমযোগে হৃদয়কে বদ্ধ রাখিয়াছেন, তিনি পৃথিবীর নিকট কোন আশার সফলতার জন্য প্রতীক্ষা করেন না। পিতা মাতার অভাব বোধ হইলে ঈশ্বরকে তিনি পিতা মাতা বলিয়া ডাকেন, বিচারের অভাব হইলে ঈশ্বরকেই রাজা বলিয়া বিচার প্রার্থনা করেন; সখা ও সুহৃদের অভাব হইলে সেই পরম সখা পরমেশ্বরকে হৃদয়বন্ধু বলিয়া পরিতৃপ্ত হন। অন্নবস্ত্রের অভাব হইলে সেই বিশ্বজনক ও বিশ্বজননীর মুখের দিকে কাতর ভাবে একবার মাত্র তাকাইলেই তাঁহার সকল অভাব ঘুচিয়া যায়।

যাঁহার ইচ্ছামাত্র এই বিশ্বরাজ্যের সৃষ্টিস্থিতি হইতেছে, তাঁহার কৃপা থাকিলে, তাঁহার স্নেহ দৃষ্টি থাকিলেও কি কখন অভাব আসিতে পারে? সুতরাং ইহা বলা যাইতে পারে, যাঁহার ঈশ্বর আছেন, তাঁহার সকল আছে, আর যাহার ঈশ্বর নাই, তাহার কিছুই নাই।

প্রীতি বা প্রেম।

প্রীতির অর্থ তৃপ্তি অথবা ভালবাসা। বস্তুর রমণীয়তা, বস্তুর রসালতা ও বস্তুর সৌকুমার্য্য প্রভৃতি গুণ হইতেই প্রীতির উদয় ও পরিপাক হয়। সুতরাং ইহা সমীপবর্ত্তিত্ব কিম্বা দর্শনের বিষয়। কিন্তু শ্রুতি ও পাঠেও ঐ সকল গুণ কিয়ৎ পরিমাণে অনুমিত হইতে পারে। এজন্য বিশ্বাসের পরেই প্রত্যূষের সূর্য্যালোকের ন্যায় অতিক্ষীণপ্রভা প্রীতি সঞ্চারিত হইতে থাকে; এবং ব্যাকুলতা, দীনতা ও অনুরাগ প্রভৃতিকে অনুপ্রাণিত করিতে করিতে ঐ সকল বৃত্তির সহিত অনুস্যূত হইয়া ক্রমে ক্রমে দর্শনে গিয়া পরিপাক প্রাপ্ত হয়। যে বস্তু দেখিয়াছি, তাহার রমণীয়তা যথোচিতরূপে তৃপ্তি সাধন করে, কিছু মাত্র অবশিষ্ট রাখে না। যাহা দেখি নাই কিন্তু শুনিয়াছি, তাহার রমণীয়তা হৃদয়ঙ্গম হয়; কিন্তু হৃদয়ে গাঢ়রূপে মুদ্রিত হইতে পারে না। যাহার আস্বাদ পাইয়াছি, তাহার রসালতা গাঢ়রূপে লোভ জন্মায়; আর

তাহা ভুলিবার উপায় থাকে না ; কিন্তু শ্রুতিগৃহীত রসালতা ভুলিতে পারা যায়। যাহা স্পর্শ করিয়াছি, তাহার কোমলতা এরূপে অনুভূত হয় যে তাহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ থাকে না, কিন্তু শ্রুতিগৃহীত কোমলতা বস্তুতঃ তেমন সুকোমল না হইলেও না হইতে পারে। সুতরাং বিশ্বাস হইতে প্রীতির জন্ম এবং দর্শন দ্বারা উহা পরিপাক পায়। প্রীতি সাধককে গতিশূন্য বা স্তম্ভিত করে। প্রীতির অধীন ব্যক্তি প্রীতির পাত্র নিকটে পাইলে আর নড়িতে বা সরিতে পারে না, সে তখন অন্য কথা ও কার্য্য সমুদায় ভুলিয়া যায়! কোথায় আসিয়াছি, কি কারণে আসিয়াছি, এবং কি করিতেছি, এ সকল কিছুই স্মরণে রাখিতে পারে না। এমন কি তাহার রোগ শোক দুঃখ যন্ত্রণা পর্য্যন্ত পলায়ন করে। আরও আশ্চর্য্য এই যে ক্ষুধা তৃষ্ণার পীড়া পর্য্যন্ত সে আর অনুভব করিতে সমর্থ হয় না।

প্রীতি বন্ধনরজ্জু। প্রীতি দ্বারা প্রীত ব্যক্তি একেবারে বদ্ধ ভা। ধারণ করে। এ সংসারে রমণীয় বস্তুর অভাব নাই। এই জন্য প্রীতি আমাদিগকে বালকের ক্রীড়াসামগ্রীর ন্যায় যেখানে সেখানে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে। চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতি জ্যোতিষ্কমণ্ডল, পশু পক্ষীর মনোজ্ঞতা, পুষ্প প্রভৃতির সৌকুমার্য্য, ফলের নানা প্রকার রসালতা, মানব শরীরের লাবণ্য, এ সমস্ত হইতে চিত্তের বিমুগ্ধতা জন্মায়। হৃদয় এ সমস্ত হইতে এক প্রকার তৃপ্তিও লাভ করে, কিন্তু এ সকল

বৈষয়িকী তৃপ্তি ক্ষণস্থায়িনী। ইহা দ্বারা চিরজীবন তৃপ্ত থাকা যায় না। এই সকল বস্তুর লোভনীয়তা প্রতি পলে অন্তর্হিত হইয়া প্রীতিকে নিরাশার কূপে নিঃক্ষেপ করিয়া যায়। মানবহৃদয়ের কোমলতা, মানবহৃদয়ের ভক্তি বিশ্বাস, মানবহৃদয়ের দয়া দাক্ষিণ্য প্রভৃতি দর্শন করিলেও প্রীতি জন্মে। এ প্রীতি পূর্ব্বকার প্রীতি অপেক্ষা কিঞ্চিৎ উন্নতা বটে; কিন্তু ইহাতেও পতন ও উত্থান আছে। অদ্য যে মাধুর্য্য ভোগ করিয়া তৃপ্ত হইলাম, কল্য তাহার প্রতি আর আশা করা যায় না। বিশেষতঃ এই প্রীতি অন্ধতা বৃদ্ধি করিয়া দিলে, ইহা হইতে মরণেরও ভয় আছে। যখন মনুষ্য হৃদয় এইরূপ বিনাশশীল বা ভঙ্গপ্রবণ প্রীতির বশবর্ত্তী হয়, তখন নিশ্চয় বুঝিতে হইবে, সেই প্রীতি অন্ধতা হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে। এইরূপ অন্ধতার ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে পূর্ব্ব হইতে সাবধান হইতে হইবে; এবং প্রীতিকে প্রতিনিয়ত জ্ঞানালোকে আলোকিত রাখিতে হইবে। নতুবা প্রীতি আমাদিগকে অন্ধতার হস্তে সমর্পণ করিয়া চলিয়া যাইবে। তখন বিনাশ ভিন্ন আর গত্যন্তর থাকিবে না। অতএব যে বস্তুতে প্রীতি জন্মিলে চিরকাল অনন্ত জীবন তৃপ্ত থাকা যায়, সেই বস্তু অনুসন্ধান করিয়া লওয়া আবশ্যক।

ভক্তি।

ভজনশীলতা অথবা সম্পূর্ণ ভাবে বাধ্যতার নাম ভক্তি। এই বাধ্যতার সঙ্গে সঙ্গে কৃতার্থতা, আর্দ্রতা ও সগদ্গাদ প্রভৃতি থাকা চাই, তবে ভক্তির প্রকৃত অর্থ স্ফুট হইতে পারে*। এই ভক্তি কোথা হইতে কি কারণে আবির্ভূত হয়, তাহা জানা আবশ্যক। প্রীতি যেমন বিশ্বাস হইতে প্রসূত হইয়া ক্রমে ক্রমে দর্শনে গিয়া সীমা প্রাপ্ত হয়, ভক্তিও সেইরূপ। ভক্তি প্রীতির সহচরী; কিন্তু দেব ভাবে প্রতিষ্ঠিতা। প্রভুত্ব না থাকিলে তাহার প্রতি ভক্তি থাকে না। ভক্তির গতি উর্দ্ধ দিকে নিম্ন দিকে নহে। প্রভুর বরণীয়তা, প্রভুর প্রভাব, প্রভুর দয়া, প্রভুব মহিমা ও ঔদার্য্য প্রভৃতি গুণ শ্রবণ করিয়া ভক্তি উদিত হয়, এবং ঐ সকল গুণের কার্য্য জীবনে প্রত্যক্ষ করিলে ভক্তির পরিপাক হয়। সুতরাং প্রভুর ঐ গুণ গুলি ভক্তির প্রাণ। উহারা প্রভুতে বর্ত্তমান থাকিলেই ভক্তি জীবিত থাকে, উহাদের ব্যতিক্রম দেখিলে সাধকের জীবনে ভক্তির তিষ্ঠিয়া থাকা দুষ্কর। যাহা হউক, প্রভুর উচ্চ গুণসকলই যে ভক্তির আধার তৎপক্ষে সন্দেহ নাই। উচ্চ গুণ যদি ভক্তির

---

* "বাগ্‌গদ্গদা দ্রবতে যস্য চিত্তং রুদত্যভীক্ষ্ণং হসতি ক্কচিচ্চ।
বিলজ্জ উদ্গায়তি নৃত্যতে চ মদ্ভক্তি যুক্তো ভুবনং পুনাতি॥"
শ্রীমদ্ভাগবত।

কারণ হয়, তবে ভক্তির পাত্রও উচ্চ না হইয়া পারে না। কেন না উত্তম গুণ অধমে থাকিবে কিরূপে? অতএব ঈশ্বর, আচার্য্য, পিতাও মাতা প্রভৃতিরাই যথার্থ ভক্তির পাত্র। এই সকল স্থান ভিন্ন ভক্তি আর কোথাও তিষ্ঠিতে পারে না। প্রীতি যেমন প্রীতকে গতিশূন্য করে, ভক্তিও সেইরূপ ভক্তকে নিশ্চল করে। ভক্তির এই শক্তি অনিবার্য্য। কাহারও প্রতি ভক্তি জন্মিলে, ভক্ত তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া একপদও কোন দিকে সরিতে পারে না।

যে সকল উচ্চ গুণকে আশ্রয় করিয়া ভক্তি জীবিত থাকে, যদিও ঐ সকল গুণ পিতা মাতা গুরু প্রভৃতিতে পাওয়া যায়; তথাপি ঈশ্বর ব্যতীত আর কোথাও তাহার পর্য্যাপ্তি নাই। যখন আমরা স্তন্যপায়ী শিশু ছিলাম, যখন আমরা এখনকার সর্ব্বপ্রকার ক্ষমতা ও সম্পদ্ হইতে বঞ্চিত ছিলাম, তখন কেবল পিতামাতার কৃপাতেই পরিত্রাণ পাইয়াছি। যখন ঘোরতর অজ্ঞান ছিলাম, নিজের বলে কিছুই বুঝিতে বা নির্ব্বাচন করিতে পারিতাম না, তখন সেই অন্ধকারে গুরুর কৃপায় আলোক পাইয়াছি। এই যে দুইটি স্থান উদ্ধৃত করা গেল, পৃথিবীতে ইহা অপেক্ষা অধিক ভক্তির পাত্র আর নাই। কিন্তু ইহারও মূলে সেই জগৎ পালয়িত্রী স্নেহময়ী বিশ্বজননীর করুণা গুপ্তভাবে নিহিত রহিয়াছে। জনক জননীর ক্ষমতা ও মহত্ত্ব কোথা হইতে আসিয়াছে? গুরুর জ্ঞানের উৎস কোথায়? গুরুর গুরুত্ব কে প্রদান করিয়াছে?

ভাবিয়া দেখিলে সেই সর্ব্বলোকপালক দয়াবান্ পরমে-শ্বর—সেই সর্ব্বজ্ঞ ও বিশ্বতশ্চক্ষুঃ বিশ্বারাট্ এ সকলের মূল। বিশেষতঃ আমার জনক আমার জননী আমারই, অন্য কাহার নহেন। আমার উপদেষ্টা আমারই মনের সংশয় দূর করেন, কিন্তু সকলের নহে। ঈশ্বর সকল দেশ ও সকল কালে সকলেরই জনক ও জননী হইয়া আছেন; এবং প্রত্যেক নরনারীর হৃদয়স্থ উপদেষ্টারূপে বিদ্যমান রহিয়া-ছেন। অতএব ভক্তির প্রকৃত পাত্র ঈশ্বর। ঈশ্বরের সমীপ-বর্ত্তী হইয়া থাকিতে চাহিলে, তাঁহার দাসত্বে জীবন উৎসর্গ করিয়া সুখী হইতে চাহিলে, তাঁহার রাজ্যে তাঁহার অদ্রোহী প্রজা হইয়া থাকিতে চাহিলে, ভক্তি চাই, কাতরতা চাই, বাধ্যতা চাই, নতুবা হয় না।

শ্রবণে প্রীতির উদয়, দর্শনে পরিপাক। ভক্তিও শ্রবণ হইতে জন্মে কিন্তু কার্য্যে পরিপাক পায়। রমণীয়তা ও লাবণ্য প্রভৃতি যেমন দর্শনের উপরে অধিক নির্ভর করিয়া পরিগৃহীত হয়, ভক্তি সেরূপ দর্শনের প্রতি নির্ভর করে না। ভক্তির সহিত কার্য্যের সম্বন্ধ; সুতরাং কার্য্য পাইলেই ভক্তি চরিতার্থ হয়। প্রভুর দয়ার কার্য্য দেখিতে পাইলেই ভক্তি সন্তুষ্ট; কিন্তু সে সন্তুষ্টি দয়াবানের দর্শনের অপেক্ষা করে না। রোগের মধ্যে জ্বররোগ স্বতন্ত্র ও আনুষঙ্গিক দুই ভাবে কার্য্য করে, অর্থাৎ জ্বর স্বতন্ত্রও হয় এবং অন্য রোগের সঙ্গেও অনুস্যূত থাকে। প্রীতি ভক্তিও

সেইরূপ অনুরাগ ব্যাকুলতা প্রভৃতির সঙ্গে অনুস্যূত হইয়া থাকে। জ্বর যেমন চরম ফল মৃত্যু পর্য্যন্ত অপেক্ষা করে, ভক্তি প্রীতি সেইরূপ চরম ফল দর্শন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করে। ভক্তি ও প্রীতি এই জন্য সকলের শেষে লিখিত হইল। কেবল সে জন্যও শেষে লিখিত হইল না, বস্তুতও ইহা সাধকের শেষ পুরস্কার।

যাহা হউক, এই ভক্তি ও প্রীতি উভয়কেই আমরা ধর্ম্মপথের সহায়রূপে চাই। ইহাদিগের সহায়তা ব্যতীত উপাসনা সিদ্ধ হওয়া বড়ই অসম্ভব। যদি উপাস্যের প্রতি অকপট ভক্তি ও পবিত্র প্রীতি না থাকে, তবে সাধকের উপাসনা শুষ্ক ও নীরস হয়। তাহা দ্বারা মনুষ্য সর্ব্বতোভাবে ঈশ্বরের হইতে পারে না। যে হৃদয়ে কেবল শুষ্ক জ্ঞানের মরুত্ব প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহা বিষম কর্ত্তৃত্বের উত্তাপে উত্তপ্ত*। সে স্থানে ভক্তি প্রীতির অঙ্কুর হইতে পারে না। সে স্থানে ছায়া নাই, সুশীতল বায়ু নাই, সুপেয় পানীয় নাই। অতএব জুড়াইবারও আশা নাই। এরূপ অভাবান্বিত ব্যক্তি এক স্থানে স্থির থাকিয়া কার্য্য করিতে পারে না। যে ব্যক্তি প্রচণ্ড সূর্য্য সন্তাপে সন্তপ্ত, অথচ সর্ব্বদা পথভ্রমণে শ্রান্ত ও পিপাসিত, সে এক স্থানে তিষ্ঠিয়া থাকিবে কিরূপে? ভক্তি ভিন্ন প্রভুর প্রতি নির্ভর থাকে না; এবং প্রীতি

* "জাতির্বিদ্যা মহত্ত্বঞ্চ রূপং যৌবনমেবচ। যত্নেন পরিহর্ত্তব্যাঃ পঞ্চৈতে ভক্তিকণ্টকাঃ॥"

ভিন্ন প্রিয় সুহৃদের প্রতি বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না। যাহার ভক্তি ও প্রীতি আছে, সে অনায়াসে বলিতে পারে "আমি তোমার" "জগৎ তোমার"। আমি এবং জগৎ দুই তোমার বলিয়া যে বিশ্বাস করিতে পারে, সেই ইহাও অতি সহজে বিশ্বাস করে যে, আমি এবং জগৎ যাঁহার, তিনি অবশ্যই আমার এবং জগতের।

যদি এই ভাবনা অবাধে চলিতে পারে, যদি ইহার মধ্যে কিছু মাত্র ব্যবধান না থাকে, তবে তাহার ভক্তিযোগ ও প্রেমযোগ সিদ্ধ হইতে আর বিলম্ব হয় না। আমি জ্ঞানালোচনা করিয়া ঈশ্বরকে সত্যস্বরূপ ও জ্ঞানস্বরূপ বলিয়া চিন্তা করিতে পারি, কিন্তু প্রীতিভক্তি ব্যতীত তাঁহাতে বিমুগ্ধ হইতে পারি না। যদি নিজে তাঁহার রূপগুণে বিমুগ্ধ হইতে না পারি, তবে তাঁহাকে রমণীয় বন্ধু বা বরণীয় গুরু বলিয়া বিশ্বাস ও নির্ভর করিব কিরূপে? নির্ভর ভিন্ন ভাল বাসা ভিন্ন "একান্ত ভাবে আমি ঈশ্বরের" ইহা বলিতে পারি না। সুতরাং তাঁহাকেও "সম্পূর্ণ ভাবে আমার" বলিতে পারি না।

এই অবধি উপাসনার সম্বল সংগ্রহ পরিত্যক্ত হইল। যদিও উল্লেখিত বিষয় গুলি সাধকের একান্ত প্রয়োজনীয় কিন্তু ইহাই সর্ব্বস্ব নহে। সাধকের জন্য আরও অনেক প্রয়োজনীয় সামগ্রী আছে। আমি এস্থানে সমুদায় গুলি লিখিতে পারিলাম না, এ জন্য ক্ষমা চাই।

বিজ্ঞাপন।

যখন মনুষ্য ঈশ্বর চিন্তায় প্রবৃত্ত হয়, তখন বাহ্য জগৎ হইতে উপকরণ ও প্রমাণ সংগ্রহ না করিয়া পারে না। যদিও ঈশ্বরগত বিশ্বাস স্বতঃসিদ্ধ, কিন্তু জগতের ঘটনাবলী তাহার প্রমাণ হইয়া তাহাতে অবিতথ দৃঢ়তা প্রদান করে। মনুষ্য ক্রমে ক্রমে যখন অন্তর্জগতে প্রবিষ্ট হয়, তখন সেখানকার ভাব মাধুর্য্য প্রভৃতি প্রমাণ আহরণ করিয়া লয়। এইরূপে বহির্জগৎ ও অন্তর্জগৎ হইতে মনুষ্য ঈশ্বরের সম্বন্ধমূলক ধর্ম্মবিষয়ে জ্ঞান লাভ করে। এই জন্য ধর্ম্ম জ্ঞানবীজের প্রথম খণ্ডে প্রথমতঃ জগৎ, তৎপর অধ্যাত্ম জগৎ, তৎপর ঈশ্বর ও পরিশেষে ধর্ম্ম লিখিত হইয়াছে। ধর্ম্মবিষয়ে জ্ঞানলাভ করিতে অধিকাংশ মনুষ্যের জন্য গুরুর প্রয়োজন বলিয়া ঈশ্বর ও ধর্ম্মের মধ্যে গুরুর বিষয় সমালোচিত হইয়াছে।

যে ধর্ম্মের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহার বিভাগ অনুসারে প্রথম বিভাগ ঈশ্বরোপাসনা নির্দ্দিষ্ট আছে। অতএব দ্বিতীয় খণ্ড ধর্ম্মবিজ্ঞানবীজে কেবল উপাসনাতত্ত্বই লিখিত হইল। কিন্তু এই বিষয়টি যেরূপ গুরুতর, তাঁহাতে বিশেষ তপঃপ্রভাব ব্যতীত এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারা অসম্ভব। আমার তেমন তপস্যার বল নাই, ইহা আমি অবগত আছি। তথাপি এমন গুরুতর বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে দেখিয়া অনেকে দুঃখিত হইতে পারেন। আমি বিনীত ভাবে তাঁহাদিগের চরণে নিবেদন করিতেছি যে এই ধর্ম্ম জ্ঞানবীজ উচ্চ শ্রেণীর সাধকদিগের জন্য নহে। যাঁহারা নিম্ন শ্রেণীর সাধক, তাঁহাদিগের জন্য এ ক্ষুদ্র পুস্তক খানি

কেন, কোন মহাত্মা গ্রন্থেরও বিশেষ প্রয়োজন করে না। *
কেন না সকল গ্রন্থের সার ঈশ্বর, তাঁহাদিগের হৃদয়ে সর্ব্বদা
বিদ্যমান।

যাহা হউক, যাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্মের গুরুত্ব কত অবগত
নহেন, আমি তাঁহাদিগের নিকট ব্রাহ্মধর্ম্মের কেবল
সাধারণ ভাব টুকু জ্ঞাপন করিবার মানসেই এই ক্ষুদ্র পুস্তক
খানি প্রচারিত করিলাম। আশা করি, ইহা দ্বারা তাঁহা
দিগের অল্প মাত্রও উপকার দর্শিবে।

এই পুস্তক খানি মুদ্রিত ও প্রচারিত হইবার প্রধান সহায়
ভক্তি ভাজন শ্রীযুক্ত বাবু গৌরগোবিন্দ রায় মহাশয়। ইহার
প্রথম খণ্ড তিনি সংশোধিত করিয়াছিলেন, দ্বিতীয় খণ্ড
তাঁহারই কৃপাতে সংশোধিত হইল। এই জন্য তাঁহার
প্রতি সকৃতজ্ঞ চিত্তে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

এই পুস্তকের প্রথম খণ্ড মুদ্রিত করিবার সময়ে গোপাল
পুর নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু মধুসূদন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ত্রিশ
টাকা আনুকূল্য প্রদান করেন, এবারেও তিনি বিশেষ
আনুকূল্য করিয়াছেন। এই মহাত্মার উদারতার জন্য
আমি তাঁহাকে সকৃতজ্ঞচিত্তে ধন্যবাদ প্রদান করি।

শ্রীকালীশঙ্কর দাস।

---

* "যাবানর্থ উদপানে সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে। তাবান্
সর্ব্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ॥" "তদা গন্তাসি
নির্ব্বেদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ।" ভগবদ্গীতা।